নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৺দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত।

[আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত]

অষ্টাত্রিংশ খণ্ড—১৩২৭।

কলিকাতা
২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত
প্রতিষ্ঠাতা ও তদন্তে শ্রীপ্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

ষট্‌ত্রিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩২৭।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

বিষয়। পৃষ্ঠা

কলিকাতা,

২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও ৩।এ নং রাধাপ্রসাদ লেন, "মণিকা প্রেসে"

শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

ডাকমাশুল-সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ৷৷০ টাকা।

সম্পাদকের নিবেদন

কম্পোজিটরের অভাবে, তিন প্রেসে, বর্দ্ধিত হারে নগদ টাকা দিয়াও যথাসময়ে নব্যভারত বাহির করিতে পারিতেছি না। কাহারও কথায় বিশ্বাস নাই। চক্ষের জলে ভাসিতেছি। গ্রাহকগণ আশীর্ব্বাদ করুন।

১৩২৭—জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সংখ্যা একত্রে আষাঢ় মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা ১৩২৭ সালের মূল্য আষাঢ় মাসের মধ্যে দিবেন, তাঁহারা আড়াই টাকাতেই পাইবেন।

কাগজের মূল্য ৫ গুণেরও অধিক হইয়াছে। তদুপরি ভাল শাদা কাগজ বাজারে নাই। অতি কদর্য্য শাদা কাগজও পাওয়া যাইতেছে না। নব্যভারত চালাইতে মহা সঙ্কটে পড়িয়াছি। নিজের প্রেস না থাকায়, অন্য প্রেসে নগদ টাকায় নব্যভারত ছাপাইতে হইতেছে। যা-তা বিজ্ঞাপন ছাপাই না বলিয়া অন্য আয় নাই, গ্রাহকগণের মূল্যই আমাদের একমাত্র ভরসা। তাঁহারা দয়া না করিলে কাহাকে ধরিব? এই সময়ে জীবন-মরণের সন্ধি-স্থলে যাঁহারা দয়া করিবেন, চিরকাল তাঁহাদের চরণে ঋণী থাকিব। যাঁহারা ভি-পি রাখিয়া আমাদের পরম উপকার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

নব্যভারতের মূল্য ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক হিসাবে গৃহীত হয় না, বৎসর হিসাবে গৃহীত হয়। সমস্ত বৎসর পত্রিকা গ্রহণ না করিলে খুচরা হিসাবে মূল্য দিতে হয়। কাগজ বন্ধ করিবার সময় বাকী মূল্য চুকাইয়া দিতে হয়। বিনামূল্যে নমুনা দিবার নিয়ম নাই।

আমরা ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট ভি-পি করিতে চাই। যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা লিখিবেন, না লিখিলে মনে করিব, আপত্তি নাই। বহুদিনের মূল্য বাকী থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা ভি-পি ফেরত দিয়া আমাদিগের ক্ষতি করেন, তাঁহারা পূর্ব্বে জানাইলে ভাল হয়। আমাদিগের ক্ষতি করিলে তাঁহাদের কোন লাভ নাই।

মূল্যাদি প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দিলে পত্রিকা পাইতে গোল হইলে আমরা দায়ী নহি। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বেই দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের নিয়ম—এক বৎসরের জন্য হইলে প্রতি লাইন প্রতি মাসে /১০, ৬ মাসের জন্য হইলে প্রতি লাইন প্রতি মাসে ৶০, তিন মাসের জন্য হইলে প্রতি লাইন প্রতি মাসে ৵০, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন ।০ হিসাবে মূল্য অগ্রিম দেয়; অগ্রিম মূল্য বিনেও খারাপ বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত এবং মতামতও দেওয়া যায় না, লেখকগণ ক্ষমা করিবেন।

নব্যভারত-সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়।

কবিরাজ শ্রীরমেশচন্দ্র সেন বি-এ, বিদ্যানিধি।

৬ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট পাঠাইলে ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান হয়। সর্ব্ববিধ ঔষধাদি ভি-পি ডাকে পাঠান হয়।

শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী কৃত

গ্রীক দর্শন।

বা গ্রীক জাতির সম্পূর্ণ দর্শনেতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিন্সিপ্যাল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রশংসিত। ২৪০ পৃষ্ঠা; মূল্য কাপড়ে ১॥০, কাগজের মলাট ১।০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টো এণ্ড সন্স এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান দোকানে প্রাপ্তব্য।

বাড়ী ভাড়া।

বৈদ্যনাথ—কাসটেয়ার্স টাউনের প্রভা, সান্ত্বনা, শান্তি ও বিশ্রাম কুটীর ভাড়া দেওয়া যাইবে। ভাড়া সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে নব্যভারত-কার্য্যালয়ে ও বৈদ্যনাথ শ্রীযুক্ত কবিরাজ যথানাথ বসুর নিকট অনুসন্ধান করিবেন। সমস্ত বাড়ী নূতন চূণ ও তৈলরং ফলিত হইয়াছে। সকল বাড়ীতেই ফার্নিচারাদি আছে।

পুরী—সমুদ্র-উপকূলে "নীলিমা" বাড়ীর সুরমা প্রণব, প্রসূন (দোতালা), নলিনী ও কামিনী কুটীর, কমলকামিনী-মন্দির ও সুচেতা কুটীর ভাড়া দেওয়া যাইবে। সব বাড়ী নূতন মেরামত হইয়া চূণ-ফলিত হইয়াছে। সব বাড়ীতেই আবশ্যকীয় ফার্নিচারাদি আছে। নব্যভারত কার্য্যালয়ে, ও পুরীর "নীলিমা" বাড়ীতে মালী ঠাকুর নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা।

ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা তাহা চান, তাঁহারা ৴১০ টিকিট পাঠাইবেন।

নব্যভারত

অষ্টাত্রিংশ খণ্ড, ১৩২৭।

অভিনব ধৃতি—ধর্ম্ম বিশ্বজনীন।

ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ যে সকল মনুষ্যকে পোষণ করে। অভিধান মতে সৎসঙ্গ। দীপিকামতে—পুরুষের বিহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণকে ধর্ম্ম কহে। ভারত মতে ধর্ম্মের লক্ষণ অহিংসা। পুরাণ মতে—যাহার দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। যুক্তিবাদি মতে—মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করাকে ধর্ম্ম কহে। জ্ঞানবাদ মতে—মনের যে প্রকৃতি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম। আমাদের মতে, ধর্ম্ম মানবের সকল উন্নতির মূল, ধর্ম্ম ভিন্ন মানবের কোন উন্নতি লাভই সম্ভব নহে। দেশাত্ম-বোধ, ভ্রাতৃত্ব-সাধন, একতা-সংঘটন ধর্ম্ম হইতে জাত। ধর্ম্ম না থাকিলে মানুষ ও পশু সমান।

পৃথিবীতে মানব যেমন অসংখ্য, ধর্ম্মও তেমনি অসংখ্য। অসংখ্য মানবের অসংখ্য ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও অল্প নহে। ৺অক্ষয়কুমার দত্তের উপাসক-সম্প্রদায়-পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে সকল মনুষ্যকে উন্নত করে, সে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অসংখ্য হইল কেন?

অসংখ্য মানুষের অসংখ্য প্রকৃতি। একটী বৃক্ষে হাজার হাজার পাতা, কিন্তু তাহার কোনটী কোনটীর মত নহে, সকলই কিছু কিছু পার্থক্য-যুক্ত। অস্থি-মাংস-জড়িত মানুষের অস্থি-মাংস প্রভৃতি একই রূপ হইলেও আকৃতি পৃথক, গুণ পৃথক, চরিত্র পৃথক, কোন দুটী মানুষকে এক প্রকার দেখা যায় না। সহস্র মানুষের সহস্র প্রকৃতি। সহস্র মানুষ সহস্র-গুণযুক্ত। জন্ম গ্রহণের পরই মানুষ নানা পার্থক্য-যুক্ত :—কাহারও সহিত কাহারও যেন মিল নাই। একই জল বায়ু, পিতা মাতায় জন্ম গ্রহণ করিয়াও মানুষ পৃথক পৃথক হইতেছে। ইহার কারণ কি? সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়, এই পার্থক্যের কারণ আর কিছুই নয়, উহা কেবল অবস্থান্তরের স্বরূপের বিবৃতি। এক অখণ্ড বস্তুই পাত্রান্তরে, অবস্থান্তরে বিভিন্ন রূপ ধরিতেছে। সমুদ্রের জল যখন যে পাত্রে থাকে, তখন তাহারই রূপ প্রাপ্ত হয়। অথচ কামল রোগী যেমন সকলকে হরিদ্রাবর্ণ দেখে, তেমনি, যাহার চক্ষের রেটিনাতে সূর্য্যের রশ্মি যেরূপ বর্ণ ফলিত করে, তাহার নিকট সেই

বর্ণ ই প্রতিভাত হয়। এ যেন বহুরূপীর রাজত্ব। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট পৃথক বলিয়া মনে হয়। জবা ফুলটীকে তুমি যেমন দেখিতেছ, আমিও যে ঠিক তেমনি দেখিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট পৃথক পৃথক প্রতিপন্ন হইতেছে।

জন্ম গ্রহণের পরই প্রকৃতি মানুষকে বিভিন্ন পথে চালিত করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবী নূতন হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি যে অবস্থায় পড়িয়াছ, আমি সে অবস্থায় পড়ি নাই। কোন দুইজনই এক অবস্থায় পড়েন নাই। মানুষকে কে যেন ক্রমাগত বৈচিত্র্যের পথেই চালিত করিতেছে।

সুতরাং মানুষের ধারণা পৃথক না হইয়াই পারে না। আমি এক পথে, তুমি অন্য পথে, সে আর একপথে চলিতেছে! কেবল যে জ্ঞান ও কর্ম্ম চালনায় এইরূপ পৃথক পৃথক পথে মানুষ চলিতেছে, তাহা নহে। মানুষের স্বভাবই মানুষকে পৃথক করিতেছে। শাস্ত্র বলেন, সে মুনি নয়, যাহার মত বিভিন্ন নয়। আমরা বলি, সে মানুষই নয়, যে বিভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন নয়। সুতরাং মানুষের অসংখ্য গুণ, অসংখ্য ধর্ম্ম, অসংখ্য প্রকৃতি। ভেদের বাজারেই যেন অনবরত আমরা বসবাস করিতেছি। বিভিন্ন পথে যাইয়া যাইয়াই আমরা বিভিন্ন ধর্ম্ম পাইতেছি। জলের গুণ যে শৈত্য, অগ্নির গুণ যে উষ্ণতা, তাহার মধ্যেও পার্থক্য ও বৈচিত্র্যতা বিদ্যমান। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে কোন কিছুকেই এক সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা চলে না। সবই পৃথক পৃথক, বিভিন্ন বিভিন্ন, রূপান্তরিত, রূপান্তরিত। এক পথ ধরিয়াই বাহির হইলাম, কিছুক্ষণ পরেই দেখি, তুমি ও আমি পৃথক হইয়াছি। এইরূপ পার্থক্য উপার্জ্জন করাতেই এই পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে। দলাদলির কারণও এই পার্থক্য হইতে সঞ্জাত। কিন্তু এই যে পার্থক্য-বোধ, ইহা আদি-যুগের ব্যাপার, শেষ পরিপক্কাবস্থার ধারণা নহে। পৃথিবীর অসংখ্য নদনদী,—কত নদের কত নাম, কত নদীর কত নাম। নামের সংখ্যা হয় না। কিন্তু ঐ সব নদনদী যখন মহাসাগরে মিলিয়াছে, তখন সব রূপ ভাঙ্গিয়াছে, সব বিশেষত্ব ঘুচিয়াছে—সব পৃথকত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, সব একবার হইয়া গিয়াছে। এই জগতে বস্তু সকলের নামকরণ কে করিয়াছে? মানুষ। মানুষ পৃথক্, সুতরাং নামও পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে। কিন্তু সকল মানুষ যখন মহা-নির্ব্বাণ-জলধিতে নিমগ্ন হইয়াছে, তখন সব পার্থক্য, সব বিশেষত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। তখন সবই যেন একাকার। তোমরা বল রূপ, রূপ, রূপ; আমরা তখন বলি, অরূপ, অরূপ, অরূপ। রূপ ঘুচিয়া তখন অরূপের অভ্যুদয় হইয়াছে।

আবার দেখ, যে সূর্য্য পৃথিবীকে কত বিভিন্ন জনকে কত বিভিন্ন রূপই দেখাইতেছেন, সেই সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; মহা আঁধার জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।—চাহিয়া দেখ, সব বিশেষত্ব ঘুচিয়াছে, সব একপ্রকার হইয়া গিয়াছে। সকল রূপের পরিসমাপ্তিতে অরূপের অভ্যুদয় হইয়াছে। মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"এক সময়ে কোন গুহায় যোগীদিগের সন্দর্শন লাভার্থে গিয়াছিলাম। কালভৈরবের অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও যখন প্রতিনিবৃত্ত হই নাই, তখন কালভৈরব দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া গুহায় লইয়া গিয়াছিলেন ও

যোগীচতুষ্টয়ের সন্দর্শনলাভ হইয়াছিল। যোগাবসানে তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"এ জগতে ধর্ম্ম ত এক, সম্প্রদায় এত বিভিন্ন কেন?" তদুত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"পথে বিভিন্নতা দেখা যায় বটে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিলে তাহা আর থাকে না। দেখ, আমাদের এই চারিজনের একজন বৈষ্ণব, একজন শাক্ত, একজন নানকপন্থী, একজন কবীরপন্থী। পথে পথে যত দিন আমরা ঘুরিতেছিলাম, আমরা পরস্পরকে কত পর-পর ভাবিতাম, কত বিভিন্ন রূপ বোধ করিতাম, কিন্তু এই এক লক্ষ্যে পৌঁছিয়া এখন সকলে একাকার হইয়াছি—আমাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। সকল নদনদী যখন সাগরে পড়ে, তখন আর কি পৃথকত্ব থাকে?"

আরো বলিলেন, "বিধাতার এই জগতে অসংখ্য নাম। কিন্তু তাঁহার কি কোন নাম আছে? তিনি নামাতীত। সাধকেরাই সাধনানুসারে তাঁহার নামকরণ করিয়াছে। কিন্তু তিনি সকল নামের অতীত, এক অখণ্ড অব্যয় সত্য—চিদ্‌ঘন আনন্দ। সাধন করিতে করিতে যখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, তখন নামাতীত অব্যয় আনন্দে নিমগ্ন হইলে আর ভেদ বোধ থাকে না। তখনই আমাদের ভিতরে মহাশক্তি জাগিয়া উঠে।"

আরো বলিয়াছিলেন—"সাগরের একবিন্দু জল হস্তে ধারণ করিয়া যেমন বলা চলে না, সমস্ত সাগরই এই, তেমনি, পৃথিবীর কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে ধারণ করিয়া বলা অন্যায় যে, ইহাই অনন্ত অব্যয় চিদানন্দ। তাহা পৃথক কোন জিনিস, তাহার ব্যাখ্যা হয় না।"

কি সুন্দর ব্যাখ্যা। পৃথিবীতে জল, স্থল, বৃক্ষ, পশুপক্ষী, মৃত্তিকা, প্রস্তর, নরনারী কাহার না পূজা হইয়াছে? অবস্থানুসারে চিচ্ছক্তির বিকাশে মানুষে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইলে সকল বস্তুকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা হইতে পারে। এবং সেই ধারণানুসারে পূজাও সম্ভব। কিন্তু আরো প্রসারণ হইলে, আরো বিস্তৃতি-লাভ হইলে—ইহারও অতীত হওয়া যায়, তখন আধারের অতীত যে চিন্ময়, তাঁহাকে ধারণা করা যায়। সেইরূপ ধারণা হইলে সব বস্তু মহাশূন্যে পরিণত হয়, সেই মহাশূন্য ব্যাপিয়া যে শক্তি অহরহ জাগিতেছেন, সেই শক্তির জ্ঞান তখন জন্মে। তখন মানুষ আধার ছাড়িয়া আধেয়কে প্রাণে ধারণ করিয়া চিন্ময়কে প্রাপ্ত হয়। তখন মানুষে মহাশক্তি, মহা বীরত্ব অবতীর্ণ হয়। তখন মহা-চরিত্রবলে মানুষ বলীয়ান হয়।

আমি জ্ঞানের সাধক, প্রেমিককে চিনিব কিরূপে? তুমি প্রেমের সাধক, তুমিই বা কর্ম্মের সাধককে চিনিবে কিরূপে? যে সাকারবাদী, সে কি নিরাকারবাদীকে ভাল ভাবে দেখিতে পারে? আর যে নিরাকার-বাদী, সে কি সাকারবাদীকে আপন ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে? তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই পৃথিবীতে এত সম্প্রদায়ভেদ, দলাদলি, মারামারি হইয়া গিয়াছে। গীতা, বাইবেল, উপনিষদ্, কোরাণ, বেদ, ধম্মপদ এক কথাই বলেন, কিন্তু তবু কত সম্প্রদায়-ভেদ। ছোট ছেলে ছোট ছেলেকেই চিনে, জ্ঞানী জ্ঞানীকেই চিনে, প্রেমিক প্রেমিককেই বুঝে। ইহা সহজ কথা, কিন্তু ইহার উপরের কথা এই—সাধনার সোপান ধরিয়া চলিতে থাকিলে যখন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, তখন আর পার্থক্য-বোধ থাকে না। একদা বিজয়কৃষ্ণের নয়নের দিকে তাকাইয়া ভক্ত রাম-কৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছিলেন, "তুমি রাজা

মারিয়া লইয়াছ, দেখিতেছি।" লক্ষ্যে উপনীত হইলে নয়নে, বদনে সাধনার চরম শোভা ফুটিয়া উঠে, তাহা দেখিলেই অন্য সমসাধক তাহা বুঝিতে পারেন। সেই চরম লক্ষ্যে মানুষ যখন উপনীত হয়, তখন এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ইচ্ছার সহিত মিলন ঘটে। তখন মানুষ দ্বিজত্ব লাভ করে। তখন আত্মবিস্মৃত শ্রীচৈতন্য বলেন—"মুই সেই, মুই সেই ;" আত্ম-বিসর্জ্জিত খ্রীষ্ট বলেন, —"I and my father are one," তখন সল পল হন, রত্নাকর-দস্যু বাল্মীকি হন, নিমাই-পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য হন, শাখ্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। সেই দ্বিজত্ব লাভের পর চক্ষে এমন এক জিনিস লাগিয়া যায়, যাহার বলে সকল বৈষম্য-বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, বুঝা যায়, এবং সর্ব্বঘটে একের লীলা দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাওয়া যায়। তখন আর ভেদাভেদ বোধ থাকে না, তখন একতা অবতীর্ণ হয়। তখন সকল শাস্ত্রের এক অর্থ বুঝা যায়। তখন সাধক বলেন,

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

কিন্তু পথে পথে চলিতে চলিতেই অনেকের জীবন শেষ হইয়া যায়, লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারেন অতি অল্প জন। সেই জন্যই ভেদের রাজ্যেই সকলকে জীবন-ক্ষয় করিতে হয়। পর-পর-ভাব—সম্প্রদায়, গণ্ডী বা দল-মাহাত্ম্য লইয়াই জীবন-পাত করিতে হয়। এইজন্যই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ভেদের মধ্যে অভেদ, রূপের মধ্যে অরূপ তাঁহারা কিরূপে দেখিবেন ? সাধকেরা এই অবস্থাকে তুষ-চর্ব্বণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। গণ্ডীধারীরা কেবল তুষ-চর্ব্বণই করিলেন, তণ্ডুল-ভক্ষণ তাঁহাদের জীবনে ঘটিল না। নীরস জীবনই তাঁহারা যাপন করিলেন ; চরিত্রহীনতার দৌর্ব্বল্যে তাঁহাদের জীবন শেষ হইয়া গেল, প্রকৃত চরিত্র লাভ হইল না।

ধর্ম্ম ভোগের জিনিস, বাক্যের জিনিস মোটেই নয়। আমরা এক দিন কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, "যাহাতে মুক্তি এবং কৈবল্য, তাহা লইয়া ব্যবসা করিবেন না।" অখণ্ড ধর্ম্ম লইয়াই জগতে কতপ্রকার ব্যবসা চলিতেছে। আমি ভাল হইলাম না, অন্যকে ভাল করিবার জন্য ছুটাছুটি করিলাম ; নিজে ডুবিলাম না, অন্যকে ডুবাইতে ধাবিত হইলাম। ধর্ম্ম যত দিন ব্যবসার জিনিস, ততদিন দল এবং গণ্ডীতে নিবদ্ধ। ধর্ম্ম যখন ব্যবসাদারীর উপরে উঠিয়াছে, তখন ধর্ম্ম মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে। সেই মুক্তির ধামে বা চরম লক্ষ্যে মানুষ যখন পৌঁছে, তখন তন্ময় হইয়া যায়, তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। নীরবতা ও তন্ময়তা তাহার সংজ্ঞা, তখন মানুষ অতলে অচলে নিমগ্ন,—তখন খ্রীষ্টকে মূর্খ ইহুদিরা নির্য্যাতন এবং প্রহার করিতেছে, মহম্মদকে কোরেশ জাতি বধ করিতে ধাবিত—তখন কারবোলাতে হাসন হুসেনের রক্তের নদী বহিয়াছে !!

সাধনার সোপান কর্ম্মে আরম্ভ, সংযমে পরিণতি, নিবৃত্তিতে পরিসমাপ্তি। ক্রম-অনুসারে শ্রেয়ে আশ্রয়, নির্ব্বাণে বিশ্রাম, তারপর পরা মুক্তি বা কৈবল্যে আত্মবিসর্জ্জন। ক খ না শিখিলে যেমন "বোধোদয়ে" অধিকার জন্মে না, কর্ম্ম ও সংযমে দীক্ষা না হইলে নিবৃত্তি, শ্রেয়, নির্ব্বাণ, মুক্তি, কৈবল্য, কিছুই বুঝা যায় না বলিয়াই গোলযোগ ঘটে, ভেদাভেদ বোধ

যে কখনও সন্দেশ খায় নাই, সে যদি "সন্দেশ মিষ্ট, সন্দেশ মিষ্ট" বারম্বার বলে, তাহাতেই যেমন তাহার সন্দেশের মিষ্টত্বের ধারণা হয় না, যে কখনও সাগর দেখে নাই, তাহার যেমন সাগরের ধারণা হয় না, তেমনি, যে কখনও বিধাতার "দয়া" সম্ভোগ করে নাই, সে যদি আজীবন "দয়াময় দয়াময় বলে", তবু তাহার কোন লাভ হইবে না, দয়ার ধারণা হইবে না। নাম সাধনের পূর্ব্বে সাধনার-ক্রম ধরিতে হইবে। বিধাতার যে স্বরূপের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে এবং তৎ সঙ্গে কর্ম্ম ও সংযমকে সম্বল করিতে হইবে। কর্ম্ম ও সংযমের কোন স্বরূপের সহিতই যদি সাক্ষাৎ না হইয়া থাকে, সরলভাবে প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তোতা বুলি বলায় বা তুষ-ভক্ষণে কোনই লাভ নাই।

বিধাতার ধৃতি বিধাতার কৃপা-প্রসূত। বিধাতা দেখা না দিলে কেহই সাধনার বলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। সাধনায় তাঁহাকে ধারণ করিবার পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার আগমন তাঁহার কৃপাপ্রসূত। আমি পৃথিবীতে প্রচলিত বহু নীতির পথ ধরিয়া কর্ম্ম ও সংযমপূত হইয়া বসিয়া থাকিব, তিনি আসিলে তবে তাঁহাকে সেই আসনে বসাইব। রাধা ফুলশয্যা রচনা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতেছেন, কখন শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন। শ্রীকৃষ্ণ না আসিলে রাধা কি আসনে বসাইতে পারেন? তাঁহার নয়ন-জলই তখন সার হয়। কিন্তু তাঁহার কৃপা, শ্রাবণের ধারার ন্যায়, সকলের উপর প্রতি-নিয়ত বর্ষিত হইতেছে। আমরা তাহা ধরি না, তাহাতেই অশেষ কষ্ট পাই। বিবেকই বল, মনুষ্যত্ব জ্ঞানই বল, বা ঈশ্বরবাণীই বল—প্রতিনিয়ত প্রেমের ভিতর দিয়া তাহা প্রতিজনের নিকট প্রকাশিত হইতেছে। তুমি কি তাহা কখনও শুন নাই? শুনিয়া থাক যদি, তবে যে বাণী শুনিয়াছ, তাহা ধরিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হও। আর যদি না শুনিয়া থাক, কর্ম্মের পথ ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া কর্ণ পাতিয়া বসিয়া থাক, নিশ্চয় এক সময়ে তাহা শুনিতে পাইবে। যখন শুনিবে, তখন তাহা লইয়া ধর্ম্মজগতের ঘরকন্না আরম্ভ করিও। তিনি আমার প্রতি দয়া করেন, তোমার প্রতি তাঁহার দয়া নাই? তাহা হইতেই পারে না। তিনি সকলেরই প্রতি সমান দয়াবান্। কর্ম্ম বা ঘটনার অন্তরাল দিয়া, শোক দুঃখের ভিতর দিয়া, দারিদ্র্য ও দৈন্যের ভিতর দিয়া, বিপদ এবং অশান্তির মধ্য দিয়া ঐ দেখ তিনি আসিতেছেন। ঐ দেখ আকাশের বায়ু ও মেঘ ভেদ করিয়া, সূর্য্যের উষ্ণতা ও চন্দ্রের স্নিগ্ধতা ভেদ করিয়া, ফুলের কমনীয়তা ও সৌরভ, পাখীর মধুর স্বর, নারীর মাতৃভাব, বালকবালিকার পবিত্রতার ভিতর দিয়া তিনি আসিতেছেন। সৃষ্টির অন্তরালে যে সূক্ষ্ম সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সহজ সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ দেখ, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি আসিতেছেন। ঐ দেখ, মানব মানবের জন্য অম্লানচিত্তে যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি নামিয়া আসিতেছেন। ঐ দেখ, মাতা যে সন্তানের জন্য অম্লানচিত্তে জীবন ঢালিয়া দিতেছেন, তাহার ভিতর দিয়া নামিয়া আসিতেছেন। ঐ দেখ, দেশের জন্য যে সকল মহাজন জীবন ঢালিতেছেন, তাহাদের মধ্য দিয়া তিনি নামিয়া আসিতেছেন। দেখ,—দেখ—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ঐ যে সংসারবিরাগী শাক্যসিংহ নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন, তাহার ভিতর দিয়া তিনি

নামিয়া আসিতেছেন,—ঐ দেখ গোপার দয়ার ভিতর দিয়া আসিতেছেন। ঐ দেখ, নিমাই পণ্ডিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কেশব-ভারতীর নিকট ঐযে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আসিবার অনন্ত পথ, অনন্ত ক্রম, অনন্ত প্রক্রিয়া। তিনি তোমার বিবেক বা আদেশের ভিতর দিয়া বা শ্রেয়ের ভিতর দিয়া আসিতেছেন। যে ক্রম, যে প্রক্রিয়া ধরিয়া তিনি আসিতেছেন, তাহা দেখ, তাহা ধর, তাহাতে ডুবিয়া যাও। তাহাতে যদি পৌত্তলিকতা হয়, তাহা হউক; তাহাতে যদি নিরাকারের ধ্যান হয়, তাহা হইতে দেও। তাহা ধরিয়া চলাই তোমার কাজ। তিনি যে স্বরূপ বা নাম তোমার নিকট প্রকাশ করিবেন, তাহাই জপ করিবে। তাহার পরিণাম ভাবার তোমার অধিকার নাই। পরিণামে যাহা করিবার, বিশ্বগুরু তাহা করিবেন। কেশবচন্দ্র বলিতেন, সব ধর্ম্মই সত্য। আমরাও বলি, সব পথ, সব ক্রম, সব প্রক্রিয়াই সত্য। সত্য ধরিয়া সত্যের পথেই যাওয়া যায়। সত্য ধরিয়া সাধনা কর, সত্যই তোমায় লইয়া যাইবে। তবে জানিও, কল্পনাকে যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া থাক, তবে সত্যের সহিত তোমার সাক্ষাৎ কখনও হইবে না, কখনও হইবে না; বুদ্বুদকণের ন্যায় হইবে। সাধনার অনন্ত পথ, অনন্ত ক্রম, অনন্ত প্রক্রিয়া,—যিনি যে পথে, যে ক্রমে, যে প্রক্রিয়ায় পারেন, অগ্রসর হউন। যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, দল, গণ্ডী, সম্প্রদায় তখন উঠিয়া যাইবে। জগন্নাথ দর্শনের অনন্ত পথ, অনন্ত ক্রম, অনন্ত প্রক্রিয়া। অনন্ত মানবের অনন্ত পথ, অনন্ত প্রক্রিয়া। তাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যতদিন পথে, ততদিন আমার কথা তুমি বুঝিবে না, তোমার কথা আমি বুঝিব না। পথকেই আমরা যদি লক্ষ্য করিয়া লই, তবেই বিপদ; তখন ভেদবোধ, মারামারি, কাটাকাটি, মত-সংঘর্ষণ। নচেৎ চলিতে চলিতে যখন লক্ষ্যে পৌঁছিবে, তখন কৈবল্য ধামে সব একাকার হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, যাঁহারা বিধাতাকে স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলেই একদলভুক্ত, এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দে তখন হৃদয় মন পূর্ণ হইবে,—তখন দীপ্ত শিবার অভিষেক হইবে, সকল জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হইবে,—তখন সকলকে ভাই বলিয়া চিনিবে এবং সর্ব্ব ঘটে তাঁহার লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তখন জাতীয় একতা এই ভারতে অবতরণ করিবে। তখন এক-জ্ঞান, এক-ধ্যান এবং সুধা-রস-পানে সকলে বিভোর হইবে। তখন আর গণ্ডী নাই, সম্প্রদায় নাই, দলাদলি নাই—চিদানন্দের-লহরী তখন প্রাণকে সরস করিয়াছে। তখন মহাকৈবল্যে সকলে নিমগ্ন। হায়, সে বিশ্বজনীন ভাব এ ভারতে কবে আসিবে? কবে জাতি-কুলের বা দলগণ্ডীর বন্ধন ছিন্ন হইবে, কুল তেজে সকলে অকূলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ধন্য হইবে? বিধাতার বিধানে ভবিষ্যতে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য নব্যভারত অপেক্ষা করিতেছেন। বিধাতার মহা ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

পোলাও—সপ্তম উচ্ছ্বাস।

যে দেশে স্বাধীন বায়ু শিথিল গমনে
দোলাইয়া সুকোমল আইভি লতায়
বহে ধীরে, গোঠে গোঠে সৌন্দর্য্য আলয়
ফোটে ডেজি মুগ্ধ করি ফোটে ম্যাগনোলিয়া,
যেথা মধুমাসে পিক মধুকুহরবে
জীবনের জড়তায় দেয় সরাইয়া
সে দেশ হ'তে কি প্রভো এসেছিলে তুমি ?

যেই দেশে সেক্ষপীর হৃদয়ের কবি,
মানবেরে শিখায়েছে অমরার গাথা,
যেথা কবি শিরোমণি সুকোবিদ শেলি,
কল্পনার ইন্দ্রধনু-বর্ণ-সুশোভিত,
তুরগ উপরে চাপি ছুটি মেঘ পথে,
চাতকের মধুকণ্ঠে শিখাইল গান,
যেথা প্রকৃতির কবি উদার পরাণ
ওড্‌সওয়ার্থ গিরিশৃঙ্গে বিজনকাননে,
প্রকৃতির কলকণ্ঠ করিয়া শ্রবণ
ভাবের সমাধি মাঝে থাকিতেন ডুবি,
সে দেশ হ'তে কি প্রভো এসেছিলে তুমি ?

যে দেশের শিক্ষা গড়ে মানুষে দেবতা
মনুষ্যত্ব যে দেশের সুগন্ধি মণ্ডন,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রসারি হৃদয়
যেই দেশে ছুটিতেছে বিচূর্ণ করিয়া
ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্রমত পুরাতন ভাবে
সে দেশ হ'তে কি প্রভো এসেছিলে তুমি ?

একদিন Iis Osiris তরে
কেঁদেছিল সেই অশ্রু স্পর্শ করিয়া
উদ্বেলিত হ'য়েছিল Nileএর নীর।
পঞ্চসখী সহ সিন্ধু আছ তুমি জাগি
সহস্র Isis ওই দারুণ ব্যথায়
অগ্নিমুখী যাতনার, নির্দ্দয় পেষণে
অভিভূত হ'য়ে করে অশ্রু বরিষণ
সেই তপ্ত অশ্রুস্পর্শে তুমি ত উদ্বেলি
উঠিলে না একবারও করিয়া গর্জ্জন ?

অনাবিল সিন্ধুস্নাত কেশরী পঞ্জাব।
গুরুগোবিন্দের শুভ্র বিভূতি পাবন
সৎসাহসের খনি সদগুণ নিলয়।
বান্দা যার লর্ড রূপা অভয়ে অক্ষোভে
বসাইল তীক্ষ্ণ ছুরী আত্মজের বুকে
সেই তুমি পূতভূমি ভারতের রোম।
সেই তুমি সর্পবেণু আলাপনকারী
Poppaea Sabina প্রেমে মুগ্ধ প্রণয়ীর
বীণার প্রলয়ঙ্কর বিকট ঝঙ্কারে
হ'য়ে আছ মুহ্যমান, এটনা তাহার
অগ্ন্যুচ্ছ্বাস, সংযমের দারুণ উদ্যমে
করিয়া রাখিল রোধ, নিখিল বিশ্বের
প্রতি লোমকূপ দিয়া উঠিছে যন্ত্রণা।

ভারতের শিবরূপী ওই চেমস্‌ফোর্ড!
Quite an Fait in his business
Indemnity indemnity মুক্তি চারিধারে
নৈষ্ঠুর্য্যে রাখিল চাপি অমিত বিক্রম।
জিত্‌লে বটে জিত্‌লে বটে
কালি দিয়ে কুলে,
Humanityর মাথা কেটে
চড়িয়ে দিলে শূলে।

এমনি ক'রে জিত্‌লে পরে
জিতেই হ'বে কাত,
হারতে হারতে দিন আসলে
করবো বাজি মাত।
Sydenhamএর বংশ যেন
গজিয়ে গজিয়ে ওঠে
পূর্ব্ব কীর্ত্তি লোপ কত্তে
এরাই যেন জোটে।
নিষ্ক্রি করা বিচার বিধান
তোমার জাতির ছিল গো
ভারত ভরা মলয় পবন
কারে হরে নিল গো।
যেমনি ছুঁলে ভারত মাটি
অমনি হ'লে নবাব,
অমনি পেলে তুড়ি ঘড়ী
নাদির শাহের স্বভাব গো।
দুর্ব্বল বলে পেষণ করে
থেঁৎলে দিয়ে মন।
স্বাধীনতার মটবকারে
ছুটছে জগীজন।
আগুন খাগী নিদয়তা
পরের রক্ত পিয়ে,
বীরত্বের পোষাক প'রে
ফুল্ল করে হিয়ে।
আমরা সরল আমরা সরল
Duplicityর ধার না ধারি,
বাঁকা পথে চল্‌তে গিয়ে
আপন পদে কুঠার মারি।
Dodoর মত আমরা হব
রইব না আর ভবে
কঙ্কাল গুলি দাঁত কিড়মিড়ি
সইতে হয় সবে।
সমাজ গেছে ভগ্ন হ'য়ে
মন হ'য়েছে খাট
মেটে ভাঁড়টী তাও ভেঙ্গেছে
সার করেছি খাট।
অর্কবাগীশ অনড্‌ন,
করি শাস্ত্র আবর্ত্তন
অনুষ্টুভের শ্রাদ্ধ করেন
বোকার কাণের কাছে।
হৃদয়ভরা নিষ্ঠীবন
প্রাণের মাঝে দুঃস্বপন
বিদ্যাডঙ্ক বেড়ান সদা
স্বার্থ করি পাছে।
Innovation Innovation
Renovatian চাই,
সবাই মিলে ভেঙ্গে চুরে
নূতন কর ভাই।
নূতন কর নূতন গড়
পুরাতনের দিন গিয়েছে।
ওই দেখ না শক্তি এসে
দুর্ব্বলেরে কোল দিয়েছে।
বৈশ্য এস বৈদ্য এস
এস সবাই কোলে
মায়ের পেটের ভাই তোমরা
এস দাদা বোলে।

যজ্ঞোপবীতের শক্তি ব্রাহ্মণের নাই
চণ্ডালের প্রকৃতি সে করিয়ে হরণ
এখনর গৌরব করে ব্রাহ্মণ বলিয়া।
কল্পনার পক্ষ তার মৈনাকের মত
ছিন্ন করিয়াছে ওই স্বার্থপরতায়।
দলদলমূলে বসি সুস্নিগ্ধ ছায়ায়
কোথা সে বরেণ্যত্রয়ী শঙ্কর গৌতম
নিশ্মল জাহ্নবীপূত ধবল হৃদয়?
যাঁর প্রাণপদ্মমাঝে বৈকুণ্ঠবিলাসী
ত্যজি কমলার পার্শ্ব, রাজিতেন সদা।
ত্যাগ ছিল ভোগস্পৃহা ভোগের মাঝারে
অচ্যুতের ভূমানন্দ, ভুলিয়া উচ্ছ্বাস

করিত সতত কেলি হৃদয়ের সাথে।
সমগ্র সরল স্বচ্ছ 'সত্যকাম' সবে.
ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবারে শান্তি-বিমণ্ডিত
পুলকের বাসভূমি তপোবনমাঝে
প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াইল, মুখপানে চাহি,
বালকের সুরভিত সিক্ত কঞ্জ সম
হৃদয়টী নিরখিয়া; আচার্য্যঅগ্রণী
সত্যকামে কোল দিয়া করিল ব্রাহ্মণ।
কোথা সে বশিষ্ঠদেব মধ্যাহ্ণ তপন
প্রতিভার দিব্যালোকে বিশ্বপূজনীয় ?
তপোগর্ব্বে, মহাগর্ব্বী বিশ্বামিত্র শূরে,
আত্মত্যাগে, গর্ব্ব তার করিয়া বিলয়,
ব্রাহ্মণ-সম্মানে তাঁরে করিল ভূষিত,
মাধ্যাকর্ষণ সম সেই জ্যোতিষ্মাণ
কোথা আছে এই বিশ্বে আদর্শ পুমান্ ?
সেই দিন আর এই দিন ভাই
সেই দিন আর এই দিন।
বামুন কি আর বামুন আছে
সে যে ছিন্ন ভিন্ন ভগ্ন হীন।
কোথায় তাহার ব্রহ্মতেজ
সত্যগত প্রাণ ?
অন্ন সে যে, কেনে বেচে
করে নাত অন্নদান!
যোগ জানে না যাগ জানে না
নহেক সে উদ্গাতা *
উদাত্ত স্বর উচ্চারিতে
স্বরিৎ স্বরের খায় মাথা
বেদের গরব করেন তিনি
জানেন নাক বেদটা কি,
মৎস্য মাংস বাসেন ভাল
বাসেন ভাল গব্য ঘি।
পাণ্ডা সেজে যণ্ডাদের
মনের সুখে দেন গালি,
গণ্ডমূর্খ স্তাবকগুলো
উল্লাসে দেয় হাততালি।
কুল্লুক ভট্টের নামটা জানা
উল্লুক ভট্টের পড়া নাই,
চাণক্যের বচনগুলা,
আওড়ান কেবল ঠাঁই অঠাঁই।
Soda খাচ্ছেন খাচ্ছেন কখন,
সাহেব বাড়ীর আস্তো Roll,
সন্ধ্যাকালে মালা খট্‌খট্
মুখে বল্‌ছেন হরিবোল।
চরিত্রবল নাইক কার
প্রাণের মাঝে শক্তি নাই,
মনের মাঝে মলিনতা
Hypocrisy সর্ব্ব ঠাঁই।
গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে এঁরা
মিথ্যা বলতে ভয় না পান,
সকল কাজেই এঁরা কর্ত্তে রাজি
খাঁই মত যদি লভেন দান।
এঁরাই আবার পরকালের
দেখান বোকায় রাস্তা,
রূপার সাজে সবাই থাকেন
মচ্ছে ধরা দস্তা।
ঢের সয়েছি আর সহেনা
ভেঙ্গে ফেল পুরাণ,
নূতন ভাবে জাগিয়ে ওঠ
মাতিয়ে তোল পরাণ।
জাগিয়ে তোল মাতিয়ে তোল
নাচিয়ে তোল অপরে,
ছুটিয়ে চল গিরির'পর
কেন জ্বালা সহ রে।
জাপান তুলিছে ইথর ভেদিয়া
আপন শির,
অর্জ্জুন সম সমরাইগণ,
মহান্ বীর।

* যজুর্ব্বেদ-পাঠক।

বর্ণভেদের খনিটী খুঁড়িয়া
স্বর্ণ চূর্ণ বাহির কর,
জীর্ণ আচার ছিন্ন করিয়া
অভিনব একমূর্ত্তি গড়।
(তখন) শিরায় শিরায় ছুটিবে বিজলি
ধরণী ধরিবে নূতন বেশ,
মলয় অনিলে আনিবে বহিয়া
আর্য্যগণের গানের রেশ।
বাল বিধবার রোদনে যাদের
হৃদয়ে লাগে না ব্যথা।
কাপুরুষ সেই নিলাজ গণের
এখনও শুনিছ কথা?
হৃদয় হৃদয় নাহি কি হৃদয়
সৎসাহসের নাহি অভিনয়?
ঢাল ঢাল ঢাল, প্রাণ দেও ঢালি,
শিরার মাঝারে, দেও অগ্নি জ্বালি,
পুলকে মানুষ উঠুক নাচিয়া
মেরু হ'তে মেরু বেড়াক ছুটিয়া।
কোথা সে মানুষ ইঙ্গিতে যাহার
মাতিয়া উঠিবে ভারত আবার?
আসিবার কথা বুঝি সে মানুষ
এখনও হেথায় আসেনি,
সে যদি আসিত, সবাই জাগিত,
ছুৎ-কারাগারে বোসে না থাকিত
তাইতে মানুষ জাগেনি।
(ওরে) পুরাতন করে যাবে ছারখারে
নূতন উঠিবে জাগি,
পরাণের মাঝে উঠিবে বাসনা
বিশ্ব পূজার লাগি।
গাহিল সাধক গাহিল আবার
তেমনি গভীর আকুল রবে।
সমাজের হেন হীন ব্যভিচার
এখনও তোমরা নীরবে যবে?
সমাজের পতি আজি কে কাহারা?
অর্থ যাদের নিকটে রয়,
শত অনাচার অবিচার তারা
করুক, কথাটী কেহ না কয়,
ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণ যারা
ধনীর চরণ লেহন করে,
কণ্ঠসূতার গরবে মাতিয়া
স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরে।
পূজার মন্ত্র ভুলিয়াছে দ্বিজ
যজন যাজন ব্যবসা আজ,
শত ছলনা, বাক্যের ফাঁদে
দক্ষিণা চুরি কেবলই কাজ;
শিষ্য গৃহের বিধবা রমণী,
ভণ্ড গুরুর লক্ষ্য স্থান,
তার পুত্রবধু করিছে হরণ,
দীক্ষাদানের করিয়া ভান,
এক চক্ষু এ হিন্দু সমাজ
অন্ধ সদা সে পুরুষ লাগি,
অবলার প্রতি শৌর্য্য দেখাতে
কুটিল দৃষ্টি রহেছে জাগি।
পতিতার তরে কাঁদেনা পরাণ,
কে তারে ফেলেছে পাপের কূপে?
কে তার যৌবন লুটিবার তরে
ধরেছিল তারে বিষাক্ত বুকে।
কোথায় সংযম কোথা উদারতা,
কোথা নয়নের জল,
কোথা সে সাধক দেবোপম ছবি
জগতের সুমঙ্গল,
সাধারণী প্রেমে মজিছে যুবক
পিতেছে তীব্র মদিরা রাশি,
তবু তার সনে করি মিশামিশি
তবুও তারে মনে ভালও বাসি,
পতিবুক হ'তে দুরাচার যদি
সতীরে কখন ছিনায়ে লয়,
পতি গৃহে তার নাহি ঠাঁই আর,

এমন বিধান এদেশে রয়।
ভ্রষ্ট পুরুষ　　গড়িছে সমাজ
বিধান তাহার সুবিধা মত ;
পাপের বোঝাটী　নারী শিরে দিয়ে
আপনি কুকাজে নিয়ত রত।
কেহ বিষ পিয়ে　মিটায় যাতনা
কেহ ইস্‌লামের স্মরণ লয়,
সমাজ পণ্যে　　কেহ পরিণতা,
সমাজ পাতকী এতে কি নয় ?
পুরুষের হীন　　হেয় ব্যভিচারে
সমাজ রহিবে হইয়ে মূক,
পুরুষ যেথায়　　স্বেচ্ছা আচারী
বোঝে সে কেবল আত্ম-সুখ !!
সমাজ ভিতরে　　মানব কোথায়
নাচিছে পিশাচ দানব ভূত,
পলে পলে পলে　　গভীর পতনে
বরণ করিছে মরণ দূত।
আজি কি সাগরে　　নাহিক সলিল
আকাশে বুঝিবা অশনি নাই,
রুদ্র রোষের　　ক্রুর কটাক্ষে
এখনও সমাজ জীবিত তাই।
আয়রে চাঁড়াল　　আয়রে কামার
আয়রে কুমার বাঁধিয়া দল,
নূতন করিয়া　　গঠিতে সমাজ
প্রয়োগ কররে আপন বল।
তোরা যে সরল　　অপাপ নির্মল,
পরাণে নাহিক কলঙ্ক দাগ ;
পুণ্যের নামেতে　　কলুষ কিনিয়া
লইতে চা'স না তাহার ভাগ।
পাপের পঙ্কিল,　　সরসীর মাঝে
(ওরা) সাঁতার দিতেছে বাঁধিয়া দল,
রূপ রূপ করি　　তৃষিত হইয়া
বাসনা-মরুতে খুঁজিছে জল।
দ্বাদশ বর্ষের　　বালিকা বধূটী
কোলেতে তাহার শোভিছে সুত।
পিতায় কামের　　জাল বিথারিয়া
করিছে আপন গোত্র পূত।
হৃদয়-বেদীতে　　বসিয়াছে কাম
প্রেম গেছে কোন দূর দেশে,
ব্যভিচারের　　ঢল নেমেছে
প্রেমিক প্রবর যায় ভেসে।
মরুর মাঝে খুঁজছে এঁরা
শীতল বারি,
দিবা নিশি বধ্‌ছে এঁরা
কুলের নারী।
নারীরে সম্মান করা এ জাতি কি শিখিয়াছে,
নারী সমাজের বাঁধ এ জাতি কি ভাবিয়াছে,
প্রতি গৃহে হাহাকার অশান্তির পরকাশ,
মনঃকষ্টে শত নারী আলিঙ্গিছে সর্ব্বনাশ॥
ওই জমিদার　　আচারে চণ্ডাল
পশু ব্যবহার করে রে ;
(তার) নথিতে নথিতে জুলুম তাড়না,
আঁখি দুটী শুধু ঝরে রে,
মুখে বাক্য নাহিক সরে রে।
ঘরেতে কৃষাণী আময় কাতর,
জ্বর-কম্পনে কাঁপে থরথর,
জল্লাদ যত নিঠুর আকার
ধরে পা'ক এসে খাটিতে ব্যাগার,
করুণ ক্রন্দন না শোনে কাণে।
স্নেহ মমতার দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
কোমলতা প্রাণ করিছে হরণ,
হৃদয় ফাটিয়া নয়ন জীবন
এ দুর্দ্দিনে নাহি দেয় দরশন
শুষ্কতা জাগে সবার প্রাণে।
Brutas বলেন :—
আমরা হইনি এখনও যোগ্য
আত্ম-শাসনে,
তবে ঐ নিধি তবে ও রতন
মিলবে কেমনে।

পূত নির্ম্মল গঙ্গার জল

নরম পন্থীর দল গো,

Let Daily News বলুন যা হয়,

জানে না ইহারা ছল গো।

গা তোল গা তোল,

উঠ শিশু ধোও মুখ গো,

এবার Moderate গণে,

ভুঞ্জিবে রাজ-সুখ গো।

ক্রমওয়েলের লীলায়

খোঁচা লেগেছিল পীলায়,

কেঁদে যেচেছিল ষণ্ড নিকর,

এস কোথা আছ রাজ রাজেশ্বর,

এত উত্তাপ নহে—দুঃখ গো।

কোথা জনমত কোথা জনগণ

জানি না বুঝি না জনেন্দ্র কেমন?

হাহাকারে ঘেরা কুটীরেতে বাস

অনাহারে নাহি বদনেতে ভাষ।

লাজের সম্মান করিতে রক্ষণ

মরণে রমণী করে আলিঙ্গন,

রোগে জীর্ণ দেহ নাহিক জীবন,

নাহিক কেহই আপনার জন,

এ জগতীতলে ব্যথায় তাহার,

দিতে প্রলেপন নাহি মিত্র আর।

সকল ব্যথার সেরা ঐ ব্যথা

ঘরে নাহি কারও ভাত;

দেশের আইন ন্যায়েতে সিক্ত

প্রতি আখরেতে তাপ।

রাজার ঘরের দুলালী ছাওয়াল

Penal Codeটী খাঁটী,

বেগুন চোরের নীল-দাড়া জেঁতে

ঘোড়ায় মারেন লাঠি।

আস্‌ছে দেশে মণ্টেগু-দান,

এবার হইব ধন্য,

ক্ষমতা এবার করিয়া জাহির

ধরণীতে হ'ব গণ্য।

লুটিয়া ভোট্‌ হইয়া সভ্য

ধরিব গগন চাঁদা।

সিংহ চর্ম্মে সাজি বাহিরিব

কেহ ভাবিবেনা গাধা।

Sinha সাহেব Baron হ'লেন

Earl হ'বেন বোস্‌,

গর্ব্বে জাতি উঠ্‌বে ক্ষেপে

হাঁস্‌বে মতি ঘোষ।

বধ করিয়া শত পাঠা

কাল কাল মোষ,

এই সমাজের নেতা এমন

Attorneyদের বোস্‌।

দারিদ ঘরের পাখাল টাকা

উড়ে চলে যায়।

বোসের ঘরের পঙ্গু টাকা

করে হায় হায়॥

হাড়ী কাঁদে অন্ন বিনা,

উদর কাঁদে ক্ষুধায়,

পেটের জ্বালায় মর্‌লে পরে

কে বল আর শুধায়?

Pitt ছিলেন Burke ছিলেন,

ছিলেন সেরিডান,

মোদের নেতা খোজেন শুধু

নির্জ্জলা সম্মান!

(এরা) নাম কিন্‌তে বাসেন ভাল

দেশের পূজা জানে কে,

গরীব থাকে কুঁড়ের মাঝে

তাদের বল মানে কে।

ঘরে কারও অন্ন নাই

নাহিক দেহে বল;

অনাহারে মর্‌ছে কত

কোথা—অশ্রুজল!

মিঞা সাহেব ঠিক বলেছেন

নেতার আবার অভাব কি

(ও ভোলা মন) নেতার আবার অভাব কি,
একতারাটী নিয়ে এস
তাড়াতাড়ি ঠাকুরঝি,
নেতার কথা বলে দি।
গ্রামের মধ্যে Tout নেতা
আউর নেতা কে,
মুখুয্যেদের বিধবাবালার
যৌবন হরে যে।
Subdivisionয়ে Deputy নেতা,
আউর নেতা কে,
তোষামদের তেল কিনিয়ে
শিংটী মলেন যে।
সহরে হচ্ছেন তিনি নেতা,
যিনি পড়েন নম্বর Gascado,
প্রতিযোগীর মানের তরী
মারতে চালান Torpedo.
হাম্ বড় আর দুনিয়া ছোট
বল্‌বার যার আছে tact,
তিনিই হচ্ছেন সহরে নেতা
যাই বল এইআদত fact.
শিবু চাট্‌ছেন সুকুর অঙ্গ,
সুকু কেষ্ট ভজেন,
আবার ইচ্ছা হ'লে অম্বিকাতে
শুদ্ধভাবে মজেন।
কেশব নগেন সাধু শিবনাথ
পেলেন নাক কলকে,
ভাঁড়ের মধ্যে সজল দুগ্ধ,
উঠ্‌ছে কেমন চল্‌কে।
দেশটারে যদি উদ্ধারিবে
নীতির বাঁধন ক'স,
স্বভাবটারে ধোপ দিয়ে নিয়ে
ঐ সরেস্তে রস।
॥ডাম্মুখথ চুলোয় যেল,
উঠল রে জেগে ম্যাটসিনি,
রবির রাধার নূপুর বাজে,
টিমিকি টিমিকি রিণিকি ঝিনি।
কাঙ্গাল আমরা দারিদ্র আমরা,
দেহেতে নাহিক রক্ত,
রুধির ব্যতীত কাউন ভখিয়া
(এজাতি) কেমনে হইবে শক্ত।
বিলাস জোঁকে পিতেছে রুধির,
রুধির যেটুকু আছে,
কত শত লোক অনাহারে মরে,
আধা ভোজী তবু নাচে।
মাথার উপর ঢেউ তুলেছে
চিকণ চুল।
জমার চেয়ে খরচ দ্বিগুণ
গোড়ায় ভুল।

সুতোবাচ—

শুন বৎস একবার কর অবধান,
কি কি গুণে নেতা হয় করিছি ব্যাখ্যান।
স্বার্থপর হ'বে বটে স্বার্থপরতায়
লুকায়ে রাখিবে যত্নে মনের গুহায়।
পরদুঃখে অশ্রুজল করিবে বর্ষণ
করিবে না, কভু অর্থ পরে বিতরণ।
প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড যদি হ'তে পার,
উতরিবে Politics-ভীম পারাবার,
ভাষা মধ্যে সারবত্তা থাক্ বা না থাক্,
Choice word গুলির বসাইবে থাক্।
ম্যাটসিনির ইতিবৃত্ত আগ্নেয় ভাষায়,
হাত নেড়ে মুখ নেড়ে বলিবে সভায়।
বক্তৃতায় সভা যেন উঠে বিকম্পিয়ে,
পরের ছেলেরে দিবে-বিপদে ঠেলিয়ে।
Agitation, cogitation and
oppression বুলি,
জিহ্বারূপ rifleর মারাত্মকগুলি,
Affectation কিছু নহে কেবল অভ্যাস
রাজনীতি মোক্ষযোগ প্রজ্বলিত হ্লাস।

শুভকর্ম্মে তবে চাঁদা করিবে চয়ন,
আত্ম তরে "সিংহ অংশ" করিবে রক্ষণ,
দৈনিকে আপন কীর্ত্তি করিবে বাহির,
স্বারক রাখিবে গুণ করিতে জাহির।
অশান্তিকে ঢেলে দিল শান্তি নিকেতনে,
রবির চোখে জল এসেছে গোপন বেদনে।
মানীর মানটা কেড়ে নিয়ে
যারা রবিরে বড় করতে চায়,
তাদের মত উত্তর কি আর
কোথায় মেলে বসুধায়।
রবি তুমি যাই কর ভাই,
আর পুষনা Bow-wow,
তেড়ে লোকে কামড় দিতে
করে এরা ঘাউ ঘাউ।
তোমার fascination গুলো
যার সবেতে দাপ দেয়,
সত্যি বলছি দু-ইঞ্চি ভাই
তাদের মাংস তুলে নেয়।

Doddiman doddiman
Put out your horn,
Here comes a thief
To steal Robi's corn.
ক্ষুদ্র বাংলা মল্লুকেতে
চামচিকে আর উল্লুকেতে,
সাহিত্যের বাগান খানি
নষ্ট করে দিল।
দত্তবাড়ীর উমাপতি
সেজে থাকেন পুরুষ সতী,
এখন তাহার হৈনাত্ম গো,
জগত জেনে নিল।
যাদবেশ্বর স্নিগ্ধ রবি,
যাদবেশ্বর স্বভাবকবি
চড়চড়ি তিনি রাধেন না গো,
পাকান তিনি রাবড়ী,
রঙ্গিন ভাবের নেশায় ভোর
ছোকড়া কবি ক্ষিপ্র চোর,
Shelly Kitsর ভার চুরিয়া
মাথায় বাগেন পাগড়ী।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১৭৯২ শকাব্দের ১৫ই শ্রাবণ শনিবার সরযূপারী গ্রহবিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণের বাস নবদ্বীপে ছিল। তাঁহার পিতামহ শেষ জীবনে ন্যূনাধিক ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে কোন আত্মীয়ের অনুরোধে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মহাটী গ্রামে এবং তাহার পর স্বচ্ছতোয়া চন্দনা নদীর তীরে খালকুলা গ্রামে বাসভবন প্রতিষ্ঠা করেন। এখন পুনর্ব্বার ইহারা খালকুলা পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপেই বাস করিতেছেন। সতীশচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রম কালে গ্রাম্যবিদ্যালয় হইতে মধ্য-ইংরাজী ও মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। উহার তিন বৎসর পরে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহার পর যথা সময়ে এফ-এ, বি-এ, ও এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-

এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটী সুবর্ণ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী-সভা হইতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধীতে ভূষিত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃঅব্দে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় চারি বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ঐ সময়ের ইনি নবদ্বীপের প্রধান কবি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকটে যথাক্রমে সংস্কৃত কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ইহাকে সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি-আই-ই মহোদয়ের সহিত তিব্বতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। অভিধান প্রণয়ন কার্য্য উপলক্ষে ইহাকে দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতে হয়। ঐ সময়ে তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীয় সুশিক্ষিত বিখ্যাত লামা যুনছোগ ওয়াবডান দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতেন। সতীশচন্দ্র এই লামাকে নিয়মিত বেতন প্রদান পূর্ব্বক দেড় বৎসর কাল ইহাঁর নিকটে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে "কাবাব হুলদেন" এবং "সেরা কং যু" সমধিক উল্লেখযোগ্য। অভিধান প্রণয়ন শেষ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় অবস্থান কালে ইনি সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় শ্রমণগণের নিকট পালি ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইনি ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে পালি ভাষায় এম-এ, পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া একটী সুবর্ণ পদক ও একশত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সিংহল কিম্বা ব্রহ্মদেশ হইতে কেহ এই পরীক্ষা প্রদান করেন নাই। ভারতবর্ষে পরীক্ষক না পাওয়ায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিয়ান মিঃ টনি ও ক্যাম্ব্রিজের অধ্যাপক কাউয়েল সাহেবকে পরীক্ষক নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারা লণ্ডন-ইউনিভার্সিটীর পালি ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক সুবিখ্যাত রিজ্ ডেভিডস্‌কে পালি ভাষায় এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। পরীক্ষান্তে ডাক্তার রিজ ডেভিডস্ নম্বর প্রেরণপূর্ব্বক ইহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে পৃথক পত্র লেখেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে তথা হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে বদলি হন।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিব্বতের তাসিলামা বৌদ্ধ তীর্থ সকল সন্দর্শনের নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করেন। ঐ সময়ে ভারত-গভর্ণমেণ্টের আদেশে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র তাঁহার সহিত থাকিয়া বুদ্ধগয়া, বারাণসী, সারনাথ, আগ্রা, রাওলপিণ্ডি, তক্ষশিলা প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সমূহের ইতিবৃত্ত ও তত্রত্য অনুষ্ঠানাদির বিবরণ তিব্বতীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং বরাবর দোভাষীর কার্য্য করেন। ইহাতে

তাসিলামা পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের পরিতোষ ভারত-গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, এবং পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণকে বহু বহু ধন্যবাদসহ মহাসম্মানের উপহার "খাতাগ" (একপ্রকার রেশমের উত্তরীয়) প্রদান করেন। সকলেই জানেন, পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কি অধ্যাপনা, কি বিদ্যাচর্চ্চা, কি প্রবন্ধ প্রণয়ন ও কি পুস্তক রচনা, সকল বিষয়েই খ্যাতি অসাধারণ। তজ্জন্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার সাহেব ইহাঁকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদানের জন্য পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ইহাকে "মহা-মহোপাধ্যায়" উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসরেই বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জয়েণ্ট ফাইলোলজিক্যাল সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রদান করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে উহার ফল বাহির হইলে ইনি "ডক্টর অফ ফিলসফি" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইউনির্ভাসিটির নূতন বিধি অনুসারে ইনিই প্রথমে পরীক্ষা দিয়া এই উপাধি লাভ করেন। এবং ঐ সময় গ্রীফিথ প্রাইজও লাভ করেন।

১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি বিশেষভাবে পালিভাষা ও বৌদ্ধ দর্শন শিক্ষার জন্য সিংহলে, বেদ ও হিন্দু দর্শন শিক্ষার জন্য বারাণসী ধামে ও ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার জন্য একজন ভাষাতত্ত্ববিদের নিকটে ডেপুটেসনে যাইতে আদিষ্ট হন। তাহার পর পণ্ডিত সতীশচন্দ্র ঐ বৎসরের জুন মাসে সিংহলে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অধিনীয়ক সুমঙ্গল মহাস্থবিরের (সুমঙ্গল মহাথেরোর) নিকট অধ্যয়ন করেন। অনুরোধপুর, ক্যাণ্ডি, গল, কলম্বো (রাজধানী) প্রভৃতি স্থানে তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্যক্তির দ্বারা আহুত হইয়া পণ্ডিত সতীশচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে সকলেই অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক সভায় আশাতিরিক্ত জনতা হইত। সিংহলের শিক্ষিত নর নারীগণ পণ্ডিত সতীশচন্দ্রকে আপনার লোক মনে করিতেন।

সিংহল হইতে প্রত্যাগত হইয়াই ইনি বারাণসী ধামে গমন করেন। তত্রত্য কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ছয় মাস কাল বারাণসীধামে অবস্থান করেন। সেখানে মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট শ্রুতি ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতাচার্য্যের নিকটে রামানুজ দর্শনের মত, পণ্ডিত জীবনাথ ঝাঁ ও পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের নিকটে ন্যায় দর্শনের আলোচনা করেন এবং মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকটে সকল বিষয়েই দুরূহ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতেন।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া থিবো সাহেবের নিকট জার্ম্মান ভাষা ও ইউরোপীয় দর্শনের চর্চ্চা করেন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাবণ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও সংস্কৃত বোর্ডের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার

লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ইনি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নবপ্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে তিব্বতীয় ভাষায় পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং পাঁচশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বৎসরেই ঢাকা ইউনিভারসিটি কমিশনের অন্যতম মেম্বর নিযুক্ত হইয়া উহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন। ৯১২ খ্রীঃ অব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র অল-ইণ্ডিয়া-দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বারাণসী ধামে সমাহূত বিরাট সভার সভাপতির পদে বৃত হন ও "সিদ্ধান্ত মহোদধি" উপাধি লাভ করেন। ঐ সভায় জার্ম্মাণ পণ্ডিত প্রোফেসর জ্যাকবি উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি অল-ইণ্ডিয়া-শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজপুতনার যোধপুর নগরে সমাহূত বিরাট সভার সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯১৪ খ্রী অব্দের জুন মাসে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি-এইচ-ডি, আর্য্যাবর্ত্তের হরিদ্বার মহাতীর্থে যাবতীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সমাহূত নিখিল সংস্কৃত সমিতি (All India Sanskrit Conference) নামক মহাসভার সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা বাদে তিনি যশোহর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনার সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহার প্রণীত কতকগুলি গ্রন্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল।—বাঙ্গালা গ্রন্থ—(১) আত্মতত্ত্ব প্রকাশ (২) ভবভূতি, (৩) বুদ্ধদেব। সম্পাদিত সংস্কৃতগ্রন্থ।—(১) লঙ্কাবতার সূত্র, (২) স্রগ্ধরা স্তোত্র (৩) ন্যায় প্রবেশ, (৪) পরীক্ষা মুখসূত্র, (৫) অবদান কল্পলতা। পালি গ্রন্থ।—(৬) কাচ্চায়নের পালি ব্যাকরণ। তিব্বতীয় গ্রন্থ:—(৭) খাছোহ। (৮) সো—সোর—থোর পা। (৯) সিতুই তুম—ভাগ (১০) অমর কোষ (তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত) (১১) অমর টীকা, কামধেনু। ইংরাজী গ্রন্থ:—(১২) প্রীমস্-ল। (১৩) মিডিভ্যাল লজিক,(১৪) বাৎস্যায়ন ভাষ্যানুসারে গোতম সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ। (১৫) সংস্কৃত রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ। এতদ্ভিন্ন ইনি ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি, বুদ্ধিষ্ট টেকস্‌ট-বুক সোসাইটি প্রভৃতির জার্ণালে ও অধিকাংশ বাঙ্গালা মাসিক পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিগত তিন বৎসর ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার পত্রিকাধ্যক্ষ ও ১৮ বৎসর বুদ্ধিষ্ট টেকস্‌ট সোসাইটীর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। *

---

* তিনি নব্যভারতের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন. তিনি নিম্নলিখিত গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ নব্যভারতে লিখিয়াছিলেন, ১৩০১—অগ্রহায়ণ, আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহতত্ত্ব, ১৩০২—শ্রাবণ, সংসার দুঃখ ও মুক্তি, ১৩০২ আশ্বিন এবং কার্ত্তিক, জন্মান্তর সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের মত ১৩০৪—চৈত্র, পঞ্চস্কন্ধ ও প্রপঞ্চস্কন্ধ; ১৩০৫—আশ্বিন, নির্ব্বাণ, ১৩০৬—পালিভাষা, শ্রাবণ, ধম্মপদ; আশ্বিন—কালিদাসের সমসাময়িক দিঙ্‌নাগ; ১৩০৭ আশ্বিন, বুদ্ধদেবের জন্মকথা, ফাল্গুন, দেবদূত; ১৩০৮—বৌদ্ধধর্ম্ম সমালোচনা, ১৩১০—জ্যৈষ্ঠ, মৌর্য্য বংশের উৎপত্তি, ১৩১২—মাঘ একখানি তিব্বতীয় বৌদ্ধফলক। তিনি কেবল যে নব্যভারতের বন্ধু ছিলেন, তাহা নহে; আমাদের পরম সহায় ছিলেন। তাঁহার নিকট যে সদ্ভাব ও ভালবাসা পাইয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিব না। আশ্বিন মাসে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে আমাদের পুরীর "কামিনী কুটির" তাঁহাকে দিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমরাও পুরীতে ছিলাম। দেশোন্নতি সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা

এইরূপে বিদ্যানুশীলনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে, ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হন। তাহার বন্ধু বান্ধব ও ডাক্তারের পরামর্শানুসারে তিনি বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে তিন মাসের ছুটী গ্রহণ করেন। তিনি এত-দূর কর্ম্মপ্রিয় ছিলেন যে, ছুটির তিন মাস কাল কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে অতিশয় কষ্ট বোধ করায় ৬ই এপ্রিল তারিখে তিনি পুনরায় স্বকার্য্যে যোগদান করেন। অতিরিক্ত কর্ম্ম হেতু তিনি ২৫শে এপ্রিল (১৯২০) রবিবার বেলা ২টার সময় হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগকর্ত্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। কলিকাতার চিকি-ৎসকগণের এবং তাঁহার বন্ধুগণের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি ঐ দিবস রাত্রি ৯টার সময় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে—তাঁহার বন্ধুবর্গ সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ হর্ণেল, সিংহলের বৌদ্ধ হাইপ্রিষ্ট-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার শোকগ্রস্ত পরিবারের নিকটে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু বাঙ্গালা কেন, সমগ্র শিক্ষিত-জগতের একটী মহা ক্ষতি হইল।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বহু পরি-শ্রম ও বহু গবেষণা করিয়া 'History o: Indian logic, নামক একখানি বিশা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে পুস্তক খানি যদিও সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহা জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইল না, ইহা অতী দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু তাঁহার এই শে পুস্তকখানি এমন অনুশীলন ও গবেষণার ফ যে, শিক্ষিত সমাজে ইহা নিশ্চয়ই আদৃত হইবে এবং তাঁহার শেষ জীবনকে উজ্জ্বল করি রাখিবে।

ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জীবনের সম্বল হইয়া রহিয়াছে। যেমন তাঁহার অগ্রজ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহা-শয় ছিলেন, তেমনি তিনিও ছিলেন যেন মাটীর মানুষ। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে অহঙ্কার ছিল না, সদ্ভাবে কৃত্রিমতা ছিল না, দেশানুরাগে কপটতা ছিল না, ভালবাসার শিথিলতা ছিল না। তাঁহারা এই সকল চরিত্রগুণে সকলের হৃদয়ে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই অজাত-শত্রু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষাকে এমন ভালবাসিতেন যে,তাহাতে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেন। এ দেশের এমন কোন সদনুষ্ঠান ছিল না, তাহাতে তাঁহা-দের প্রাণের যোগ ছিল না। ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার দুই জনই আজীবন-সভ্য ছিলেন। এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় দুই জনই মৃত্যু পর্য্যন্ত কাজ করিয়া-ছিলেন। দুই জনই প্রাণ দিয়া, অর্থ দিয়া, পুস্তক, গায়ের রক্ত দিয়া সভার সেবা করিতেন। যেমন উদারতা তেমনি সচ্চরিত্রতা, যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি পবিত্রতা—উভয়ে যেন ছিলেন, সোণা সোহাগা। ফরিদপুর এরূপ লোকের অভ্যুদয়ের কারণ হইয়া ধন্য হইয়াছে। ফরিদপুরের দুর্ভাগ্য যে, দুই জনই অল্প বয়সে একই সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সতীশচন্দ্র জীবনের শেষ দিন কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া উগ্র ঔষধ সেবনে যে বমন করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেই শিরা চিড়িয়া যায় এবং অজ্ঞান হইয়া পড়েন। কবিরাজী চিকিৎসার কলঙ্ক ঘোষণা করিবার জন্য এই ঘটনা যেন ঘটিয়াছিল। সতীশচন্দ্রের অসাময়িক তিরোধানে বাঙ্গালার যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে কি না সন্দেহ। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা সকলেই হাহাকার করি-তেছি। এই দারুণ শোকে বিধাতার শান্তিধারা বর্ষিত হউক।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে।

১

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার !
বিধির দারুণ বিধি
একে একে স্নেহ-নিধি
চলে যায় বঙ্গ তব করি অন্ধকার !
একটী প্রাণের ক্ষত
না শুকাতে বজ্র শত
অলক্ষিতে মহাকাল হানে অনিবার !
না ফুরাতে অশ্রুরাশি
অশ্রুর প্লাবন আসি'
ভাসাইয়া আশা-শান্তি তুলে হাহাকার !
একি অভিশাপ কার,
বুঝি না যে মা আমার !
সোণার সংসার তব হল ছারখার !
কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার !

২

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার !
বিদ্যা আর বিনয়ের
বিগ্রহ যে জগতের,
ঔদার্য্য ও সারল্যের পূর্ণ-অবতার,
সদাচারী, ধর্ম্মপ্রাণ,
কর্ম্মপ্রিয় সুসন্তান,
আচার্য্য সতীশচন্দ্র নাহি আজি আর !
প্রসন্ন আননখানি,
গম্ভীর প্রশান্ত বাণী,
দুর্ল্লভ যে হ'ল আজি দগ্ধ বসুধার !
জীবনের অর্দ্ধপথে,
অসমাপ্ত পুণ্য-ব্রতে,
অস্তমিত দীপ্ত রবি মূর্ত্ত-প্রতিভার
কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার!

৩

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার !
'তব বাণী-তপোবনে
তোমার অশ্রুর সনে
মিশাব আমরা আজ অশ্রু-পারাবার !
সজ্জন-স্বজন-হারা
মর্ত্ত্যভূমি অন্ধকারা,
'শোকার্ত্তের আর্ত্তি বুঝি নহে ঘুচিবার !
গৌরবের জয়-কেতু
সৃষ্ট শ্মশানের হেতু !—
এসেছি তা' উৎসর্গিয়া—একি ভুলিবার !
শান্তি-সান্ত্বনার কথা
কহিবে কে আজি বৃথা—
অন্তরে গৈরিক-স্রাব গর্জ্জে অনিবার !
কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার ॥

৪

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা, কাঁদ আরবার !
কাঁদ রবি-শশী-তারা,
কাঁদ বায়ু ক্ষিপ্ত পারা,
কাঁদ কাঁদ স্রোতস্বিনী প্লাবি' উভ ধার !
বিহঙ্গের গীত-স্বরে
পড়ুক রে অশ্রু ঝরে,
বহুক প্রসূন-হাসি শোক-সমাচার !
অমর সতীশ নাই !
তমাচ্ছন্ন চারি ঠাঁই !
বিশুষ্ক নির্ঝর বিশ্বে প্রীতি-মমতার।
কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা,
অশ্রুর তর্পণ-গাথা
রচে আজি দীন কবি দীনা চট্টলার
মিশাইয়ে মর্ম্মভেদী অশ্রু আপনার !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাময়িকী।

---

(১)

এতদিন পর, হণ্টার-কমিসনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এ দেশের প্রবাদ এই, "যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।" এ রিপোর্টেরও সেই দশা হইয়াছে। ডেইলি নিউস বলেন— "রিপোর্ট "White-washy" ধরণের হইয়াছে।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এইরূপই হইবে। ইংলণ্ড এখন কোন্ পথে চলিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বার্ক, পীটের রাজত্ব আর নাই,—এখন সব শেয়ালের এক ডাক। ভাল যে, এখন সকলেই ধরা পড়িয়াছেন। পাচাটাচাটি ইহাতে যদি কিছু কমে। দেশীয় কমিশনারগণ স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারাও সত্যাগ্রহের দোষ দিয়াছেন। ইংরাজেরা বলেন, তেমন অন্যায় হয় নাই, দেশীয়েরা বলেন, খুব অন্যায় হইয়াছে। আর মণ্টেগু বলিতেছেন—"বেশী অন্যায় হয় নাই, এখন চুপ চাপ থাকাই ভাল।" তথাস্তু !! চুপ চাপ না থাকিয়া আমরা করিবই কি? ভারতের অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে, কোনটা আমরা হজম করি নাই? কোন্ সমস্যার সদুত্তর মিলিয়াছে? ন্যায় ও অন্যায়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ—এ সকলের বিচার ভুলিয়া গিয়া আমরা ভ্যাবাগঙ্গারাম্ সাজিয়াছি। হায় জালিয়ানওয়ালা-বাগ—তুমি এখন স্মৃতি-চিহ্ন অঙ্কে ধারণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়; গান্ধি ঘুমান, তিলক প্রায়শ্চিত্ত করুন, সুরেন্দ্রনাথ ঝগড়ার পুটুলি বাঁধুন, সিংহ লাটগিরির স্বপ্নে মাতুন, আর আমরা সুখ দুঃখ ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়ি !! যাহা হওয়ার হইয়া দিয়াছে, আর কি বাকী আছে? অশ্রু, দয়া মায়া ভুলিয়া তুমিও এখন অক্ষি-কোটরে লুকাইয়া থাক বা শুকাইয়া যাও !

(২)

সাহেবের পা-চাটাচাটি আর ভাল লাগে না। আমাদের কোন ক্ষমতা নাই যখন, তখন নীরব হইয়া যাওয়াই ভাল নয় কি? তুর্কীর ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, এখন নিজাম বলেন, আর গোলমালের প্রয়োজন নাই, আবার পা-চাটাচাটি আরম্ভ কর। পরন্তু গোলমালকারীদিগকে শাস্তি দিতেছেন ! পাচাটাচাটিকে এ দেশে যে যত সিদ্ধ, তাহারই মান গৌরব তত অধিক। পাচাটাচাটির দিন আরো ঘনাইয়া আসিতেছে, কেন না, রিফরম স্কিমের নূতন নির্ব্বাচন সন্নিকট ! এখন যাহার যত ক্ষমতা—তাহা লইয়া আসরে নামিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আর পাচাটাচাটি ভাল লাগিতেছে না। মডারেট-দল তাহাতে দিন দিন সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। তুর্কীর কথা এখন ধামা চাপা দিয়া, নব তেজে, নব গৌরবে সকলকে সাজিবার জন্য আহ্বান আসিতেছে। বন্ধু, এই সঙ্কটে তুমি কি করিবে?

(৩)

গ্রামে গ্রামে সভা বসিতেছে; আর বন্ধু, তুমি উল্লাসে প্রমত্ত হইতেছ? সংবাদ আসি

কি কত পরস্ত্রী-হরণ হইতেছে, কত ব্যভিচারীর বুক ফুলিতেছে, কত অত্যাচার দিক্‌দিগন্তে ছুটিতেছে,—কত অত্যাচার, লুণ্ঠন, ও লাঞ্ছনা অস্ত্র শানাইতেছেন। নিরীহ লোকদের আর গ্রামে বাসের স্থান নাই, সদা অত্যাচারের ভয়ে তাঁহারা ম্রিয়মাণ। রায়ত-সভার কথা শুনিতে ভাল, বলিতে ভাল, প্রচার করিতে ভাল; কিন্তু রায়তদের নীতি হীন চরিত্রের জাগরণ দেখিতেছ কি? ক্রমেই এ দেশে জাগিতেছে অবাধ ডাকাতি, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, দুষ্কার্য্য,—আরো কত কি? এখন যাইতে পারিলেই ভাল হইত, আর সহ্য হয় না! ভেদাভেদ-যজ্ঞে কে জীবনাহুতি দিবে? যে জাগে, সে জাগুক। নব নির্ব্বাচন যুদ্ধের সময় আজ দল বেদল সাজ, সাজ, সাজ!

(৪)

সে কালে ছিল, আমি না, তুমি; একালে ধ্বনি উঠিয়াছে, তুমি না, আমি। এদেশের ঋষি যুগের লোকেরা আত্ম-বিলোপের জন্যই চেষ্টা করিতেন; এ বাহ্যাড়ম্বর-যুগে আত্মা-ঘোষণেরই সর্ব্বত্র চেষ্টা! প্রাচীন কত ঋক্‌, কত গাথা, কত কথা, কত উপদেশ, কত সূত্র এদেশে প্রবর্ত্তকের বা প্রতিষ্ঠাতার নামহীন হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, আর এযুগে "উহারা কিছুই নয়, আমরাই সকল করিয়াছি"—এইরূপ আত্ম-বাণীই ঘোষিত হইতেছে। গান্ধী বড়, না তিলক বড়? সুরেন্দ্রনাথ বড়, বা সি-আর্ দাস বড়? এসব কথার বাকচাতুর্য্য আর ভাল লাগে কি? হণ্টার রিপোর্ট দেশকে মসীসম কাল করিয়াছে, তুর্কীর নির্দ্ধারণ এদেশকে একেবারে মাটীতে মিশাইয়াছে, এখন "আমি বড়, আমি বড়"—একথা আর শুনিতে চাহি না। বড় তোমরা সকলেই, কিন্তু কেহই ত দেশকে রাখিতে পারিলে না, এই যা দুঃখ! সিংহ, বন্ধু, ঐ দেখ, সদর্পে আজ দলে মিশিয়াছেন! আর কিসের বড়াই করিবে? কাহার গুণ গাইবে?

(৫)

কথা এই—পাপকে তুমিও না, আমিও না, কেহই দমন করিতে পারি নাই, পারিতেছি না, পারিব না; এমন কালী-মুখে সকলকে এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে। আস্ফালন ছাড়িয়া এখন নীরবতা অভ্যাস কর। কিসের রিফরম স্কিম, কিসের জয়োল্লাস! সে কেবল পাপেরই কারণ, অসুরদের দুর্জ্জয় প্রতাপ ঘোষণারই সংকল্প। জানিয়া রাখ, বেসেণ্টও নয়, চেমস্‌ফোর্ডও নয়, মণ্টেগুও নয়—কেহই তোমাদের বন্ধু নন্। ফণীর ফণা বিস্তারিত হইয়াছে, এমন তুমি, আমি ও সে—সকলকে বিষে জর্জ্জরিত হইতে হইবে। প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও। নিজের পাপকে নিজে দমন করিতে শেখ, নচেৎ আর কিছুতেই আশা নাই। শক্তি-শেল বাণে সকলের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, হায়, এ হেন দুর্দ্দিনে সংযম-পূত লক্ষ্মণেরা কোথায়?

(৬)

যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহারা বেশ করিতে-ছেন! এত যন্ত্রণা সহ্য করা সহজ কি? দিন দিনই বঙ্গের মহারথীগণ চলিয়া যাইতে-ছেন, জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইতেছেন, আর আমরা পড়িয়া রহিলাম কেন? রহিলাম শুধু কেবল ভারতের দুর্দ্দিন দেখিতে!! এই যে উৎকলের একাঙ্গ পুরীর দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতেছি, আর প্রাণ অস্থির হইতেছে, কিছুই ত করিতে পারিতেছি না।

বার্দ্ধক্যে শরীর অবসন্ন, অর্থহীন, সামর্থ্যহীন, সহৃদয়তা-হীন, পড়িয়া পড়িয়া কেবল চক্ষের জলে ভাসিতেছি। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু সিংহ, শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস, শ্রীযুক্ত পুরীর পুলিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মহোদয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কত চেষ্টা করিতেছেন, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া আছি! ইচ্ছা, ছুটিয়া সেথানে ভ্রাতাদের সাহার্য্যার্থে যাই, কিন্তু শক্তিতে কুলায় না! বিধাতা পুরীর দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদিগের সহায় হউন।

(৭)

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭, বৃহস্পতিবার, ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দিন গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শান্তিকুটীরে উপাসনা ও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগন্মোহন দাস, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় তদীয় জীবনের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। এতদিন পর, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিতেছেন, তাহাতে আমরা বড়ই আনন্দিত। কিন্তু লোক এত অল্প কেন হইল, তাহাই ভাবিতেছি। শুনিয়াছি, ৺উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দও মহাযাত্রার পূর্ব্বে প্রতাপবাবুর প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া অনুশোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তবুও এই মহাত্মা উপেক্ষিত কেন? কেশবচন্দ্রের পর প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও এমেরিকায় তাঁহাকে বহু বহু পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে এরূপ কেন হইল? এক দ'লো ভাবই ইহার কারণ। প্রতাপচন্দ্রের প্রতি যে অবিচার হইয়া গিয়াছে, এ দেশে একালে তেমন আর কোথাও হয় নাই। এরূপ উপেক্ষিত, অপমানিত, নিন্দিত এদেশে এ যুগে আর কেহই হন নাই। ব্রাহ্মসমাজের এ কলঙ্ক কখনও ঘুচিবে না। কামাখ্যানাথ ও জগন্মোহনের প্রতি প্রতাপ-মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য অত্যাচার না হইলে হয়!

জাগরণ।

শত যুগ পরে মধ্যপথে
ভারতের মহাপ্রাণ হতে
মহাগান এক উঠেছে জাগিয়া।
প্রভাতের প্রথম আলোকে
নিদ্রালস্য ভাঙ্গিয়া কুহকে
জাগরণ-গীত উঠেছে বাজিয়া ॥ ১
জেগে ওঠ কুমায়ো না আর—
দীক্ষা লও আগুন খাবার,
মিলনের মহামন্ত্রে স্নান করি'।
মিলে জুলে করে যাও কাজ—
হার জেত—হবে নাকো লাজ—
মহামন্ত্র এই প্রাণে লও ভরি' ॥ ২
জমীদার প্রজা কেবা কোথা—
বুঝি' লয়ে কিসে কার ব্যথা—
প্রেমের বাঁধনে বাঁধগো সবারে।
শুনোনা শুনোনা কারো কথা—
বাস্তুভিটাহীন যারা সদা—
প্রাণের বাঁধন চাহে টুটিবারে ॥ ৩

আর না—আর না—বহায়ো না
রুধিরের স্রোত ; আনিও না
বিবাদ বিচ্ছেদ যতেক অপ্রেম।
তাহে শুধু জানিও নিশ্চয়
হবে ঘোর শক্তি-অপচয় ;
হবে না কল্যাণ ; দূরে যাবে ক্ষেম ॥ ৪
জমীদার প্রজা শুধু কেন—
কতবিধ লোক আছে জেনো
সকলেরি প্রাণে দেখি জাগরণ।
এধারে ওধারে চারিধারে,
ক্ষেত্রধারে নদীর কিনারে,
ঢেলে দেয় প্রাণ যুগের নূতন,
কল-কারখানা শত শত—
মজুর খাটিছে তাহে কত—
দেখিতে পাওনা তাহে কি গো তুমি
শ্রমজীবী কৃষকের মাঝে
স্বরগের আশা ধরে আছে—
মহা জাগরণ মিলনের ভূমি ? ৫,৬
আমি তাহে পাই শুনিবারে
ধ্বনি পরে ধ্বনি আসিবারে
মহাজাগরণ মিলনের গীত।
ছুতার কামার কিবা রাজ,
যেখানে যে করে যত কাজ,
সকলেতে গাঁথা জাগরণ-ভিত ॥ ৭
দাঁড়ি যবে এক মনে গেয়ে
তালে তালে নৌকা চলে বে'য়ে,
দাঁড় ফেলে অবিশ্রাম ঝপাঝপ,
সবল পেশল মুটে যত
এক মনে ফেলে অবিরত
ধান্যবস্তা পরে পরে ধপাধপ,
তাদের সেই তালের মাঝে
তাদের সেই কর্ম্মের মাঝে
জাগরণ শুনি ঝঙ্কারিছে সদা।
ঘুচে যায় সেই জাগরণে
মুছে যায় মহান্ মিলনে
ছোটখাটো ভেদ মনের পরদা ॥ ৮,৯
গাও তবে গাও প্রাণ খুলে,
ভেদাভেদ ভেঙ্গে দিয়ে মুলে,
আমার বুকের বুকচেরা ধন !
অনন্ত জাগরণের গান
মিলনের উন্নতির প্রাণ
প্রাণ মন খুলে গাও অনুখন ॥ ১০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **প্রধীককর্ম্মকার বা কর্ম্মার-ক্ষত্রিয়** রায় বর্ম্মণ প্রকাশক, মূল্য ২৲। বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্ম্মকারদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। জাতীয় ইতিহাসের ইহা এক অধ্যায়। এই সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি হউক।

২। A. Short History and Ethnology of the Cultivating Pods. Populer Edition, Ans 10 only. By Mahendranath Karan. জাতীয়ত্ব বিষয়ক পুস্তক। এপুস্তকে গুভীর গবেষণার পরিচয় পাইয়া উপকৃত হইলাম।

৩। কবিকথা। — দ্বিতীয় খণ্ড — ভাস। শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ২৲। ৫১৬ পৃষ্ঠায় পুস্তক, মূল্য ২৲। দুর্ম্মূল্য কাগজ ও ছাপার দিনে ইহা কত সস্তা।

ভাসের নাটকাবলী বহু প্রাচীন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিস্তারের পর যে সময়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিকধর্ম্মের প্রাধান্য একেবারে নষ্ট হয় নাই, সেই সময়ে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁহাকে চাণক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন।

ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট ভাসের গ্রন্থাবলীর উদ্ধার সাধন করেন। এখন নিখিলনাথ এই অমূল্য গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়া ধন্য হইলেন। এই সব গ্রন্থের অনুবাদ ইহাতে আছে—

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসব দত্ত, অবিমারক, চারুদত্ত, প্রতিমা, অভিষেক, বাল-চরিত, মধ্যম, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য, দূত-ঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ। এই গ্রন্থে এই সব চিত্র আছে—স্বপ্নালাপ, প্রিয়তমাদর্শনে, অলঙ্কারন্যাস, প্রতিমাদর্শন, রাসলীলা কবচদান।

নিখিলনাথ রায় বঙ্গদেশের একজন প্রধান ঐতিহাসিক। তাঁহার গবেষণায় বহু পরিচয় আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থ-সকলের উদ্ধার-সাধন করিয়া গ্রন্থ-কার বাঙ্গালা ভাষার মুখ উজ্জ্বল করিলেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাক্ বিক্রয় করিয়া মহা ধনী হইলেন, নিখিলনাথ তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা হেয় নহেন, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে এহেন ব্যক্তির আদর নাই। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রভূত অধিকারের পরিচয় পাইয়া আমরা তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় গ্রন্থকার বাঙ্গালার গৌরব। গল্প-প্রধান-যুগে তাঁহার গ্রন্থের আদর না হইলে আমরা মর্ম্মে মরিয়া যাইব। বাঙ্গালার অধিকাংশ মাসিকে প্রতি মাসে ৫।৬টী করিয়া গল্প প্রকাশিত হইতেছে, এবং তাহা বাজারে খুব কাটিতেছে। এই কবিকথা এ হেন বাঙ্গালায় আদৃত না হইলে বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

৪ সত্যানুসরণ। প্রকাশক, শ্রীঅতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথায় অতি সুন্দর উপদেশ। এরূপ উপদেশপূর্ণ বিবৃতি সচরাচর দেখা যায় না, যেন রাম-কৃষ্ণ-কথামৃত। যে মহাত্মা হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাকে শত প্রণাম।

৫। শিশুপালন। ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম-বি, মূল্য ।৵ আনা। স্বাস্থ্য সমাচার পুস্তিকা নং ৩। এই পুস্তকখানি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। এদেশে শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশু-পালনে অজ্ঞতা বশতঃই এরূপ হইতেছে। এই একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া শিশু রক্ষা কল্পে জননীগণ চেষ্টা করিলে অনেক সুফল পাইবেন। ঘরে ঘরে পঞ্জিকার ন্যায় এই পুস্তক প্রচলিত হউক।

৬। জাতিভেদ। শ্রীদিগিন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৷৹। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করি-য়াছি। দেখিয়া সুখী হইলাম যে, অল্প দিন মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। দিগিন্দ্র নারায়ণের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির মহা সাধনার ফল এদেশে ফলুক।

বিষ্ণুপদ।

(১৩২৬ চৈত্র মাসের নব্যভারতের ৫৫২ পৃষ্ঠার পর)

দেব দেবীকে সুবিধা বুঝিয়া আপনাদের ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া নিজদের ধর্ম্মের যে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিঃ থিওডোর ব্লক্, মিঃ ফারগুসান প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ এইমতের পোষকতা করেন। বিষ্ণুপদের মন্দিরের নিম্নে "শ্মশান ঘাটের" উপরে গোয়ালিয়ার মহারাজের ধর্ম্মশালা বা ছত্র। বিষ্ণুপদের মন্দির, ষোল বেদীর মণ্ডপ, এবং অহল্যা বাইর মন্দির ১৭৯৫ সালে মহারাষ্ট্রকুলগৌরব প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাই নির্ম্মাণ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বিষ্ণুমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ চত্বরে কয়েকটী প্রাচীন শীলালিপি আছে। আমার বাটীর সম্মুখস্থ শীতলা দেবীর মন্দিরের কথা, যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাহার মধ্যেও শীলালিপি দেওয়ালে গ্রথিত আছে; এইসকল গুলি যথা স্থানে পরে বিবৃত করিতেছি। বিষ্ণু-পদ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে নরসিংহ দেবের মন্দিরগাত্রে অর্থাৎ "ষোলবেদী"তীর্থের সন্নিকটেই দেওয়ালে একটী বৃহৎ প্রস্তরলিপি আছে। ইহা ষোল পংক্তিতে লিখিত। এই শীলালিপিতে "শ্রীনারায়ণ পাল" দেবের নাম দৃষ্ট হয়। ইহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ যুগেও যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। ডাঃ কানিংহ্যাম তাঁহার তৃতীয় ভাগ আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভেরিপোর্ট পুস্তকের ১২০ পৃষ্ঠায় ইহার বিষয় সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। সুবন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার—"বঙ্গের পালরাজগণ পর্য্যায়ে" বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটির মেমোয়ার পুস্তকের পঞ্চম ভাগের ৬০ পৃষ্ঠায় ইহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এইরূপ—নারায়ণ পাল দেবের বিষ্ণুপদ-লিপিঃ—

১। ওঁ নমো পুরুষত্তমায় নমঃ॥ ওঁ জয়তি জগতিনাথঃ প্রস্ফুরচ্চারুমূর্ত্তি রজগদরি বিনিহন্তা শ্রীমদেকো মুরারিঃ, তদনু মুনিজনোহস্য (ম) স্থির সংক্লেশ রাশিঃস্ফুর

২। দ্ অমল গুণায়ম্ ধ্যানাবৃত্তৌ [১] স্থিরাত্মা॥ প্রোচ্চু-তাতিদর্প প্রবল মনসত্রাস হেতুস্বভাবম্ কৃত্বৈতন্নারসিংহংস্ফুট বিকট সটংরূপ মত্যগ্র রৌদ্রং।

৩। নো দীর্ণঃপৃথিব্যাম্ থরনথর করৈর্ভেদিতোদৈত্যরাজঃ শ্রীমন্লোকৈকনাথো ভুবন [২] হিত বিধাতা পাতুযুষ্মান্ বিষ্ণুঃ, শ্রীমানশেষ শুভসম্ভৃত.চারুমূ।

৪। স্তিঃভদ্রঃ সুনির্ম্মলধিয়াম্ প্রবরো শ্রীগ্রহ (?) প্রাপ্তো দয়াদিতকুলে সুকৃতি বভুবযো [৩] বামদেব ইতি সর্ব্বজগৎ প্রতীতঃ, তস্যাত্মজঃ প্রিয়তমো বিদুষামসমা।

৫। সীৎযম্সিংহদেবম্ ইতি বন্ধু জনো যুহাব [1] তস্যা—ভবৎ সুতবরোবরধর্ম্মবৃত্তিঃ [৪] সম্মানিতো গুরুজনৈরপি বপ্পদেবঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধি করণে কনিধানভূতাসৌ,—

৬। সৌন্দর্য্যগর্ভ রুচিরামলরূপসম্পৎ। পত্নীচতস্য কমলেব সদা প্রশস্তা, খ্যাতাভবজ্জ- [৫] গতি বল্লভদেব্যতীষ্টা॥ ভাভ্যাং অজন্য ম্যজায় তস্যুতোঽমল।

৭। ধর্ম্মবৃত্তি—

বাঁকায়চিত্ত কৃতসংযমনোভিমানী—। ব্রহ্মো-পবীত চরিতে ব্রতসঙ্গতে শ্রী—র্ভোভাগুদেব ইতি পূর্ব্বে মিহ প্রতীতঃ॥ বিদ্যালোলাংক্ষণ পরিণতিম্।

৮। সংস্কৃতানাম্ বিদিত্বা, যস্মো শ্রীসাদ মলভুবন প্রাগুমভৃাদ্‌গতেন, যেনাত্যর্থম্ সুকৃত মতিভিঃ সেবিতে ধ্যানমার্গে চেতোস্তন্তং ৬ সুবিমল মলং জ্ঞানমাস্বাদনায়॥

৯। তেনানেক দ্বিজজনভূমি প্রেমবৃত্ত্যা গয়ায়াং শ্রীমাদেযোযতিষু বিহিতঃ সদ্‌গুনাবাস ধামঃ। জ্ঞাতং শ্রেয়ো যদমলগুণং ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমেণ, তেনা।

১০। স্বতজ্জগমলিনং ক্ষীণসংক্লেশরাশিঃ॥ চাতুর্ব্বিষ্যং সমস্তং প্রশমিতকলুষং ব্রহ্মসংন্যস্ত বৃত্তিং শ্রীমন্তং সংক্রিয়াত্মা প্রথিত পৃথুগুণং প্রার্থয়র্ত্তেষমৌনী।

১১। ভূয়াল্লোকোঽমিতশ্রীঃ পরকৃত সুকৃতৈঃ পালনে রক্ষণে চ তৎকর্ত্তব্যং ভবদ্ভিঃ ৭ স্থির বিমল গুণঃ স্থান্নিবায় যথায়ম্।

১২। সদ্বৃত্যামল বৃত্তিভিঃ স্ফুটতরং জ্ঞাতা-৮ দরৈঃ সর্ব্বতঃ। (এইখানে তিন চরণ নাই, তাহা পতন হইয়াছে।) সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্, ভূয়ো ভূয়ো যাচতে এষ মৌনী। সামান্যোঽয়ং ধর্ম্মসেতু নৃপানাং কালে কালে ৯ পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ॥ *।

ব্যঙ্গানার্য্য বহিস্তপোধন জনৈঃ স্থাতব্যমত্রা শ্রমে। ইতোতৎ ব্রতধারিভিনিয়মিতং ভূয়া-দ্যথানান্যথা কর্ত্তব্যান্তদিহামলং প্রিয়তমৈবি-১০ প্রের্গয়াবাসিভিঃ॥ স্ফুরতুকীর্ত্তিরিয়ং গুণ-শালিনী সকলসত্বহিতোদয়হেতবে। তপতি যাবদয়ং ভুবিভাস্করো হিমকরেণ সহামল ১১ দীধিতিঃ॥

শ্রীনারায়ণ পাল দেব ইতি সম্প্রাপ্তোদয়ো ভূপতিভূ‍র্তংভূমিভুজাং শিরোভিরমলং যস্তোচিত শাসনং। রাজ্যস্তস্য গুণামলস্য মহতঃ সং-বৎসরে সপ্তমে বৈশাখ্যাং শুভসং ভৃতেন বিধিনা লব্ধ প্রতিষ্ঠো মঠঃ॥ +

---

* এই সুন্দর লিপি বম্বাই হইতে প্রকাশিত প্রাচীন লেখমালায় পরিদৃষ্ট হয়। এই লেখা বিজয়পুর রাজ্যের "রামচন্দ্র" নামক কোন প্রাচীন রাজার গুণকীর্ত্তন করিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ভাণ্ডদেব তাহা নিজ মঠে পাঠ বিকৃত ও ছন্দ পতন করিয়া তদনুকরণে সংযোজিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্র.চ.স—

+ মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—এই লিপির ভাষা অতিশয় অশুদ্ধ ও ভ্রমপূর্ণ সংস্কৃত হইতেছে। বৌদ্ধযুগের নেপালি পুঁথী ও শিলালেখে এইরূপ প্রমাদপূর্ণ ভুল সংস্কৃত লিখিত বহু হস্তলিপি দৃষ্ট হয়। রাজা নারায়ণ পাল দেবের রাজ্যকালের সপ্তম বর্ষে বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণ সন্যাসীগণের হিতার্থে ভাণ্ডদেব নামক যতিদ্বারা নির্ম্মিত একমঠের বিবরণ এই লিপিতে পরিদৃষ্ট হয়। ইহা এখন বিষ্ণুপদ মন্দিরের অন্তর্গত তৎসম্মুখবর্ত্তী নরসিংহ দেবের মন্দিরের গাত্রে আঁটা আছে, পরিদৃষ্ট হয়। এই নরসিংহদেবের মন্দির মহারাজ নয়পাল দেবের রাজত্বকাল মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে অনুসরণ করিয়া ডাঃ কানিঙ্গহ্যাম ও মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, ভাণ্ডদেব কৃত মঠের সন্নিকট বা সান্নিধ্যে এই নরসিংহ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা কালে অসংস্কৃত হইলে মহারাজ নয়পাল দেব তাহা পুনর্গঠন বা পুনঃসংস্কৃত করেন। এই মন্দিরনির্ম্মাতার পূর্ব্বপুরুষ বামদেব ছিলেন; তাঁহার পুত্র "সিংহদেব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু মূল লিপিখানির "ং" (০) "খানি কালের শাসনে লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া রাখাল বাবু তাঁহার "পালস্ অব বেঙ্গল" নামক পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় "সিংহ-দেবের স্থলে "সিহদেব" লিখিয়াছেন। আমি খুব যত্ন সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই লিপির সকল অংশ পরিদর্শন করিয়াছি। ইহা আমার গয়ার বাটীর সন্নিকট। লিপীটী দেখিয়াই তাঁহার ং (০) টি কালের শাসনে লুপ্ত হইয়াছে, বলিয়াছি। মদ্বন্ধু পরলোকগত পরমেশ্বর দয়ালকে এই অংশটী দেখাইয়াছিলাম। তিনিও এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রশস্তি বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তির আরাধনার সহিত আরম্ভ হইয়াছে। মন্দির-নির্ম্মাতা ভাণ্ডদেবের পিতা বপ্পদেব বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা সিংহদেব সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেই সবিশেষ বলিয়াছি।

আমার মনে হয় যে, এই লিপির ভাষা সাধারণতঃ শুদ্ধ, কেবল যেখানে যেখানে পাঠোদ্ধার করা যাইতে পারে নাই, সেই সেই খানে উদ্ধার-কর্ত্তার ভুল ও প্রমাদ দোষে লিপির পাঠোদ্ধারে ভুল হইয়াছে। এই লিপিতে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ আছে, তাহা পাঠ করিলেই সহজে অবগত হওয়া যায়। যে যে ছন্দ এই লিপিতে সন্নিবদ্ধ আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। মালিনী। ২। স্রগ্ধরা। ৩। বসন্ত তিলক। ৪। বসন্ত তিলক। ৫। মন্দাক্রান্তা। ৬। স্রাগ্ধরা। ৭। শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। ৮। শালিনী। ৯। শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। ১০। দ্রুত বিলম্বিত।

উপরোক্ত নারায়ণ পাল দেবের রাজ্য কালের সপ্তম বৎসরে উৎকীর্ণ বিষ্ণুপদলিপি ভিন্ন আর একটী লিপি কলিকাতা মিউজিয়ামে পাটনার"ব্রড্লি সংগ্রহ"হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা বুদ্ধগয়ায়, কোন মূর্ত্তির পাদদেশে খোদিত ছিল বলিয়া আমার অনুমান হয়। এই লিপি এখন পঞ্চদশ ভাগ বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদ্ পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই লিপির অনুরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। ওঁ সম্বৎ ৯ই বৈশাখ সুদি ৫ পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণ পাল দেব রাজ্যে অব্দ্ বৈষয়িক শাক্য ভিক্ষু স্থবির ধর্ম্মমিত্রস্য।

২। যদত্রপুণ্যম্ তত্ত্বতাচার্য্যোপাধ্যায় মাতা পিতৃ পূর্ব্বঙ্গমম্ কৃত্বা সকল সত্ত্বরাশের নুত্তরজ্ঞানপ্রাপ্তয় ইতি।

ইঁহার রাজত্বের প্রথম লিপি গয়ার গদাধর মন্দিরের নদীর অপর পারে একটী শিবের মন্দিরের দেওয়ালের গাত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ডাঃ কানিংহ্যাম ইহার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। ওঁ সম্বৎ ৮। শ্রীমহেন্দ্র পাল রাজ্যাভিষে।

২। ক সৌদি ঋষি পুত্র সহদেবস্য।

এই লিপি দেখিলে বোধ হয় যে,ইহা নবম বা দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ, এবং তাহা হইলেই মনে হয় যে, প্রতিহার সম্রাট্ প্রথম ভোজ-রাজের পুত্র মহেন্দ্র পাল দেব রাজের রাজত্ব

কালে ইহা উৎকীর্ণ হয় ; কিন্তু ইহার কোন স্থিরতা নাই।

সহরঘাটী গ্রামের সন্নিকট শ্রীগুণচরিত বা গুণেরি মঠের সন্নিকটে একটি মূর্ত্তির পাদদেশে নিম্নলিখিত লিপি খানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই মূর্ত্তি এখন কলিকাতা মিউজিয়ামে নীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই লিপি এইরূপ :

"সম্বৎ ১৯শে বৈশাখ সুদি৫ শ্রীগুণচরিত শ্রীমহেন্দ্র পাল দেব রাজ্যোদ ধর্ম্মোহয়ং, ইত্যাদি রূপে বৌদ্ধ দান গাথাসহ শেষ হইয়াছে। এ লিপির বিষয় কাপ্তেন কীটো বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ১৬ ভাগে ২৭৮ পৃষ্ঠায় সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রডলি সংগ্রহের মধ্যে প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর-বিহার বা বর্ত্তমান বিহার নগরের ভগ্নাবশেষ গুলির মধ্য হইতে সংগৃহীত এক স্ত্রীমূর্ত্তির পাদ দেশে নিম্নলিখিত পাওয়া গিয়াছিল। তাহা এইরূপে :—"* * রাজ্যে শ্রীরাম পাল দেব, সম্বৎ ২ বৈশাখ দিনে ২৮।" ইহার সন্নিকট বিহার পর্ব্বতের উপর প্রাপ্ত ষষ্ঠী দেবীর মূর্ত্তির নিম্নদেশে এইরূপ দুই পংক্তিযুক্ত লিপি পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্ মদন পাল দেব। ২ (বিজয়) রাজ্যে সম্বৎ ৩, বৈশাখ দিনে ২৪॥

গয়ার গদাধরের মন্দিরাভ্যন্তরে একটী চতুর্ম্মুখ স্ত্রীমূর্ত্তির উপরে এই লিপি খোদিত আছে। ইহা ১৫ পংক্তিতে শেষ হইয়াছে এবং "স্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায় রূপে আরম্ভ হইয়া "সম্বৎ ১২৩২ বিকারি সম্বৎসরে শ্রীগোবিন্দ পাল দেব, গতরাজ্যে চতুর্দ্দশ সম্বৎসরে গয়ায়াম্" রূপে শেষ হইয়াছে। বিক্রম সম্বৎ ১২৩২ খ্রীষ্টীয় ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সমান হয়। তাহা হইলে এই লিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দ পাল দেব রাজ্যাধিরোহণ করিয়াছিলেন। এই লিপির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। মদ্বন্ধু বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Palas of Bengal নামক পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—১। ওঁ ওঁ স্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্দ্ধে—২। বারাহ কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিমে যুগে কলৌ পূর্ব্ব সওন্ধ্যায়াং সম্বৎ ১২৩২ বিকারি সম্বৎসরে শ্রীগোবিন্দ পাল দে—৪ বে গতরাজ্যে চতুর্দ্দশ সম্বৎসরে গয়ায়াং॥ বশিষ্ঠ গোত্রোহ ৫। তিপ্তুনো দ্বিবেদঃ শ্রীহল্লনোদ [৬] সুতসুতংমহাস্তং। বিদ্যাধরম্ গুপ্ত গুলিনাং গদাভৃন্মঠ অনাকারিধনা দ্বিজানাম্। ভোক্তাধমন্দম্ প্র ৭। তিষোড়শৈব কার্ষপন বৃদ্ধিতৈব লব্ধ মূলাঙ্ক পঞ্চাসদ্ ইহাস্তি সাক্ষী পদ্মাভি ধানোহ৯ বিশ্বরূপঃ॥ নৃপসিংহ শ্রীধরো দেব ৮। ধরো শ্রীদণ্ড নায়কৌ বিষ্ণু সেবাকরো চইতৈতপোবন নিবাসিনঃ॥ রাঘবঃ ১০। শ্রীকরোহস্থকো দামোদরকঃ হিধরো ভিখোদেব নিধিধর্ম্মী—

চইতে পাল ১১শ কারিণঃ॥ আচন্দ্রার্কমিমং ধর্ম্মং পালয়িষ্যন্তি যে সুখং। প্রত্যবদন্তে ১২ হশ্বমেধস্য ফলং প্রাপস্থন্তি মানবাঃ॥ আশ্বিনে শুক্ল পঞ্চম্যাং ভোজ্যং যো। ১৩ বার য়েদিদং। লভতে স্যা বসন্দিগ্ধং মহাপাতক— পঞ্চকং॥৩ প্রশস্তিরিয়ং ১৪। কৃতা শ্রীযুক্তে— ন্দ্রেণ লিখিতাচেয়ং কাজসীয়ী জয়কুমারাভ্যাং॥ ১৫। ওঁ সোমেশ্বরোহত্রসাক্ষ্যস্তি পদ্মনাভো গয়াদ্বিজ দেবরূপস্থ পুরতো দত্তাচৈতে কপর্দ্দকাঃ॥ * গোবিন্দপাল দেবের রাজ্যকালের মধ্যে উৎকীর্ণ আরও কয়েকটী লিপি

* Epi. Ind. Vol. v App. P 24 No. 166. J. R. AS. (N. S.) Vol. Viii P. 3. ও অনুষ্টুভ্।

দৃষ্ট হয়। সেই গুলির নিদর্শন রাখালবাবুর "পালরাজগণ" নামক পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বেন্দালের (Catalogue of Buddhist Sanscrit Mss in the University Library, Cambridge) পুস্তক পাঠ করিলে অনেক বিষয় এই সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যাইবে। গয়াসহরের "রামনা" একটী প্রাচীন মঠ (ইহা প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের "রমনক" বা "মৃগদাব" সতীঘাটের সন্নিকট ছিল; তাহা সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই সকল স্থানে এখন ভদ্র লোকদের বসত বাড়ী হইয়াছে। আমার বাটী "উমেশলজের" পার্শ্বেই সতীঘাট অবস্থিত ছিল। আমাদের বাটী নির্ম্মাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদের বাটীর স্থানে একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাহার নিম্নে তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের রাজ্য কালের এক লিপি উৎকীর্ণ থাকে। ডাঃ কানিংহ্যাম ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সম্বন্ধে তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে উল্লেখ করেন। আমার পিতা গয়ার ভূতপূর্ব্ব-গভর্ণমেণ্ট উকিল ৺উমেশচন্দ্র সরকার গয়ার কালেক্টার মিঃড্রামণ্ড সাহেবকে তাহা দেন; তিনি তাহা ব্রডলি মিউজিয়ামে পাটনায় পাঠাইয়া দিলে তাহা ১৮৭৫ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্টের হুকুমে কলিকাতার জগৎবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামভুক্ত হইয়াছে। এই লিপি দুই পংক্তিতে নিম্নরূপ ভাবে উৎকীর্ণ আছে :—

১। শ্রীমদ্ বিগ্রহপাল দেব রাজ্যে সম্বৎ ১৩ মার্গ দিনে ১৪

২। দেয় ধর্ম্মোঽয়ং সুবর্ণাকার দেহকস্থ সাহে সুতস্য ॥

"গয়া কাহিনী"নামক পুস্তকে মদ্বন্ধু অতুলবাবু বলেন যে, বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখস্থ "নাট-মন্দির" কলিকাতায় রাজা ৺রাধাকান্ত দেব প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহা প্রকৃত নহে। ইহার কোন প্রমাণ নাই; বরং রাণী অহল্যা বাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া আমরা প্রমাণ পাইয়া থাকি। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রায় ১৩×৬ ফিট বিস্তৃত একখানি প্রস্তর-ফলকের উপর রৌপ্য-নির্ম্মিত যোলটী কোণবিশিষ্ট কুণ্ড মধ্যে কূর্ম্ম পৃষ্ঠ-শিলার উপর বিষ্ণুপাদ-পদ্ম চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই শিলার অতি প্রাচীন উপাখ্যান হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে। অতুল বাবু ইহার বিষয় বেশ সরল ভাষায় তাঁহার পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। এই শিলাটী অভিশাপে প্রস্তরীভূত মরিচি ঋষির স্ত্রী ধর্ম্মরাজ পুত্রী ধর্ম্মব্রতা। বিষ্ণুর বরে ইহার উপর বিষ্ণু ভগবান পাদ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ইহাকে অত্যন্ত পবিত্র স্থান করিয়া দিয়াছেন। মরিচি ধর্ম্মব্রতাকে কোপে অভিশাপ দেন যে শিলা হও। ধর্ম্মব্রতাও মরিচি ঋষিকে শাপ দিলেন যে, আপনিও মহেশ্বর দ্বারা অভিশপ্ত হইবেন। ধর্ম্মব্রতা কঠোর তপস্যা করিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর লইতে বলিলে, ধর্ম্মব্রতা বলিলেন যে, আমি যে শিলা হইব, তাহা যেন সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, পবিত্র এবং শুভ হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব পদচিহ্ন যেন ঐ শিলাতে অঙ্কিত থাকে,যে কেহ এই পবিত্র শিলায় পিণ্ড দান করিবে, সেই যেন পিতৃগণ সহ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।" বিষ্ণু তথাস্ত বলিয়া অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মব্রতা শিলারূপিণী হইলেন। এই শিলার উপর পিণ্ড দান করায়, যমালয়ে আর কেহ যায় না বলিয়া যমপুরী শূন্য হইলে যমরাজ ব্রহ্মার নিকট গিয়া অধিকার খর্ব্বের জন্য অনুযোগ করিলেন। ব্রহ্মা শিলাখণ্ডটীকে যমপুরীতে লইয়া যাইয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু কল্প পরে প্রজাপতি গয়াসুরের

মস্তক ও পবিত্র শিলা দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে বিষ্ণু আদি দেবগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে শিলা বলিল, "ঠাকুর, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমার মুক্তির জন্য আমার এই দেহরূপ শিলায় আপনি অন্যান্য দেবতাগণের সহিত অবস্থান করিবেন। ভগবন্ আপনার সেই বাক্য এখন পালন করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া বিষ্ণ্বাদি দেবতাগণ তথায় রহিলেন। এই শিলায় সর্ব্বতীর্থ বিরাজ করিতেছে। ইহার পাদদেশে প্রভাস গিরি দ্বারা ঢাকা। এই গিরি ভেদ করিয়া যেখানে শিলায় অঙ্গুষ্ঠ দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রের দেবতা প্রভাসেশ্বর নামে কথিত হইয়া থাকেন। শিলাঙ্গুষ্ঠের এক অংশের নাম প্রেতশীলা। "প্রেতশীলা" বেদী রামশীলার মধ্যে অবস্থিত। যাহাকে চলিত ভাষায় "প্রেতশীলা" বলিয়া থাকে, তাহা "প্রেত পর্ব্বত।" প্রেতশিলায় পিণ্ড দান ও তর্পণ করিলে প্রেতত্ব দূর হয়। প্রভাস গিরি হইতে একটী নদী নির্গত হইয়া গঙ্গাসম পূতসলিলা ফল্গুনদীর সহিত মিশিয়াছে। ইহার সঙ্গম স্থলে প্রাচীনকালে ত্রেতাযুগে মহারাজ রামচন্দ্র সীতাদেবীসহ স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে "রামগয়া" তীর্থ বলা হয়। এই তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিলে প্রেতাত্মার মুক্তি হয়। এইখানে ভরত আসিয়া রাম সীতা ও লক্ষণের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে "ভরতাশ্রমণ্ড" বলিয়া থাকে। গয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই শিলার কটিদেশ বিস্তৃত। গয়াসুরকে নিশ্চল রাখিবার জন্য ধর্ম্মরাজ এইস্থানে সদাই বিরাজ করিয়া থাকেন। শিলার দক্ষিণ হস্ত পদে কুণ্ড পর্ব্বত এবং বাম পদে অভ্যুদান্তক পর্ব্বত বিরাজমান আছে!! সীতাদ্রির দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতে দণ্ডীরাজা পুরাকালে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ভস্মকূট ঃ—মঙ্গলা দেবীর পর্ব্বতে ৺জনার্দ্দন আছেন। তাঁহার হস্তে দধিমিশ্রিত পিণ্ডদান করিতে হয়। "গদ সুরের" হাড়ে আদি গদাস্ত্র বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্মার আদেশে নির্ম্মিত হয়। হেতী রাক্ষসকে এই গদার দ্বারা বিষ্ণু মারিয়া দেবতাগণকে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। যে স্থানে বিষ্ণু গদা ধৌত করিয়াছিলেন, সেই স্থানটীকে "গদালোল" বলে। থাপর গয়ার অন্তর্গত এক বেদীপিণ্ড এইখানে দিতে হয়। ইহা বিষ্ণুপাদ মন্দির হইতে প্রায় একমাইল দক্ষিণ দিকে বর্ত্তমান মাড়নপুর গ্রামে অবস্থিত। সীতাদ্রির সম্মুখে "রুক্মিনীকুণ্ড" এবং পশ্চিমে "কপিলানদী।"এই নদীরধারে ৺কপীলেশ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন; ইহার উত্তর দিকের পর্ব্বতটী গৃধ্রকূট নামে পরিচিত, তাহার পার্শ্বে ৺লাঙ্গা বাবার আশ্রম। বিষ্ণু গয়াসুরকে নিশ্চল রাখিবার জন্য আদি গদা হস্তে লইয়া ধর্ম্মশিলাতে দৈত্যের মস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্যতম নাম "আদি গদাধর।" ইহা করশলী মহল্লায় অবস্থিত। ইহার নিকট "আদিগয়া।"

ঋক্‌বেদের ৩ মণ্ডল ৫৩ সূক্ত ৪১ শ্লোকে, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত ১০৭ সর্গের ১১—১৩ শ্লোকে, মহাভারতের বন পর্ব্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্ব্বের ৮৪ অধ্যায়ে, এবং ৯৫ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ১ম অধ্যায়ে, অত্রি সংহিতায়, বিষ্ণু সংহিতার ৮৫ অধ্যায়ে, উশনাসংহিতার ৩ অধ্যায়ে কাত্যায়ন সংহিতার ৩ অধ্যায়ে, শঙ্খ সংহিতার ১৪ অধ্যায়ে, বশিষ্ঠ সংহিতার ১১ অধ্যায়ে এবং লিখিত সংহিতায় গয়াতীর্থের বিশেষ উল্লেখ থাকায়, গয়ার সৃষ্টি যে বৌদ্ধ

যুগের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির এ সম্বন্ধে "বৌদ্ধধর্ম্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের নব গঠন" রূপ থিওরিটি আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। গয়ার প্রধান নদী ফল্গু। গঙ্গার ন্যায় ফল্গুধারা পবিত্র। পূর্ব্বে এই নদীর ভিতর দিয়া জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধস্রোত প্রবাহিত হইত। কালের গতিতে এই নদীতে এখন বালুকণার নিম্নে সহজে এক ফোঁটা জল মিলাও সুকঠিন !! ফল্গুতে স্নান করিলে মহাপুণ্য হয়। ইহার জল খুব শৈত্য গুণ বিশিষ্ট বলিয়া স্থানীয় লোকে বড় ইহার জল ব্যবহার করে না। ইহার জল ব্যবহারে সর্দ্দী, গলগণ্ড, শোথ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ জন্মে !!! ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান হরি ফল্গুরূপে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া আইসেন। বিষ্ণুর চরণোদক হইতে গঙ্গা এবং "আদি গদাধর" স্বয়ং দ্রব হইয়া ফল্গুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাগকূট হইতে গৃধ্রকূট, আর ব্রহ্মযোগী (পাতাল গঙ্গাস্থ পর্ব্বত অর্থাৎ মুড়লী পাহাড়) হইতে উত্তর মানস পর্য্যন্ত স্থানের নাম গয়াশির। ইহাকেই ফল্গু তীর্থ বলে। উত্তর মানসের উপরেই আমার কুটীর "উমেশ লজ।"

অহল্যা দেবীর মন্দিরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে গদাধরের মন্দির। এই মন্দির অতি প্রাচীন। ইহার নিম্নে গদাধর ঘাট। এই মন্দির তক্ষক নৃপতির পুত্রবধূ কোহ্লাদেবী ১৩৫১ বা ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুপদের উপর প্রাচীন মন্দির এই আদর্শে নির্ম্মিত ছিল, অহল্যা বাই প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করিলে সে আদর্শ নষ্ট হইয়াছে; কেবল মাত্র ৬গদাধরের মন্দির সেই প্রাচীন আদর্শ ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য দিবার জন্য অদ্যাবধি দণ্ডায়মান আছে।

হেতী দানবকে হনন করিবার জন্য ভগবান নব অস্ত্র গদা ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি "গদাধর" হইয়াছেন। যেস্থানে তিনি হেতিকে সংহার করিয়া গদাধৌত করিয়াছিলেন তাহা "গদালোল।" এই নব অস্ত্র গদা অপূর্ব্ব ব্যবহৃত, ইহা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দধিচির অস্থিতে নির্ম্মিত !!!

গৃহে পিণ্ড দিয়া গয়া পিণ্ডদান করিবে, এই শাস্ত্রের অনুশাসন।" পিণ্ডং দত্বা গয়াং ব্রজেৎ।" পূর্ব্বাহ্নে উপবাসী বা হবিষ্য ভোজন করিয়া, প্রাতে শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া, ফল্গুতে স্নান করিয়া, ফল্গুতে তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান করিয়া, পরে বিষ্ণু মন্দিরে পিণ্ডদান করিবে। পর পর ক্রমশ যাবতীয় বেদীতে পিণ্ড দিয়া শেষে অক্ষয় বটে পিণ্ড দিয়া তীর্থব্রাহ্মণ গয়ালীর নিকট সুফল লইতে হইবে। তাহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া যাত্রী স্বদেশ যাত্রা করিবে। গয়া ক্রিয়া সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় গয়া-মাহাত্ম্যে লিখা আছে। ইহা বায়ুপুরাণের অংশ বিশেষ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্পূর্ণ গয়া শ্রাদ্ধ করিতে প্রায় দেড় মাস কাল সময় অতিবাহিত হয়, এই কাজে ১০৫ বেদীতে পৃথক পৃথক পিণ্ডদান করিতে হয়; কিন্তু ব্যয় সংক্ষেপ হেতু অনেক লোক ৯, ৪৫, বা ৫৬ বেদীতে অবস্থা ও সাধ্যমত ব্যয় করিয়া পিণ্ড দান করিয়া থাকে। এই সকল বিষয় আমি বুদ্ধ গয়া এবং মধু গয়া শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধে ১২৯৮ সালের "ভারতী" পত্রিকায় বিবৃত করিয়াছি, তাহা ছাড়া সাহিত্য-সংবাদ-পত্রিকার প্রথম ও ও দ্বিতীয় ভাগে "বিহারে বৌদ্ধ প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে গয়া জেলা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা

করিয়াছি। তাহা অনুসিন্ধুৎসু পাঠকের বিশেষরূপে পাঠ করা প্রয়োজন। গয়া পিণ্ড দানে হিন্দুশাস্ত্র মতে অক্ষয় পুণ্য ও কীর্ত্তি সঞ্চিত হয় এবং পিতৃলোক চিরস্বর্গবাস করেন বলিয়া বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ পিতৃপক্ষে এবং চৈত্রমাসে গয়ায় সমগ্র হিন্দুজগৎ হইতে পিণ্ডদানোপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী সমবেত হইয়া থাকেন। এই সময় রেল কোম্পানিকে বহু অতিরিক্ত স্পেশাল রেল গাড়ী যোগাইতে হয়, সহরে লোক বাড়ে, খাদ্যাদি দুর্ম্মূল্য হয় এবং সহর অপরিষ্কার হইয়া সংক্রামক রোগের আকর হইয়া থাকে। অক্ষয়বট মাড়নপুর নামক গ্রামে; গয়া সহরের দক্ষিণ সীমায় ৺মঙ্গলা গৌরী পীটের নিম্নে; এবং ৺পিতামহেশ্বর আমার নাদ্রাগঞ্জ পল্লীর বাটীর সম্মুখে রামনা পল্লীর মধ্যস্থ ৺শীতলা :দেবীর মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত। ৺প্রপিতামহেশ্বর ৺অক্ষয় বটের পার্শ্বেই বিরাজমান। বৃদ্ধ পিতামহেশ্বর শিবলিঙ্গ ৺শঙ্কটা দেবীর সন্নিকট লক্ষণপুরা গ্রামে অবস্থিত।

৺প্রপিতামহেশ্বর শিব মন্দিরের পশ্চিম দিকে "রুক্মিণী কুণ্ড" এবং তাহার দক্ষিণ দিকে "অক্ষয়বট" তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। কপিলেশ্বর, সোমধারা, কপিলধারা, অগ্নিধারা গন্ধর্ব্ব পর্ব্বত প্রভৃতি তীর্থ রুক্মিণী কুণ্ডের পশ্চিম দিগস্থ পর্ব্বত মধ্যে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে ৩৬০ বেদীতে পিণ্ডদান করিতে হইত, এখন ৪৫টী মাত্র বেদীতে পিণ্ড দত্ত হইয়া থাকে, এই পিণ্ডদান বিধির নাম "থাপর" গয়া অপর পিণ্ড দিবার স্থানগুলি লুপ্ত হইয়াছে। ইহা সমাধা করিতে ১৫ দিন সময় লাগে। চরণ পূজার স্থান বিষ্ণু মন্দির। তাহার পার্শ্বেই দক্ষিণ দিকে "শ্মশান ঘাট।" তাহার পার্শ্বেই "গয়া কূপ।" ইহার পাণ্ডা সুরতওয়ালাগণ। ইহারা গয়ালীগণের ঔরসজাত অন্য জাতীয় ভোগ্যা স্ত্রীর বা উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান-বংশ। রামচন্দ্র সুরতওয়ালা, রামাপাহাড়ী সুরতওয়ালা প্রভৃতি সুরতওয়ালা সমাজে বিশেষ ধনী এবং প্রখ্যাত। শ্মশান ঘাটের উপরই "গয়াশীর" বেদী অবস্থিত; শ্মশান ঘাটের পার্শ্বে "মধুশ্রবা" তীর্থ। তাহার পার্শ্বে "মুণ্ড পৃষ্ঠা" তাহার অল্প দূরে "আদি গয়া।" ইহাই প্রাচীন গদাধরের পীঠ; বিষ্ণুর মন্দিরের উত্তর দিকে যে ৺গদাধরের মূর্ত্তি ও মন্দির প্রদর্শিত হয়, তাহা স্থাপিত। তাহার পার্শ্বে "ধৌতপদ।" এই ধৌতপদ লইয়া মকর্দ্দামা পাটনা হাইকোর্টে কিশুন লাল মেহরওয়ারের সহিত ৺শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তের পুত্র শ্যামলাল গুপ্তের সহিত দায়ের আছে। ইহার কিঞ্চিদ্দূরে ৺মঙ্গলা পীঠ। গয়ায় ৺মঙ্গলা দেবীর পিঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। দেবী ভাগবতে "গয়ায়াং মঙ্গলাচৈব" রূপ বচন আমরা দেখিতে পাই। গয়ায় ৺মঙ্গলাগৌরীতে ভগবতীর "স্তন যুগ" পীঠ বর্ত্তমান। পর্ব্বতের উপরে ৺মঙ্গলা পীঠ শোভিত। তাহার নিম্নে "গো প্রচার" এবং "ভীম গয়া"। গোপ্রচারে ব্রহ্মা গো দান করিয়াছিলেন এবং ভীম গয়ায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন পিতৃকার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার হাঁটুর বিশাল গহ্বর প্রস্তরে খোদিত হইয়া অতীতের ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহাকে "ভীম ঘুটা" বেদীনামেও অভিহিত করা হয়। ইহার সন্নিকট "গদালোল"। লক্ষণপুরা গ্রামে ৺শঙ্কট দেবীর স্থান। এইখানেও এক বেদী পিণ্ডদান হয়। তাহার পার্শ্বেই ফল্গুতে "দুগ্ধ তর্পণ" পিণ্ড হয়। তাহার পর "বৈতরণীতে" গোদান এবং সন্ধ্যায় দীপ দান কার্য্য হয়। অক্ষয় বটে শেষ পিণ্ড দিয়া গয়ালীর কাছ

হতে সুফল গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর গায়ত্রী-ঘাটে পিণ্ডদান করিয়া আচার্য্যের আশী-র্ব্বাদ লইয়া থাপর অন্তর্গত গয়া কার্য্য শেষ হয়। গয়ালীগণ যাত্রীদের এবং যমের দান গ্রহণ করায় পতিত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মাদত্ত তাঁহাদের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে। গয়ালীগণ ব্রহ্মার অভিশাপে মর্ম্মাহত হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে যাত্রীদত্ত দক্ষিণায় জীবন-ধারণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহা প্রায় দুই কোটি অর্ব্বুদ বৎসর পূর্ব্বের কথা। গণনা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে, ঐ সময়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মা এইখানে পিণ্ডদান করিতে আসিয়াছিলেন। বিষ্ণুপদই গয়ার প্রধান পবিত্র বস্তু। এই পুণ্য-পদাঙ্ক পূজা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু গয়া-তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। এই সম্মুখস্থ নাটমন্দির ও ধর্ম্মশালা গয়া তীর্থের কেন্দ্র স্বরূপ। প্রাতঃস্মরণীয়া ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই বিষ্ণুপদ-মন্দিরটী অষ্টাদশ শতাব্দী-তে (খ্রীঃ ১৭৯৫) বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুদৃঢ় গ্রেণাইট (কষ্টি) প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত। মূল মন্দির দ্বিতল এবং ইহার পরিমাণ ৫৮ বর্গ ফিট্। অষ্ট সারি স্তম্ভের উপর স্থাপিত, প্রত্যেকটী স্তম্ভ চারিটী স্তম্ভের সমষ্টি। মন্দি-রের উপরিভাগ গুম্বজাকার, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। মন্দিরের যে অংশে বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তাহার উপর সু-উচ্চ পিরামিডের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট অষ্ট-কোণ-যুক্ত টাওয়ার পরিদৃষ্ট হয়। ইহা এক শত ফিটের উপর উচ্চ হইবে। ইহার চূড়ায় স্বর্ণনির্ম্মিত "কলস" এবং গয়ালী বাল-গোবিন্দ সেন-প্রদত্ত স্বর্ণ-ধ্বজা বিরাজ করি-তেছে। মন্দির-দ্বার রৌপ্য-নির্ম্মিত। এই প্রধান দ্বার দেশে দুইটী ঘণ্টা নাটমন্দিরের ছাত হইতে ঝুলিতেছে। প্রথম ঘণ্টা নেপালের রাজমন্ত্রী শ্রীমৎরণজাৎ পাঁড়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; দ্বিতীয় ঘণ্টাটী যাত্রী-কর-আদায়ের কালেক্টার গিলেণ্ডার সাহেব (Mr. Francis Gillander) ১৫ই জানুয়ারী ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দান করিয়াছিলেন। রামশীলা পর্ব্বতের নিম্ন দেশের গোর স্থানে তাঁহার সমাধি আজও বিদ্যমান আছে। বাবু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "গয়া-কাহিনী" পুস্তকে অনেক অশাস্ত্রীয় অনৈতিহাসিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। সেইগুলি অসত্য !! ৺বিষ্ণু-পদ-মন্দিরের অব্যবহিত পরে সংলগ্ন অপর প্রাঙ্গণে "গদাধরের মন্দির" অবস্থিত। এই মন্দিরের সিংহ দ্বারে ইন্দ্রের এক অতি সুন্দর মূর্ত্তি আছে; দেবরাজ দুইটী হস্তীর উপর এক খানি সিংহাসনে বসিয়া আছেন। এই মন্দি-রের উত্তর পশ্চিমাংশে ৺গয়েশ্বরী দেবী বা মহিষাসুর-ঘাতিনী অষ্টভুজার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দির ১৫১৬ সম্বতে ক্ষেত্রী বংশীয় দেবীদাস চৌধুরীর পুত্রের দ্বারায় নির্ম্মিত হয় এবং ১৮৪৩ বা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাবাসী শ্রীনারায়ণ ঘোষাল ইহার সংস্কার করিয়া দেন। বর্ত্তমান গভীর গবেষণা আমাদের সমক্ষে দৃঢ়রূপে প্রমাণিত করিয়াছে যে, পাল বংশীয় নরপতিগণ, যাঁহারা ভারতের রাজদণ্ড কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন সাহিত্য ছিলেন। তাহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "রাম-চরিত্র" পাঠে আমরা সবিশেষ অবগত হই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পালবংশীয় নরপতিগণের সময়ে বিষ্ণু পদ-মন্দিরের বিভিন্নাংশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিষ্ণু-পদ-মন্দির

প্রবেশের পথে ক্ষুদ্র একটী মন্দিরে একটী হস্তী বৃক্ষ হইতে ফল ও পুষ্প ছিঁড়িতেছে, এই ধরণের প্রস্তরমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, দৃষ্ট হয়। পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন, যে, এই মূর্ত্তিটী প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাই গদাধরের মন্দির। ইহার অল্প উত্তরে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে সূর্য্য দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই চিত্রে সারথি অরুণ সাতটী ঘোড়ার রশ্মি ধরিয়া আছেন। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত চত্বরে একটী কুণ্ড আছে। ইহার নাম "সূর্য্যকুণ্ড"। বহু যাত্রী এইখানে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন।

একটী সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া বিষ্ণুপদ মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। এই গলি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই খানে ৺গয়েশ্বরী দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ এই যে, গয়া নগরী স্থাপনের সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা ৺গয়েশ্বরী দেবীর এই মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। ইহাঁর অপর নাম ৺জগদম্বা; ইনি সিংহবাহিনী অষ্টভুজা দুর্গা। মন্দিরের শিরোভাগে একখানি শিলালিপি বৌদ্ধ যুগের অতীত কাহিনী জ্ঞাপন করিতেছে !!

৺মঙ্গলা পীঠের নিম্নে "গোপ্রচার," তাহার নিম্নে দক্ষিণে "অক্ষয় বট"। এই খানে গয়া কার্য্য শেষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তেঁওতার জমীদার রায় পার্ব্বতী শঙ্কর রায় মহাশয় এইখানে বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার স্বর্গত পূজনীয়া মাতার আদেশ অনুসারে বঙ্গীয় যাত্রীগণের জন্য একটী বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য আমার খুল্লতাত গয়ার উকীল পূজনীয় ৺ঈশানচন্দ্র সরকার মহাশয় ও আমাকে বিশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া এই সর্ব্বজন-হিতকর কার্য্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল। তেঁওতাবংশের মাননীয় বাবু হরশঙ্কর রায় এবং মাননীয় পার্ব্বতীশঙ্কর বাবুর পুত্র মদ্বন্ধু সদাশয়প্রকৃতি বাবু কুমারশঙ্কর রায় কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বৌদ্ধদর্শন।

আত্মা ও ঈশ্বর, সাধারণতঃ এই দুইটী লইয়া ধর্ম্ম। বর্ত্তমান বৌদ্ধদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী এই দুইটীই বিশ্বাস করেন—অপর শ্রেণী এ দুয়ের কোনটী বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অল্প। এ দুটীর কোনটীতে বিশ্বাস নাই, এমন লোক কেমন করিয়া কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে, বলা কষ্ট। শিষ্যেরা যাহাই বিশ্বাস করুন, বুদ্ধদেব স্বয়ং কি বিশ্বাস করিতেন? বুদ্ধদেব আত্মা ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক ধর্ম্ম। অথচ পণ্ডিত ও মূর্খ সহস্র লোকে বৌদ্ধধর্ম্ম আদরে গ্রহণ করিয়াছে এবং দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস ও রক্ষা করিয়াছে।

মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে একটী আখ্যায়িকা আছে। কুশীনগরে শালমূলে বুদ্ধদেব মৃত্যু-

শয্যায় শয়ান। এই সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌতম, আত্মা কি আছে?" বুদ্ধদেব বলিলেন "আমি কি বলিয়াছি, আত্মা আছে?" আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আত্মা কি নাই?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি কি বলিয়াছি আত্মা নাই?" এইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে আনন্দ প্রশ্ন করিলেন, বুদ্ধদেব সে সম্বন্ধেও এই রূপই উত্তর দিলেন। আনন্দ বুঝিতে পারিলেন না, আত্মা ও ঈশ্বর আছে কিনা। তথন বুদ্ধদেব আনন্দকে নিকটস্থ শালবৃক্ষ হইতে কয়েকটী পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। আনন্দ তাহা করিলে, বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ, তোমার হাতে বেশী পাতা, না গাছে?" আনন্দ বলিলেন "গাছে।" তথন বুদ্ধদেব বলিলেন "আনন্দ, আমি তোমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছি, তাহার তুলনায় যাহা শিখাই নাই তাহার পরিমাণ অনেক অধিক।"

বুদ্ধদেব আর একটী কথা তাঁহার শিষ্যগণকে অনেকবার বলিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে 'ভিতরের কথা' ও 'বাহিরের কথা' নাই। তিনি সাধারণ শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিতেন, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের ন্যায় উন্নত শিষ্যকেও তাহাই বলিতেন। উচ্চ নীচ অধিকার ভেদে উপদেশ ভিন্ন করিতেন না। এবং যাহা বলিতেন, তাহার প্রকাশ্য অর্থ ভিন্ন কোন গুপ্ত অর্থ থাকিত না, "I have preached the truth without making any distinction between exoteric and esoteric doctrine, for in respect of truch, Ananda, the Tathagata has no such thing as the closed fist of a teacher who keeps something back."

বৌদ্ধদর্শন বুঝিতে হইলে সেই সময়ে বা তৎ পূর্ব্বে ভারতে ধর্ম্ম ও দর্শনের অবস্থা কি ছিল একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বৌদ্ধ দর্শন, সাংখ্যদর্শন কি বেদান্তদর্শনে প্রভাবিত, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে আচার্য্য মোক্ষমূলর বেদ ও উপনিষদের রচনা কাল যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এই ত্রিশ বৎসর মানব প্রকৃতির ক্রমবিকাশের পর্য্যালোচনায় প্রমাণ হইয়াছে, আর্য্যসভ্যতার আরম্ভ মোক্ষমূলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে। বৈদিক যুগ ও উপনিষদ যুগের মধ্যে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগের আর্য্য প্রকৃতি প্রফুল্লতালয়, উপনিষদে বিষাদের কালিমার নিদর্শন পাওয়া যায়। তথন আর্য্য প্রকৃতির পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণ হইয়াছে। নচিকেতা-সংবাদ এই প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের ইতিহাস। এথন ধন ধান্য, গো অশ্ব শতায়ুষ ও বীরসন্তান আর্য্যপুত্রের প্রার্থনীয় নহে; তাহাতে কি হইবে—'যেনাহং নামৃতঃস্যাম্"। বৈদিক জীবন আনন্দময়; সাংখ্য ও পাতঞ্জল জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নহেন। তাঁহার সময়ে এক একজন গুরুর অধীনে অনেক সন্ন্যাসীদল ভারতবর্ষে বিচরণ করিত। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিখ্যাত ছিলেন। আপন মতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া ক্রমে এই সকল দলকে তথাগত আপন দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় ভারতবর্ষে বাষট্টিটী দলস্থিত মত প্রচলিত ছিল। ইহাদের সকলেরই মধ্যে অল্পাধিক অনৈক্য ছিল। এই সকল মতকে সাধারণ ভাবে সাংখ্য, বেদান্ত, পঞ্চরাত্র, লোকায়ত ও জৈন, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধদর্শনের প্রভেদ সামান্য এবং পঞ্চরাত্রগণ স্বাধীনভাবে বৈদান্তিকদিগের

ন্যায় অদ্বৈতবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সাংখ্য ও বেদান্ত বৌদ্ধদর্শনের পূর্ব্বতন মানিয়া হইয়া ইহারা কে কি প্রকারে বৌদ্ধ-দর্শন প্রভাবিত করিয়াছিল, অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

'কেন,' 'কঠ' প্রভৃতি কয়েক খানি উপনিষদ বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বতন। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পর, খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে, কয়েক শত বৎসর ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে বেদান্ত হীনপ্রভ হইয়াছিল। প্রেতবিশ্বাস হইতে কিরূপে প্রকৃতি পূজায় এবং প্রকৃতি পূজা হইতে কিরূপে দেব পূজায়, এবং ক্রমে আর্য্য সন্তান কিরূপ অদ্বৈতবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এখানে তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের ক্রমবিকাশে আর্য্যসন্তান বৈদিক প্রকৃতি-পূজা এবং তাহার শত শত বৎসর পরে উপনিষদের অদ্বৈতবাদ আবিষ্কার করে। প্রাচীন উপনিষদে দ্বৈতবাদ নাই বা ঋগ্বেদে অদ্বৈতবাদ নাই, এমন নহে। তথাপি উপনিষদের দর্শনকে অদ্বৈতবাদ বা বেদান্তদর্শন বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে সাংখ্যদর্শনের শ্রীবৃদ্ধি বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বতন হইলেও সাংখ্যদর্শনের আরম্ভ বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বতন। অথর্ব্ব বেদের একটী সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভিগুণেনভিরাবৃতং—ইহা সাংখ্য মত, না হইলেও কঠোপনিষদে সাংখ্যদর্শনের আভাষ পাওয়া যায়। আচার্য্য বেবর সাংখ্যদর্শনকে বেদান্তের পূর্ব্বতন বলিয়াছিলেন। একথা ঠিক নহে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদ নিরাকরণ মানসে কপিল সাংখ্যদর্শন প্রচার করেন। অদ্বৈতবাদে এক ব্রহ্ম পরমাত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই—সাংখ্য দর্শন পরমাত্মা অস্বীকার করিয়া প্রকৃতি ও আত্মার—অসংখ্য আত্মার সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদর্শনে আত্মা ও পরমাত্মা কিছুই স্বীকার করা হয় নাই। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি ও আত্মাকে অনাদি, সুতরাং অনন্ত বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধদর্শনে প্রকৃতিকে অস্থির প্রপঞ্চময় মায়া বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বেদান্ত প্রকৃতির সত্তা স্বীকার করেন না। সুতরাং প্রকৃতির অবিশ্বাসে বেদান্ত ও বৌদ্ধ একমত, পরমাত্মার অবিশ্বাসে সাংখ্য ও বৌদ্ধ একমত এবং আত্মার অবিশ্বাসে বৌদ্ধ স্বতন্ত্র ও একাকী।

সাংখ্যদর্শন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বেদান্তের ন্যায় আর্য্য সাধারণের আদরণীয় ছিল না। অনার্য্য প্রদেশে এবং বিশিষ্ট আর্য্য-সম্প্রদায়ে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তু। এই নামটী হইতে অনুমান করা যায়, শুদ্ধোদনের রাজ্যে সাংখ্য-প্রণেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শাক্যসিংহ জন্মভূমিতে সাংখ্যতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পুনর্জ্জন্ম, অদৃষ্টবাদ এবং কর্ম্মফলে বিশ্বাস উপনিষদ, বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে সমানভাবে দেখা যায়। সুতরাং এটী আর্য্যসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন, আর্য্যদিগের নিকট আর্য্যসন্তান এই মতটী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য নহে। অনার্য্য বিশ্বাস এই যে, কেহ মরিলে, তাহার আত্মা বৃক্ষ লতায় বা পশুজীব দেহে আশ্রয় লয়। কিন্তু বৃক্ষ হইতে অন্য জীবে আত্মার পর্য্যায় ক্রমে উন্নতি বা অবনতিতে অনার্য্যের বিশ্বাস নাই। জন্মান্তরবাদ আর্য্যদিগের নিজস্ব ধন—ভারতবর্ষে অভ্যুদিত হইয়া এমত ক্রমে গ্রীস ও মিসরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের আত্মায় বিশ্বাস নাই, কিন্তু

পুনর্জন্মে বিশ্বাস আছে। পুনর্জন্ম কাহার? বেদান্তের মতে আত্মার দুইরূপ—স্বরূপ এবং প্রবাহরূপ। বৌদ্ধেরা জীবের প্রবাহরূপ বিশ্বাস করে। এক একটী ফুল ভিন্ন হইলেও যেমন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটী মালা হয়, তেমনি, জন্মে জন্মে জীবের নামরূপ বিভিন্ন হইলেও এক কর্ম্মসূত্রে সহস্র জন্মেও সে সেই একই জীব। মানুষ মরিলে তাহার কর্ম্মফল রহিয়া যায়।—সেই কর্ম্মফলে, অবিদ্যা হইতে বাসনা, বাসনা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা মৃত্যু।

সাংখ্যদর্শনে জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। যাহা সুখ বলিয়া কল্পনা করা হয়, বিজ্ঞের নিকট তাহারও দুঃখময়ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির নাম মুক্তি। মুক্ত আত্মার সুখ দুঃখ অনুভূতি থাকে না। বৌদ্ধেরাও জীবনকে দুঃখময় বলেন। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির নাম নির্ব্বাণ। অনুভূতিশূন্য আত্মার অস্তিত্ব নির্ব্বাণ হইতে বেশী দূর নহে। যে সময় বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব মহৎ হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারিতেন না। এমন দুর্ব্বল ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে তথাগত স্বীকার করেন নাই এবং যে আত্মার সুখ সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা সুখ দুঃখানুভূতি-শূন্যতা—যে আত্মা লইয়াই বা তিনি তৃপ্ত হইবেন কেন?

যজ্ঞ ফলের অকিঞ্চিৎকারিতায় সাংখ্য ও বৌদ্ধের একই মত। তথাপি সাংখ্যকার যজ্ঞের প্রতি যেন একটু স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। যে যজ্ঞে বলিদান হয়, তাহাই ক্ষতিকারক; সে যজ্ঞে বলিদান হয় না—জীবহত্যা হয় [illegible] হইয়া [illegible]ত কোন ক্ষতি নাই, তবে উপকারও [illegible]র নাই। জ্ঞানই মুক্তির সোপান। তথাগত যাগযজ্ঞের অপকারিতা বিশেষভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। সকল বিষয়েই দেখা যায়, সাংখ্য বৃদ্ধের ন্যায় উচ্ছেদ সাধনে কোমল-হৃদয়—বৌদ্ধ যুবার ন্যায় উচ্ছেদে অগ্রহস্ত। সাংখ্যকার একটু চক্ষুলজ্জা করিয়াছেন। তথাগতের চক্ষুলজ্জা লেশ মাত্র ছিল না।

মুক্তি বা নির্ব্বাণ যজ্ঞ সঞ্চয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের আবশ্যকতা নাই, একথা সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয় দর্শনের অনুমত। "স্থির সুখমাসনং" ইহাতে উভয়ের মতভেদ নাই। অবিদ্যা হইতে বাসনা—বাসনা হইতে জন্ম জরামৃত্যু, এই উৎপত্তিবাদ বোধ হয় সাংখ্যকারের নিকট হইতে বৌদ্ধদর্শন গ্রহণ করিয়াছে।

বৌদ্ধদর্শনে কাহারই নিত্যতা স্বীকার করা হয় না। জগতে সকলই হইতেছে, কিছুই হয় না। সকলই ভাব মাত্র, সৎ কিছুই নাই। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো ন ভাবো বিদ্যতে সতঃ" একথা বৌদ্ধ বলিবেন না। পরমাণু হইতে পরমদেবতা পর্য্যন্ত সকলই পরিবর্ত্তনশীল। জন্মের সঙ্গে মরণ, সত্তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন। হ্রাস ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। নিমেষ পরে কাহাকেও পূর্ব্বাবস্থায় দেখা যায় না। সুতরাং সকলই হইতেছে, কিন্তু কিছুই হয় না। কেহ এক মুহূর্ত্ত থাকে, দেবতারা লক্ষ বৎসর বাঁচিতে পারেন, কিন্তু জরা, মরণ, ক্ষয় হইতে নিষ্কৃতি কাহারও নাই।

নিম্নশ্রেণীর পদার্থে আকার ও জড়ধর্ম্ম আছে। উচ্চশ্রেণীতে আকার, জড়ধর্ম্ম ও মানস ধর্ম্ম আছে। এই গুণের সমুচ্চয়ে পদার্থের উৎপত্তি। দুই, তিন বা ততোঽধিক গুণের সমাবেশ না হইলে কিছুরই উৎপত্তি হয় না। সুতরাং জড়মাত্র মিশ্রিত পদার্থ। এই জন্য,

বৌদ্ধদর্শনে পদার্থ মাত্রকে 'সংখার' বলা হইয়াছে। বোধ হয়, সাংখ্য দর্শনের সংস্কার শব্দ হইতে 'সংখার' শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। সমবেত গুণের প্রত্যেকটার নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং কোন সংখার দুই মুহূর্ত্তে একরূপ থাকে না। সংখারের উৎপত্তির সহিত অসমতার পরিবর্ত্তন ও মৃত্যুর উৎপত্তি হয়। সুতরাং বিভিন্নতার সহিত বিভিন্নতার জন্ম—নিত্যত্ব নাই—এখনই বা চিরদিনে সকলকেই লয় পাইতে হয়। বৌদ্ধদর্শনের এ কথায় কাহারও ভিন্নমত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সংখারের অতীত অপরিবর্ত্তনশীল নির্ব্বিকার এক আত্মা সংখারের অন্তরালে বিদ্যমান আছে। অথবা এক অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বিকার জরামরণের অতীত পরমাত্মা এ জগতের অন্তরালে বিদ্যমান আছেন, একথা সাংখ্যকার বা বেদন্তকার স্বীকার করেন। বৌদ্ধ এরূপ কথা স্বীকার করেন না; বৌদ্ধমতে জরামরণের অতীত নিত্যত্ব কিছুরই নাই।

সংখারের উৎপত্তির সহিত দুঃখের সূচনা। ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে বহির্জগৎ সংসারকে প্রভাবিত করে। তাহাতে সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইলে কোন পদার্থের প্রতি অভিলাষ, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। যাহার প্রতি অভিলাষ, তাহা পাইবার বাসনা হয়। যাহার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, তাহা দূর করিবার অভিলাষ হয়। বাসনা হইলে বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা জন্মে। একটী বাসনা পূর্ণ করিবার শক্তি থাকিলে শতটী পূর্ণ করিবার শক্তি থাকে না। বাসনার অপূরণে শোক জন্মে। সুতরাং জীবন মাত্রেই দুঃখ-সম্বলিত; বাসনা পূরণের অনিয়মিত চেষ্টায় পীড়া জন্মে। পীড়া হইতে ক্ষয় ও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং সংসার মাত্রই জরামরণশীল।

জীব আপন বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পায়। আপন মহত্ত্বের অভিমান তাহার এত হয়, সে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পদার্থ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝে, মনে করে,জগতে আর কাহারও সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। ইহলোক ও পরলোক তাহারই জন্য। ইহলোকে ও পরলোকে চিরদিন আপন স্বতন্ত্রতা রক্ষা করার জন্য তাহার উদ্যম ও উৎসাহ। সমুদ্রের ফেন-বুদ্‌বুদের ধারণা যে, সে সমুদ্র হইতে ভিন্ন—জীবের ধারণা যে, সে সব হইতে স্বতন্ত্র। এই মায়া, এই মোহ, এই অবিদ্যা তাহার প্রয়াসের নিদান, এই প্রয়াসের ফলে তাহার কর্ম্ম। পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইলে দেখা যায়, কেহ রথে অশ্বযোজনা করিয়া চলিয়াছে, রথী ভাবিতেছে সে বড় দ্রুত যাইতেছে, অশ্ব ভাবিতেছে, সে পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া সদর্পে পদক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবী, রথ বা সারথী কাহারও সহিত সম্বন্ধ তাহার নাই। কিন্তু পর্ব্বতবাসী দেখিতেছে, তাহারা শুক্তির ন্যায় বিলম্বিতগতি, অশ্বের কেশর যেমন অশ্বের অংশ, তাহারা তেমনি পৃথিবীর অংশ। শিশুর শ্রীবৃদ্ধির সহিত দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় জগত শিশুর সামনে প্রতিবিম্বিত হয়, অজ্ঞাতসারে শিশুর হৃদয়ে অভিমান জন্মে সে এই সংসারচক্রের কেন্দ্র, তাহারই জন্য সংসার, সে সংসারে প্রভু, সে সংসার হইতে স্বতন্ত্র। এই অভিমান হইতে জীব সহজে নিষ্কৃতি পায় না। এই অভিমান হইতে বাসনা, বাসনা হইতে নূতন বাসনা। কেহ মোক্ষের লোভে কর্ম্ম করে। মূলে সকলের অভিমান,অভিমান, বাসনার মূল, বাসনা কর্ম্মের মূল, কর্ম্ম সুখ, দুঃখ, জন্ম, ও জরা মরণের মূল। এই অহঙ্কার, আত্মাভিমান, স্থূল। [illegible]ন্নতা ও সত্তার বিশ্বাস যাব[illegible]স্থায় বিশ[illegible] মূল।

এজন্য বৌদ্ধদর্শনে নিরাত্মবাদের এত প্রশংসা।

মনুষ্য কর্ম্মের ফল। কোটি কোটি জন্মের কর্ম্মফল, পিতৃ পিতামহের কর্ম্মফল, অনন্ত জগতের কর্ম্মফল. সকলের সমবেত ফলে মনুষ্য-জন্ম। কীটাণু হইতে প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, দেব দানবের সকলের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ। কাহাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিবার সাধ্য মানুষের নাই। যে কুকুরকে লাঠি মারিতে উদ্যত হইয়াছে, স্মরণ কর সে তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা হইতে পারে। আর হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ কোথায় থাকিবে, তোমার সহিত সম্বন্ধ অতীত ও ভবিষ্যতের অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের। বিশ্ব-চক্রের ধূলিকণা, বিশাল বারিধির ফেন বুদ্‌বুদ্‌ তুমি। আপন অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে পারিলে,অভিমানের লয় হইবে, বিশ্বপ্রেমে হৃদয় প্লাবিত হইবে। কারণের কার্য্য তুমি, কারণ বিশ্বসংসার-শৃঙ্খলের এক গ্রন্থি তুমি, কাহা হইতে তোমার স্বতন্ত্রতা নাই—শৃঙ্খলের এক এক গ্রন্থি, অতীত কোটি বৎসরের কোটি জীবের কর্ম্মফল—আবার এই এক গ্রন্থি ... ভবিষ্যতের কোটি বৎসর প্রবাহিত ... তোমার কর্ম্মফলে তুমি, তোমার ... প্রসূতি অনন্ত বিশ্বসংসার কোটি কোটি বৎসর প্রভাবিত হইবে। তুমি কার্য্য ও কারণরূপে অতীতে ছিলে, ভবিষ্যতে থাকিবে। এই কারণ ক্রমানুসারে জীব কোটি কোটি বৎসর থাকে। আত্মার সত্তায় বিশ্বাস রাখিবার আবশ্যক হয় না। দুই মাসের বালকের সহিত অশীতিপর বৃদ্ধের আকৃতি কি প্রকৃতি কিছুরই সমতা নাই, দেহের সে পরমাণু রক্ত, মেদ, মাংস ও অস্থির চিহ্ন নাই—তথাপি সেই দুই মাসের শিশুই যে এই অশিতিপর বৃদ্ধ, সে বিষয় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না! তবে জন্মান্তরে, রূপান্তরে, নামন্তরে জীবের ক্রম-পর্য্যায়ের অবসান কেন হইবে? বস্তুতঃ জরামরণের ক্রমবিকাশ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তথাগত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুখ দুঃখের এমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আর কোন দেশে কেহ দিতে পারে নাই।

"অনিত্যং দুঃখং আত্মাং" তথাগত আত্মার সত্তা, কোন পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করিতেন না এবং জীবমাত্র দুঃখময় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তবে নির্ব্বাণ কি—কিসের নির্ব্বাণ?

(৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী)

(প্রকাশক…শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী)

ভগবদ্‌গীতার সূচনা।

আমরা মহাভারতের মনোহর পথে চলিতে চলিতে এখন এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আর শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই যে, তাহাতে প্রবেশ করি। তাহার উচ্চস্তর বিশেষজ্ঞকে—যোগী-জনকে মুগ্ধ করিতেছে। আর নিম্নস্তর জন-

সাধারণকে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা এই স্তরের যাহা দেখিতেছি, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

গীতার উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে উপদেশ *। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম, না করাই অধর্ম্ম, ইহাই গীতায় উক্ত হইয়াছে। এই এক কথায় ধর্ম্মের মূলতত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, আর কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব? যদি বলা যায় যে শাস্ত্রের আদেশ পালনই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম, তাহা হইলেও পথ পরিষ্কার হইল না। কারণ কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বহু পণ্ডিত 'বেদ হইতে ধর্ম্ম' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বেদ-নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ধর্ম্মই বিহিত হয় না †।" মহাভারতের আর এক স্থলে আছে, "শাস্ত্র চতুর্ব্বিধ।" সংস্কৃত মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম নাই, এই এক শাস্ত্র. দ্বিতীয় শাক্যসিংহাদি-প্রবর্ত্তিত চৈত্য-বন্দনাদি রূপ ধর্ম্মশাস্ত্র (ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র)। তৃতীয় বেদোক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। চতুর্থ, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত বস্তু মাত্র আছে, আর কিছুই নাই. এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র ‡। মহাভারতে আরও আছে, "শাস্ত্রও বহু বিভিন্ন, মতও বহু বিভিন্ন। বেদ সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ-অর্থ-প্রকাশক। এমন একজন ঋষি নাই, যাঁহার মতকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথে গমন করাই কর্ত্তব্য" §। কিন্তু ভারতে মহাজনের অভাব নাই। তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধি-বলে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করিয়া, বিভিন্ন পথে গিয়াছেন। এই জন্যই ভারতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম।

আর শুধু শাস্ত্রই কি প্রামাণ্য? কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ, যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। একমাত্র শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কিছুই নির্ণয় করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়! ইহা বৃহস্পতির বচন ¶।

আবার শাস্ত্রই বা কি? মহাভারতে আছে. "যাহাতে মনুষ্য সমাজের উন্নতি হয়, এইজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে। ন্যায়সঙ্গত যে কোন আচার, তাহাই শাস্ত্র এবং যাহা অন্যায় আচার, তাহাই অশাস্ত্র" ‖। ইহা-দ্বারাও ন্যায় বা কর্ত্তব্য কি, তাহা স্থির হইল না।

তাহা হইলে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের উপায় কি? ভারত-গৌরব বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "কোন প্রাচীন পুস্তকে কোন বিষয় লিখিত আছে

---

* আচার্য্য নীলকণ্ঠ মজুমদার M. A. কৃত গীতারহস্য পৃ ২০৩।৮। এবং লোকমান্য তিলকের গীতা রহস্য হিন্দি অনুবাদ।

† সংস্কৃত মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব ৬৯—৫৬। ইহাও বেদনিন্দা।

‡ শান্তিপর্ব্ব ২৮৭—১২। তাহা হইলে পণ্ডিতপ্রবর নীলকণ্ঠের মতে এই শ্লোকেও বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে।

§ শান্তিপর্ব্বে ১৮৭—১০। বনপর্ব্ব ৩১৩—১১৭। ষড়দর্শনের মতও পরস্পর বিভিন্ন। আবার গীতার সহিত সকল বিষয়ে তাহাদের একমত নাই।

¶ মনু-সংহিতার ১২—১১৩ শ্লোকের টীকায় কুল্লুক ভট্টধৃত বৃহস্পতি বচন।

‖ শান্তিপর্ব্ব ১০৯—১০॥ ২৬৮—৫৮।

বলিয়া, অথবা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া, অথবা তোমার বাল্যাবস্থা হইতেই তুমি কোন বিশ্বাসে গঠিত হইয়াছ বলিয়া, কোন বিষয় বিশ্বাস করিও না। বিচার করিয়া দেখ. বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ, যদি উহা সকলের পক্ষে হিতকারী হয়, তবেই উহাতে বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশ মত জীবন যাপন কর এবং অপরকেও ঐ উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করিতে সাহায্য কর''। *

মহাভারতের বহুস্থানে আছে. "যাহা মনুষ্য সমাজের উন্নতি-সাধক, তাহাই ধর্ম্ম, ইহাস্থির নিশ্চয়। যে ধর্ম্ম উন্নতির অন্তরায়, তাহা কুধর্ম্ম। যাহাতে সকলের হিত হয়, তাহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। যাহা সকলের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য, তাহাই ধর্ম্ম। সকলের হিতসাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। যিনি সকলের সুহৃদ্ ও সকলের হিতসাধনে সতত রত, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ। বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা সকলের হিত সাধন করিবে। যাহা অপরের হিতকর নহে এবং যে জন্য লজ্জিত হইতে হইবে, এমন কর্ম্ম কদাচ করিও না †। কৃষ্ণও বলিয়াছেন' "যাহা সকলকে ধারণ করে, অর্থাৎ রক্ষা করে, তাহাই ধর্ম্ম ‡। তিনি গীতায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "সকলের হিত সাধন করিবে। লোকহিতার্থে সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। সকলের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ কর্ত্তব্যকর্ম্ম। আমি কর্ম্ম না করিলে মনুষ্য-সমাজ উৎসন্ন হইবে। তাহা না হয়, এই জন্যই আমি কর্ম্ম করি " §।

মহাভারতে একাধিক স্থানে আছে "যদি বংশের একজনকে ত্যাগ করিলে সমুদয় বংশ রক্ষা হয়, তবে তাহাও করিবে। যদি সমুদয় গ্রাম ত্যাগ করিলে দেশ রক্ষা হয়, তবে তাহাও করিবে।" ইহাই শুক্রাচার্য্যের নীতি।

এই সকল দ্বারা দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন লক্ষ্য নহে, কিন্তু সকলের—সমুদয় দেশের হিত-সাধনই লক্ষ্য। এইজন্য গীতায় মনুষ্য সমাজের হিত সাধন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বলিয়া পুনঃপুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥।

ইহাই হিতবাদের মূল মন্ত্র। হিতবাদ

---

* স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ পৃঃ ১৬৪।

† বনপর্ব্ব ৩৩—২১। ২০৮—৪। ১১২—৩১। শান্তিপর্ব্ব১০৯—১০৯—১০।১১।১২।৩২৯—১২।১৩।২৬৪—৬।২৬১—৯।১২৪—৬৬;৬৭।৬৮।২৬১ অধ্যায়।

‡ কর্ণপর্ব্ব ৬৯—৫৭।৫৮।৫৯।

§ গীতা ৩—২৪॥৩—২০। টীকাকারেরা লোকসংগ্রহের অর্থ স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তন লিখিয়াছেন। কিন্তু লোক-হিতই প্রকৃত অর্থ। ৮—৩। মূলে যে বিসর্গ শব্দ আছে, তাহার অর্থ টীকাকারেরা ত্যাগ অর্থাৎ যজ্ঞ লিখিয়াছেন। ত্যাগ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ত্যাগ, স্বার্থ ত্যাগ প্রকৃত অর্থ, যজ্ঞ নহে। আর কর্ম্মের অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গীতার বহুস্থলে সর্ব্বভূত অর্থে মনুষ্য সমাজ সূচিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এতবড় উচ্চ আদর্শ জীবনে পরিণত করা অসম্ভব বিবেচনায়, আমরা তাহার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে দেশ-হিত লিখিয়াছি।

॥ গীতা ৫—২৫॥১১—৫৫॥১২—৪।১৩॥১৬—২। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণ-কথিত সত্যতত্ত্ব এই রূপ + +। যাহাতে লোকহিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। + + আমরা যদি + + এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্ম্মের মূল স্বরূপ গ্রহণ পারি, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। + + তাহা হইলে ভণ্ডামি ও জাতমারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্ট চেষ্টা থাকে না।'' কৃষ্ণচরিত ৬খণ্ড ৬ পরিচ্ছেদ। পুনশ্চ, ''যিনি (কৃষ্ণ) সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, 'বেদ ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি, "ধর্ম্মতত্ত্ব ১ ভাগ ৪ অধ্যায়।

কি? যাহাতে অধিকাংশ মনুষ্যের অত্যধিক হিত সাধিত হয়, তাহাই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য, কর্ত্তব্য কার্য্য। কৌরবেরা অতি অন্যায় উপায় দ্বারা পাণ্ডবদের পৈত্রিক ও স্বরাজ্য অধিকার করিয়াছিল। যদি পাণ্ডবেরা তাহা উদ্ধার করিতে যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে অন্যায়েরই প্রশ্রয় প্রদান করিতেন, অন্যায় প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইলে কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না, কোন দেশই উন্নত হইতে পারে না, এইজন্য কৃষ্ণ—পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এইরূপ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া মত প্রদান করিয়াছিলেন। আত্মোন্নতি সাধনই মানব জীবনের লক্ষ্য। তাহা আবার দেশোন্নতির উপর নির্ভর করে। দেশোন্নতিও আবার আত্মোন্নতির উপর নির্ভর করে। এই জন্য আত্মোন্নতিও দেশ-প্রেমের দুইটী বিমলধারা, গঙ্গা-যমুনার মত মিলিত হইয়া, গীতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা যদি দেশ-প্রেমের সঙ্গীত না হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শিখাইতেন না, দেশোদ্ধারে নিযুক্ত করিতেন না, সর্ব্বসাধারণের প্রতি সমদর্শী হইতে, সর্ব্বসাধারণকে সমভাবে ভালবাসিতে এবং সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন করিতে উপদেশ দিতেন না।

যে সকল উপদেশ মহাভারতের নানাস্থানে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে, তাহাই গীতায় একত্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। * মনু-সংহিতা ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক শ্লোক গীতায় আছে। আবার উপনিষদের অনেক শ্লোক ও গীতার শ্লোক প্রায়ই এক †। তাহাবাদে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ সমূহের সুন্দর সুন্দর অংশ গীতার পত্রে পত্রে রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম নীতি-প্রধান। রিপু সংযমই বৌদ্ধধর্ম্মের সার। তাহা গীতায় গৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বভূতের হিতসাধন বা কর্ম্মযোগ, সাংখ্য ও বেদান্তের জ্ঞানযোগ, ভাগবতের ভক্তিযোগ ও পাতঞ্জলের বিশেষ যোগ, এই সকলেরই সুন্দর সামঞ্জস্য গীতায় রহিয়াছে ‡। বেদ-নিন্দাও গীতার বহুস্থানে ও মহাভারতের নানাস্থানে আছে §। ফলত বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে যেমন পাশ্চাত্য প্রভাব দৃষ্ট হয়, মহাভারত ও গীতায়ও তেমনি বৌদ্ধ প্রভাব দৃষ্ট হয়। নতুবা কোন্ হিন্দুর সাধ্য যে সেই বেদপ্রবল সময়ে, বেদপ্রবল ভারতে বেদের নিন্দা করে, আর বলে, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে।"

গীতার অনেক শ্লোক পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থবাচক ¶। মহাভারতে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, ইহা সর্ব্বসম্মত। গীতায়ও প্রক্ষিপ্ত আছে ‖। অনাচার, অভক্ষ্য ভক্ষণ, সকলের

---

* বঙ্কিম বাবুও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণ-চরিত ৫ খণ্ড ২ অধ্যায়।

† রামদয়াল মজুমদার M. A. র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পৃঃ ৬৪৪ ৬৪৫।৬৫০।৬৮২।৬৯০।

‡ নীলকণ্ঠ মজুমদার M. A. র গীতা-রহস্যের মুখবন্ধ ও পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকা।

§ বঙ্কিমবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব ১ ভাগ ৪ অধ্যায় এবং ১৪ অধ্যায়।

¶ শঙ্কর ভাষ্যের উপক্রমিকায় শঙ্করাচার্য্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকা এবং Krishna and Gita by Sitanath Tathwabhusan, Lecture X.

‖ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত M. A. B. L. র ঈশ্বরবাদ পৃঃ ২০৫। জাভা ও বলীদ্বীপে যে গীতা আছে, তাহাতে শ্লোক অতি অল্প আছে। Modern Review, July, 1914. আবার মান্দ্রাজের শুদ্ধ সমীতন বর্ম্ম সম্প্রদায় প্রকাশিত গীতায় ২৬ অধ্যায় আছে।

অন্ন ভোজন, অস্পৃশ্যস্পর্শন, ইন্দ্রিয়জনিত পাপ প্রভৃতি সকলই গীতাপাঠে নষ্ট হয় *। গীতা জগতের এই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে যে,গ্রীক, লাটীন, জর্ম্মন, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

গীতার ন্যায় সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন, বিশ্বপ্রেমের ধর্ম্ম আর নাই, চরিত্র গঠনের সহায় নাই, মুক্তির আর পথ নাই। †

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

ভারতীয় লিখন-প্রণালীর প্রাচীনতা।

অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার কার ভারতীয় লিপি বিষয়ে নূতন করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ‡ তিনি এই আলোচনায় চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেন নাই, স্বীয় মৌলিক গবেষণার ফলে মীমাংসার পথও সুগম করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই গবেষণার ফল বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

ভারতীয় প্রাচীন লিপি দুই প্রকার—ব্রাহ্মী ও খেরস্তী। ব্রাহ্মী লিপির গতি বাম হইতে দক্ষিণে, যেমন হিন্দুদিগের লেখা বর্ত্তমানে প্রচলিত। খেরস্তী আরবি বা ফার্সীর ন্যায় বামাবর্ত্ত। খেরস্তী কেবল উত্তর পশ্চিম প্রদেশেই প্রচলিত ছিল এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মী উত্তর পশ্চিম সমেত সকল ভারতেই প্রচলিত ছিল এবং কেবল ভারতের নয়, তিব্বত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশেও যে সকল লিপি প্রচলিত, সকলেরই জনয়িত্রী বলিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে স্বীকৃত। খেরস্তী যে বিদেশাগত, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মী সম্বন্ধে বিরোধ আছে। সংস্কৃত ও সংস্কৃতোৎপন্ন ভাষা সকলের উচ্চারণানুরূপ করিয়াই ব্রাহ্মী বর্ণমালা গঠিত হইয়াছিল, সুতরাং উহাই যে এ দেশের প্রাচীন বর্ণমালা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বর্ণমালা কতদিন হইল দেশে প্রচলিত, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা সম্বন্ধে মোক্ষমূলার বলিয়াছেন যে, পাণিনির সময়েও দেশে নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতবর

---

* গীতামাহাত্ম্য ৩৩।৩৪।৩৫।৩৬ তবে আর সুশিক্ষিত ও দেশের অলঙ্কার বিলাত-প্রত্যাগতদিগকে এক করিয়া বলিয়া লাভ? গীতা পড়াইয়া লইলেই এ সব শুদ্ধ হয়।

† Dr. Larinser লিখিয়াছেন যে, গীতা ও বাইবেল প্রায় একশত ভাবের সৌসাদৃশ্য আছে। কেনেডী সাহেব গীতার সহিত বাইবেলের New Testamentব তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, খুব সম্ভবত বাইবেলের ঐ অংশের লেখকগণ ভগবদ্গীতা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। The Satakas by J. M. Kennedy p 33. ফরাসী পণ্ডিত জেকেলিয়ট সাহেব একমাত্র মনুসংহিতার সহিত বাইবেলের Old Testament র তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাইবল নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল। The Bible in India, Hindu origin. আবার বহু ইংরাজ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাইবলের বহু অংশই.এমন কি, বাইবলের বহু গল্পই বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

See The Gospel of Budha, published by Regan Paul and Co, The creed of Budha by Edmund Holmes, published by the Bodley Head and Co, Arthur Lille's Buddh and Buddhism এবং মৎপ্রণীত সম্রাট আকবর ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

‡ The Indian Alphabet: The Calcutta Review. January, 1920.

লক্ষ্যই করেন নাই যে, 'লেখক' অর্থে লিপি-কর' কথাটা পাণিনির মধ্যে আছে। তাহাতে কি হয়? গোল্ডষ্টুকার ইহার প্রতিবাদ করিলেও, মোক্ষমূলরের অনুবর্ত্তন করিয়া পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়া বসিলেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতে লিখন প্রচলিত হয় নাই। পরে জর্জ্জ বুহ্লার ও রিস্ ডেভিস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণায় এই মতের ভ্রান্তি ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্য বিশেষভাবে জাতক গ্রন্থাবলীর অনেক স্থল আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে সময়ে ঐ গুলি প্রচলিত ছিল, তখন লিখন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজকীয় বিজ্ঞাপনাদিতে লেখা ব্যবহৃত হইত। সাধারণের মধ্যে চিঠি লেখারও ব্যবহার ছিল। লিখনপটুতা সম্মানজনক ও উপার্জ্জনের উপায়-স্বরূপ ছিল। লিখন কোন সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। সর্ব্বসাধারণে এবং স্ত্রীলোকেরাও লিখিতে পারিতেন। সে সময়ে লিখন-প্রণালী এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, তাহা শিশুদিগের ক্রীড়ার মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে হইলে যে বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই লিখন প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যখন খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখন সাধারণের অধিগম্য হইয়াছে, তখন সপ্তম শতাব্দীতে যে তাহা আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু অধ্যাপক ভাণ্ডারকার বলেন যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদিগকে যেখানে ছাড়িয়া দিলেন, আমরা কি সেইখানেই থাকিতে বাধ্য? তিনি আমাদিগকে আরও বহুদূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। পাঠকগণ তাঁহার শক্তির পরিমাণ করুন।

এক দুই হইতে আরম্ভ করিয়া পরার্দ্ধ (১,০০০,০০০,০০০,০০০) পর্য্যন্ত গণনা বৈদিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অন্যান্য সাহিত্যের কথা না বলাই ভাল। কেন না, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে। ঋগ্বেদেই লক্ষ পর্য্যন্ত গণনার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণাদিতে বারর দ্বিগুণ চব্বিশ, চব্বিশের দ্বিগুণ আটচল্লিশ—এইরূপ করিয়া ৩৯৩২১৬ অঙ্কে পৌছিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অন্যদিকে ভগ্নাংশে এক দিনকে ৭৫৯৩৭৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। এক হাজারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কথা আছে। গ্রীক্ বা রোমাণেরা যখন লিখিতে জানিতেন, তখনও যখন ১০০০ বা ১০০০০এর বেশী গুণিতে পারিতেন না, তখন কি করিয়া ভাবিতে পারা যায় যে, কোনও রকম লিখন-প্রণালী ছাড়াই আর্য্যেরা ভগ্নাংশের এমন জটিল প্রদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! অন্যদিকে, কেবল অঙ্কের লিখন নয়, বর্ণমালার লিখনও যে বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা 'অক্ষর' শব্দটীর দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বর্ণমালা প্রথমে প্রস্তরে খোদিত হইত। খোদিত হইলে বর্ণ যে অপেক্ষাকৃত অক্ষয় হয়, সে বিষয়ে কোনরূপই সন্দেহ নাই। সেই জন্য বর্ণের নাম অক্ষর। এই অর্থে অক্ষর শব্দ ঋগ্বেদেই যখন পাওয়া যায় এবং ঋগ্বেদের বয়স যখন অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী, তখন ভারতীয় লিপির বয়সও যে অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ বর্ষাব্দ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু ভারতে বর্ণমালার প্রচলন কেন আরও বহু প্রাচীন কালেই হইয়াছিল, এখন সেই তত্ত্ব নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইব।

ভারতে কিরূপে কোথা হইতে বর্ণমালার আবির্ভাব হইল, সে সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সেগুলিকে তিন প্রধান

ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, গ্রীক্ বর্ণমালার সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির বিশেষ সাদৃশ্য আছে দেখিয়া অনুমান করা হইয়াছিল যে, অশোকের শিলালিপির বর্ণমালা গ্রীক্ অক্ষরের অনুকরণ। কিন্তু ঐতিহাসিক পৌর্ব্ব পর্য্যায়ের হিসাবে এই মত টিকিতে পারে নাই। এ কথা এখন কেহই বিশ্বাস করে না যে, ব্রাহ্মী লিপির আদি অশোকের সময়ে। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতীয় বর্ণমালা ভারতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বিদেশে হইতে আইসে নাই। ভারতের আর্য্য পূর্ব্ব অধিবাসী দ্রাবিড়গণ ইহার আবিষ্কর্ত্তা। কেহ কেহ ভারতীয় প্রাচীন চিত্রাক্ষর (Picture writing) হইতে বর্ণমালার বিবর্ত্তন প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় দল বলেন যে, উহা সেমিতিকদিগের নিকট হইতে গৃহীত —হয় দক্ষিণ আরব, না হয় ফিনিসিয়ানগণ আমাদের উত্তমর্ণ। এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি ছিল, ভারতীয় লিপির গতি বাম হইতে দক্ষিণে, সেমিতিক লিপি বিপরীত মার্গগামী। সুতরাং একটা আর একটার অনুকরণ হইতে পারে না। কিন্তু এই আপত্তির খণ্ডন মিলিয়াছে। অতি প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিও যে বামাবর্ত্ত, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পণ্ডিতেরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি, অশোকের লিপিতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোথায়ও কোথায়ও ধ, ট, ও উল্টাভাবে ([illegible]) লেখা আছে। যুক্তাক্ষরের বেলায় সাধারণতঃ ট/ণ, ষ্ট, ব্য না লিখিয়া ণ্ট, ট/ষ, যু এইরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামদিকে লেখার গতি হইলে যাহা হইত, তাহারই স্মৃতি-চিহ্ন এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। (আমাদের হন হ্ল এর অর্থ কি?) কেবল অশোকের শিলালিপি কেন, সিংহলে বহু লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যাহার অনেকগুলি দক্ষিণ হইতেই পাঠ আরম্ভ করিতে হয়। ইহা কেবল অতি প্রাচীন লিপিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক লিপিতে এই বৈশাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বহুপূর্ব্বে ব্রাহ্মীলিপিও বামাবর্ত্ত ছিল, অশোকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণাগতি আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বামাগতির ধাক্কা তখনও চলিতেছিল। গ্রীশেও ঠিক্ এইরূপেই ঘটিয়াছিল। আধুনিক লেখা যদিও দক্ষিণাবর্ত্ত, কিন্তু প্রাচীন লেখার উত্তমর্ণ ফিনিসীয়দের বামাবর্ত্ত ধারাই বিদ্যমান। ব্রাহ্মীলিপির বেলায়ও এই রূপই ঘটিয়া থাকিবে, ইহা ধরিয়া লওয়াতে উক্ত লিপি যে বিদেশাগত, এই যুক্তির বিপক্ষে যাহা প্রধান বাধা ছিল, পণ্ডিতেরা তাহা অপসারিত করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশ হইতে যদি আসিয়া থাকে, তবে কোথা হইতে আসিল, তাহা যতক্ষণ না প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ প্রশ্নের পূর্ণ মীমাংসা হইল না। দক্ষিণ আরবের অক্ষরের সঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালার সাদৃশ্যটা অত্যন্ত মনগড়া। বিশেষতঃ আমাদের উচ্চারণ প্রণালীর হিসাবে এ দাবী টিকিবেই না। অন্যদিকে, উত্তর সেমেটিক অক্ষরের দাবীর বিরুদ্ধে এক প্রবল আপত্তি আছে। বরং তর্কের খাতিরে এ কথা স্বীকার করা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ আরবের সঙ্গে ভারতের আদান প্রদান ছিল, কিন্তু প্যালেষ্টাইনের সীমানার খবর যে সে সময়ে ভারতের ছিল, তার তো কোন প্রমাণই কেহ দিতে পারেন নাই। এই যুক্তি দিয়া পণ্ডিতবর রিস্ ডেভিস্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ও সেমিটিক বর্ণমালা কেহ কাহারও নিকট ধার করে নাই, উভয়েই

ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী এক অতি প্রাচীন বর্ণমালা হইতে গৃহীত। কিন্তু এই অতি প্রাচীন বর্ণমালাটা যে কি, তিনি তাহা নির্দ্দেশ করিতে না পারায় আর আর পণ্ডিতেরা তাঁর কথাকে আমলই দেন নাই। সুতরাং সকলে 'নাই মামার চাইতে কাণা মামা ভাল' এই ন্যায়ানুসারেই বোধ হয় উত্তর সেমেটিক জাতির উত্তমর্ণত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াই ঘুমাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি এমন কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে তাঁহাদের নিদ্রার বা কিছু ব্যাঘাত ঘটে। তিন বৎসর হইল, নিজাম রাজ্যের কোন এক প্রাগৈতিহাসিক কবর-খানা হইতে কয়েকটী ঘট উত্তোলিত হয়। ইহার একটা ঘটের মধ্যে প্রত্নতত্ব বিভাগের কর্ত্তা ইয়াজদানি সাহেব ব্রাহ্মী বর্ণমালার অক্ষরের অনুরূপ একটা দাগ দেখিতে পান। তখন তিনি সবগুলি ঘট ধুইয়া দেখিতে পাইলেন, সব গুলির মধ্যেই দাগ রহিয়াছে। মাদ্রাজ মিউ-জিয়ামে সে সকল প্রাগৈতিহাসিক ঘট সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই ঐরূপ দাগ ধরা পড়িয়াছিল। সুতরাং ইয়াজদানিসাহেব উক্ত মিউজিয়ামে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও মান্দ্রাজের চতুর্দ্দশ জিলা হইতে এতাবৎকাল সংগৃহীত ঘট ও ঘটাংশ সমূহ নিজে পরীক্ষা করিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে তিনি নানা প্রকারে ১৩১ টী দাগ দেখিতে পাইলেন। আরও অন্য প্রকারের দাগ বা আঁচড় যে আবিষ্কৃত হইবে, এরূপও আশা করা যায়। এখন কথা এই, হায়দরাবাদের এই সকল হাঁড়ি কলসী যে প্রস্তর ইরামতের সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে, তাহার বয়স খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কম নহে এবং মান্দ্রাজ মিউজিয়ামের কোন কোনটা নব প্রস্তর (Neolithic Age) যুগের। সুতরাং অন্ততঃ পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তরই হউক আর দক্ষিণই হউক, কোন সিমিটিক অক্ষরের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এত বৃদ্ধ কিনা. সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ! সুতরাং যাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতীয় লিপির নিদান ভারতেই খুঁজিতে হইবে, তাঁহাদেরই কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে চলিল। রিস্ ডেভিস্ যে বলিয়াছেন, ভারতীয় ও সেমিটিক লিপির পূর্ব্বপুরুষ এক, সে মতকে সত্য করিতে হইলে, ইউফ্রেটিস নদীর তীর না খুঁজিয়া গোদাবরী ও কাবেরীর মধ্যখানে অন্বেষণ করিতে যে হইবে না, তাহার কোন অর্থ নাই। কেন না, ইয়াজদানী সাহেবের আবিষ্কৃত পাঁচটী দাগ অতি প্রাচীন ব্রাহ্মীবর্ণ-মালার পাঁচটা অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। এইরূপ প্রাগৈতিহাসিকের সঙ্গে ইতিহাস যুগের বর্ণমালার সাদৃশ্য আরও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইয়োরোপে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন প্রস্তরযুগের মধ্যবর্ত্তী স্তরে এমন সব প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে, যাহার দাগ বহুসহস্র বৎসর পরবর্ত্তী বর্ণমালার আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যদিকে কেবলমাত্র পাঁচটী অক্ষরের সাদৃশ্য আছে বলিয়া নিরাশ হইবারও কোন কারণ নাই। পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। বিশেষতঃ দুইটী বর্ণমালার মধ্যে যখন সহস্র সহস্র বৎসরের দুরত্ব, তখন ইহার বেশী আশাই করা যায় না। বরং কেহ কেহ এই কথাই বলিতে পারেন যে, এত দিনের যখন পার্থক্য, তখন সাদৃশ্য থাকাই সন্দেহের কথা। কিন্তু মিসরের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চাশ শতাব্দীর দাগের সঙ্গে খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীর ফিনিসীয় অক্ষরের সাদৃশ্যে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। আমাদের দেশেও খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পিপ্রাহ্ব স্তুপের গ অক্ষর বর্ত্তমান ক্যানারী বা অক্ষরের

সঙ্গে হুবহু এক। যাহা হউক, এই সব দাগের মধ্যে কোন কোনটায় যে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরের যোগ, তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। এই সকল কারণে মনে হয় যে, উহা কেবল দাগ বা চিহ্ন নয়, অক্ষরই বটে। একমাত্র আপত্তি এই, যদি অক্ষরই হইবে, তবে একটা একটা অক্ষত কেন? এ গুলি অক্ষর না হইয়া স্বামিত্ব নির্দ্ধারণের চিহ্ন মাত্র হওয়াই স্বাভাবিক। উত্তর এই যে, যখন এই দাগ গুলির অক্ষরত্ব সম্বন্ধে অনেক যুক্তি রহিয়াছে, তখন স্বামিত্বের চিহ্ন মাত্র না হইয়া স্বামীর নামের আদ্যক্ষর হওয়ায় আপত্তি কি? কেন না, ইহার সপক্ষে প্রমাণ রহিয়াছে। ভারতের বাহিরে, যথা—মিসর ও ইউরোপের কোন কোন স্থানে প্রাপ্ত ইতিহাস-পূর্ব্ব বা আদি ঐতিহাসিক যুগের অনেক দাগের সঙ্গে এই সকল দাগের একত্ব আছে এবং অন্যত্র প্রাপ্ত ঐ সকল দাগ পণ্ডিতেরা অক্ষর বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ একটী অক্ষর খোদাই করার রেওয়াজ ভারতেও রহিয়াছে। ৩ নম্বরের সাঞ্চী স্তূপে দুইটী স্মারক (কৌটা) ঝাঁপি (Relic casket) পাওয়া যায়, যার একটার উপরে ম ও অন্যটার উপরে স লেখা রহিয়াছে। ইহা সহজেই স্বামিত্বের চিহ্ন বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারিত, কিন্তু দেখা গেল যে, দুইটী বড় বাক্সে ঐ ঝাঁপি দুইটী ছিল, তাহাদের গায়ে সরীপুত্ত ও মগলন এই দুই ব্যক্তির বিষয়ে কিছু লেখা রহিয়াছে। সুতরাং ঐ স ও ম যে দুই ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ রহিল না। কিন্তু বড় দুইটী বাক্স নষ্ট হইয়া গেলে, এই সহজ সিদ্ধান্ত সুদূরপরাহত হইত। যখন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ঘট পট লইয়া বিচার, তখন আমরা যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ঐ দাগ গুলিকে এই দৃষ্টান্তানুসারে নামের আদ্যক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সংশয়চ্ছেদী প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বাবু পঞ্চানন মিত্র মিউজিয়মে রক্ষিত নানা রকমের প্রস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দুই খানির মধ্যে কিছু লেখা আছে বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি তাহা অধ্যাপক ভাণ্ডারকারকে দেখান। এক খানি আসাম প্রদেশে প্রাপ্ত নব প্রস্তর যুগের একটা অস্ত্র। ইহার মধ্যে চারিটী অক্ষর আছে—এক লাইনে—মটোর মত করিয়া লেখা। তিনটী অক্ষর মিসরের প্রায় ইতিহাসিক অক্ষরের মত। অন্যটীও নবপ্রস্তর যুগের—ডানহাতের পাতার আকৃতি—রাঁচিতে প্রাপ্ত। ইহাতে তিনটী অক্ষর। অধ্যাপক ভাণ্ডারকার ঠিক করিয়াছেন যে, উহা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে পাঠ করিতে হইবে এবং ঐরূপে পাঠ করিলে দাঁড়াইবে—মা-অ-ত। ইহা ব্রাহ্মীবর্ণ মালার অনুরূপ। ছোটনাগপুরে মাহত (হ এর উচ্চারণ অনুচ্চ) অর্থ (আদিম অধিবাসী-মধ্যে) 'প্রধান'। (মহৎ নয় তো—?) সে যাহাই হউক, এই অক্ষরগুলিকে আর স্বামিত্বের চিহ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। ইহারা ৩ ও ৪ অক্ষরের লেখা ছাড়া আর কিছুই নয়; কেন না, যে সব চিহ্ন অক্ষর বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এই সকল দাগের পারিবারিক সম্বন্ধ নিঃসন্দেহ। ইহাদের বয়স ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার বৎসরের মধ্যে। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর সেমিটিক বর্ণমালা হইতে ব্রাহ্মীলিপির আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিলে হয়তো পিতার সঙ্গে পুত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া পুত্র হইতে পিতার উৎপত্তি নির্ণয় করার মত একটা ছোট খাট রহস্যের উদ্ভবও হইতে পারে। সেমিটিক উৎপত্তির প্রধান

যুক্তি যে আদি ব্রাহ্মীলিপির বামাবর্ত্ত-গতি, তাহা তো নব প্রস্তর যুগের রাঁচির 'মহৎ' দক্ষিণ হস্তে অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, ব্রাহ্মীলিপির নিদান খুঁজিতে আমাদিগকে ইতিহাস পশ্চাতে ফেলিয়া ভারতের সেই প্রাগৈতিহাসিক আদি মানবের শরণাগত হইতে হইবে, যাঁহার নিকট হইতে ভারতে নবাগত আর্য্যগণের ও অন্যান্য জাতি সকলের অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল। কে জানে, গ্রীক্, ফিনিসীয়, এমন কি, মিসরীয়-গণও তাঁহারই নিকট ঋণ গ্রহণ করেন নাই, যে ঋণ আর কখনও শোধ হইবে না। বর্ণ মালার উদ্ভব যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সে বিষয়ে প্রায় কাহারও সন্দেহ নাই। তবে মিসর ও ভারতের কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, তাহা জোর করিয়া বলিবার অধিকার ভারতবাসীর নাই। মিসরের প্রত্নতত্ত্ব বয়োবৃদ্ধ। সুতরাং পণ্ডিতগণের টান্ সেই দিকেই। ভারতে প্রত্নতত্ত্বের শৈশব মাত্র। এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার খন্তা কোদালের উপর—মানবের অতি প্রাচীন দুই বন্ধু। কেবল গোড়ামিতে কোন লাভ হইবে না। এ বিষয়ে গোড়ামি আমাদিগকে কেবল হাস্যাস্পদই করিবে। খন্তা কোদালের সাহায্য না পাইলে এ ক্ষেত্রে কলমেরও জোর বড় কম। ভারতবাসী পুরাণ ছাড়িয়া খন্তা কোদাল ধরুন। ভারতমাতা বক্ষ চিরিয়া রত্ন উপহার দিবেন, তাহা দ্বারাই জগতে তাঁহার মাতৃত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে—আমাদের গোড়ামির দ্বারা নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মধূৎসব।

হিমান্তে মধু পূর্ণিমা নিশা
স্বচ্ছ স্বর্গতল ;
বিলাসে চিত্রা চন্দ্রমাপাশে
উল্লাসে বিহ্বল !
দিব্য সুধায় প্লাবিত বসুধা—
উন্মাদনায় মাতি—
রতি অনঙ্গে এল কি রঙ্গে
উজলি বিজলী ভাতি ? (১)

অশোক-পদ্ম-রক্তোৎপল
চূত-মঞ্জরী সনে
নবমল্লিকা—পঞ্চশায়ক—
ব্যাপৃত সম্মোহনে।
হেরি ঋতুবরে বরিলা প্রকৃতি,
—স্বর্গ ধরার বুকে,—
দিগবধূ রসে ঘোষে উলুধ্বনি
কোকিল কণ্ঠে সুখে। (২)

দক্ষিণ গিরি তেয়াগি অরুণ
উত্তরে আনে রথ,
লুপ্ত তুষারে ঊষার দীপ্তি,
হাসে সরে কোকনদ।
আননে পরাগ শোভে মধুবধূ
ভুজলতা বঁধু গলে ;—
নিতম্বে বাজে মরাল-মেখলা
কমল শয়ন তলে। (৩)

মদনোৎসবে দুলি' হিন্দোলে
বসন্ত-বিলাসিনী—
ঝাঁপায়ে পড়িছে বল্লভ বুকে
কৌতুকে সোহাগিনী।
তিলক-মুক্তা অলি-কুন্তলে
শ্রবণে যবের শীষ ;
সরিৎ-মুকুরে সে মধু মিলন
ফলিত অহর্নিশ। (৪)

শ্রীরসময় লাহা।

আবাহন।

পৃথিবী-ব্যাপী কি এক বিরাট জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। মানব-সমাজে এমন কোন স্তর নাই, যেখানে এই জাগরণের সজীব লক্ষণ প্রকাশ হয় নাই বা হইতেছে না। কি বিশাল আয়োজন, কি বিরাট বন্দোবস্ত! এই জাগরণের শেষ পরিণতি কি, তাহা কে বলিতে পারে? আর কোন্ অজ্ঞাত দেশে কোন্ মহা-মহিমান্বিত শক্তিশালী ঋত্বিক এই প্রজ্বলিত হোমানলে আহুতি প্রদান করিতেছেন, তারই বা কে সন্ধান রাখে?

এই জাগরণের লক্ষণ পাশ্চাত্যদেশেই অধিকতর সজীব। কারণ সেখানেই ইহার গতি ও শক্তি অপ্রতিহত। যে নিষ্পেষিত, নির্য্যাতিত শ্রমজীবিগণ সমাজের মেরুদণ্ড, তাহারাই সেখানে এই জাগরণের সূত্র ধরিয়াছে। ধনীদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষণের ফলে এই পাশ্চাত্য শ্রমজীবিগণ বা শূদ্রজাতি আজ মোহনিদ্রা দূর করিয়া নিজ উন্নয়নের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহারা পরমুখপেক্ষী নয়। তাহারা নিজ লক্ষ্য চিনিয়াছে, নিজের শক্তি বুঝিয়াছে, তাই প্রমত্ত ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন উৎপাটিত করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠান করিতেছে। এই ভীষণ শূদ্রশক্তির অপ্রতিহত গতির সম্মুখে শুধু ধনী সম্প্রদায় নহে, শক্তিশালী রাজ-শক্তি পর্য্যন্ত ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং বাড়বানলের মত ইহা প্রলয় ভীষণ হুহুঙ্কার করিয়া বিদ্যুৎগতিতে পৃথিবীকে আলোড়িত করিয়া চলিয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতের এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া স্বভাবের নিয়মে এই দুর্ভিক্ষ-মহামারি-প্রপীড়িত ভারতবর্ষেও আরম্ভ হইয়াছে। এখানেও এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার উত্তেজনা আবাল বৃদ্ধ সকলকেই স্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়াছে। প্রকৃতির কি বিধান, ক্ষুধিত হও, ব্যথিত হও, জন্মভূমির প্রতি প্রীতির যে তোমার তন্ত্রী, তাহা ধনীর সহিত, সুস্থকায়ের সহিত এক সুরে বাঁধা, তাহা একই সুরে ঝঙ্কারিয়া উঠিবেই, তাই শুষ্ককণ্ঠ, ক্ষুধিত, পীড়িত ভারতবর্ষ এই নবজাগরণের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। নিদ্রিত সিংহ প্রথম জাগরণেই এই যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহে জীবন পণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কা হয়, মুমূর্ষু রোগী যেমন অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই জাগরণের স্পন্দনে অস্থিচর্ম্মসার ভারত-বাসীও বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য জগতে যাহাই হউক, ভারতের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। ভারত নাগপাশের শত বন্ধনে আবদ্ধ। সকল বিষয়ে সে পর-প্রত্যাশী। হৃদয়ে দারুণ জ্বালা, কিন্তু শক্তি-শেলে নিপতিত। এই দুর্দ্দিনে ভারতের বৈদ্য-সঙ্কট উপস্থিত। বিদেশী বণিক রাজা এই জাগরণে নিজে স্বার্থহানি বুঝিয়া প্রতি-পদেই বাধা দিতে সদা জাগ্রত। কিন্তু রাজশক্তিই একমাত্র বাধা হইলে চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ দুরবস্থাই সকল দুঃখের মূল। সমাজের পুরাকালে প্রযুজ্য রক্ষণশীল কঠোর বিধান এই অবস্থাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আর সকল কথার সার কথা এই ভীষণ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যই সকল দুঃখের মূল, সকল আশার উৎসাদক।

দরিদ্র হইলে জাতির যে পরিণাম হয়,

শত শত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যে আমাদের তা সকলই ঘটিয়াছে। আমাদের ক্ষুধায় অন্ন নাই, তৃষ্ণায় জল নাই, শরীরে স্বাস্থ্য নাই, রোগে ঔষধ নাই, লজ্জায় আবরণ নাই, অত্যাচারে প্রতিকার নাই। যাহাতে মানুষ মানুষ হয়, যাহাতে জীবন ধারণ হয়, তাহার কিছুই আমাদের নাই। আমাদের রোদন সম্বল। প্রতিপদে আমরা রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী এবং প্রতিপদেই প্রত্যাখ্যাত। সৈন্য সংরক্ষণ এবং হোম চার্জ্জের ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া কিছু থাকে না, তা আমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার ব্যয় কোথা হইতে করা যাবে? সুতরাং সে দিকে কোন আশা নাই। তবে আর আশা কোথায়? দেশের মধ্যে যাঁহারা লক্ষীর বরপুত্র, তাঁহারাও মোহাচ্ছন্ন। দেশের দুরবস্থা বুঝিবার তাঁহাদের অবসর নাই। নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে, উপাধি লাভ করিতে এবং ভোগ বিলাসে তাঁহারা কেবল মুক্তহস্ত নহেন, তজ্জন্য ঋণভারগ্রস্ত। দেশের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর করাও, শুনিবে, অর্থাভাব। আর পরের দুঃখ তাঁহারা বুঝিবেনই বা কি প্রকারে? প্রজা রক্ত জল করিয়া, প্রাণপণে, রৌদ্র বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া যাহা আহরণ করিবে, তাঁহারা তাহা শোষণ করিয়া আনিয়া বহুদূরে সহরে বসিয়া নানা উপায়ে জলের মত ব্যয় করেন। প্রজার সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই। প্রজার নিকট করাদায় করা মাত্র যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের নিকট সহানুভূতি আশা করা একেবারেই বৃথা।

এই দারুণ নিরাশার মধ্যে একটু আশার কথা এই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত লোক দেশের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যে ঠিক পথে চলিতেছেন, তাহার পরিচয় কোথায়? দেশের ত লক্ষ্য এক, কিন্তু সেই লক্ষ্য-পথে চলিতে চলিতে তাঁহারা বিষম দলাদলির সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। আদর্শ লইয়া মারামারি, কথা-কাটাকাটি, ফলে মনান্তরের সৃষ্টি। দেশ যেখানে আছে, সেই খানেই পড়িয়া থাকিতেছে, তাঁহারা নিজ নিজ পক্ষের জিদ বজায় রাখিতেই বদ্ধপরিকর। যতক্ষণ তাঁহারা বৃথা বিবাদে নিযুক্ত, ততক্ষণ যদি দেশের ক্ষত অনুসন্ধান করিতেন ও তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে বুঝি যথার্থ কাজ হইত। কৈ সে দিকে ত কাহারও দৃষ্টি নাই। তাঁহারা বিবাদে নিযুক্ত, এদিকে দেশ হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। কেন এমন হয়? ইহার এই অর্থ নয় কি যে, নেতৃবর্গের মন মুখ এক নন্? তাঁহারা যে স্বদেশ-হিতের কথা বলেন, সে কেবল আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধির ভাণ মাত্র। তাঁহাদের হৃদয়ে আন্তরিকতা নাই, সত্যের আলোক নাই, প্রেম নাই। যে আন্তরিকতায়, যে সত্য লাভের চেষ্টায়, যে প্রেমে প্রাণ পাগল করে, যাহা আদর্শে পৌছিবার জন্য সকল ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভুলাইয়া দেয়, যাহাতে আত্মপর, বিবাদ বিসম্বাদ, ভেদাভেদ একেবারেই মুছিয়া দেয়, সেই প্রেম নাই। কোন্ নেতা বলিতে পারেন, দেশের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া তাঁহার আহারে রুচি নাই, চোখে নিদ্রা নাই, তাঁহাকে পাগল করিয়াছে? কে বলিতে প্রস্তুত আছেন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতে, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিতে, ব্যাধিগ্রস্তকে ঔষধ পথ্য দিতে, তিনি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত, সকল বাধা বিঘ্ন, সকল আপদ বিপদ মাথায় করিয়া লইতে, এমন কি, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় দান করিতে, প্রস্তুত আছেন? যাঁহারা

তাহাতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের কথা কেহ শুনিবে না,—রাজা শুনিবেন না, দেশ শুনিবে না। মুখের কথায় আর দেশ ভুলিতে চাহে না। যাহার প্রেম নাই, প্রাণ নাই, অনুভূতি নাই, তাহার কোন কথা বলিবার অধিকারই নাই। হৃদয়ে প্রেম থাকিলে শক্তি আপনি আসিত। যে প্রেম কেবল দিতেই জানে, নিতে জানে না, যে প্রেম আত্ম প্রতিষ্ঠানকে বিষের চক্ষে দেখে, যে প্রেম সকল স্বার্থ, সকল হীনতা, সকল সঙ্কীর্ণতাকে পদদলিত করিয়া লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়, পরার্থেই, পরসেবাতেই যে প্রেমের তুষ্টি ও পর্য্যবসন, যে প্রেম কেবল সেবা করিয়াই তুষ্ট প্রতিদানে শিহরিয়া উঠে, চাই সেই প্রেম। এই দুর্দ্দিনে কেবলমাত্র সেই প্রেমই ঔষধ, অন্য উপায় নাই। সমগ্র লোকের প্রাণে এপ্রেম, এ শক্তি না জাগিতে পারে, কিন্তু যদি একজনেরও প্রাণে জাগে, তবে সে এক লক্ষ লোকের কাজ করিবে। তাহার ইঙ্গিতে দেশ উঠিবে বসিবে। কে এই প্রেমের সাধনা করিতেছে? এ সাধনা কি বড় কঠিন কথা? এই অবতারের দেশে, যোগী ঋষির দেশে, রামচন্দ্র, জনক যুধিষ্ঠিরের দেশে, বুদ্ধ চৈতন্যের দেশে, প্রতাপ, রাম-মোহন, বিবেকানন্দের দেশে এই ত্যাগ, এই সাধনা কি নূতন কথা? এ যে সন্ন্যাসীর দেশ, এযে কেবল ত্যাগেরই দেশ! এখানে ত ভোগ বিলাস ছিল না। সবই ছিল, সবই আছে, নাই কেবল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাহস। একবার মোহ অপসারিত করিয়া, অবসাদ দূর করিয়া সাধনায় তৎপর হও, দেখিবে, এই মানুষ দেবতা হইবে, এই মানুষই অসাধ্য সাধন করিবে। গিরি নদ নদী সাধকের সকল পথ ছাড়িয়া দিবে।

রাজ-মন্ত্রণা সভায় উত্তেজনাপূর্ণ রাজ-নৈতিক বক্তৃতায় ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে, সংবাদ পত্রে বা বক্তৃতামঞ্চে রাজ কার্য্যের সতেজ আলোচনা করিলে বা বিপক্ষকে তর্কে পরাভূত করিতে পারিলেও তুষ্টি লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কার্য্য হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিব না।

দেশের জন্য আমরা কতই না করিতেছি, কিন্তু যাহাদের লইয়া দেশ, যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, যাহারা দেশকে রক্ষা করিতেছে, অথচ যাহারা উপেক্ষিত, পদদলিত, তাহাদের জন্য আমরা কি করিতেছি? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোক না থাকিলেও দেশ চলিতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত বর্ব্বর বলিয়া যাহাদিগকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি, অথচ যাহারা আছে বলিয়া আমরা রক্ষা পাইতেছি, তাহারা না থাকিলে দেশ থাকে না। অথচ তাহারাই ক্রমে নানা উপসর্গে উচ্ছন্ন যাইতেছে। তাহাদের সচ্ছল উদরান্নের সংস্থান না করিলে, তাহাদিগকে ব্যাধির করাল গ্রাস হইতে রক্ষার বন্দোবস্ত না করিলে, তাহাদের সুপানীয় জলের ব্যবস্থা না করিলে, তাহাদিগকে বিদ্যার আলোক দিবার আয়োজন না করিলে, কেবল তাহাদের নয়, বিধাতার অভিশাপে দেশ দগ্ধ হইয়া যাইবে। যত আন্দলন, যত আস্ফালন সব বৃথা হবে।

উচ্চ নীচের ভেদাভেদ, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ যতদিন সকলকে পৃথক পৃথক করে রাখিবে, যতদিন নিপতিত জাতিকে, শূদ্রকে ভাই বলিয়া হাত ধরিয়া তুলিতে না পারিবে, তাদের সকল জ্বালা যন্ত্রণার অংশী হইতে না পারিতেছ, ততদিন তোমার বৃথা আস্ফালনের পৃষ্ঠপোষক কেহ নাই, জানিবে। আগে তাহাদের আপন কর, ভালবাস, তাদের দুঃখের সংবাদ লও, তাদের মধ্যে তাদের এক

জন হইয়া বসবাস কর, সকল অহঙ্কার ত্যাগ কর, দেখিবে, আর দলাদলির কোন আ বশ্যক নাই ; তোমার বৃথা শ্রমের লাঘব হবে, তখন দেখিবে, তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে কোটি কোটি নরনারী উঠিবে, বসিবে, প্রাণ দিবে। দেখিবে, তোমার পশ্চাতে দুর্জ্জয় সংঘবদ্ধ বিরাট শূদ্র-শক্তি তোমার সাধনার সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধী এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, আর আজ ভারতবর্ষেও তাঁহার পশ্চাতে কি এক নির্ভীক অপরাজেয় শক্তি সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার পরিচয় অতি অল্প দিন পূর্ব্বেই পাইয়াছ। এই শক্তি সাধনায় লাভ হয়, তাহাত দেখিয়াছ, আর এই শক্তি লাভ করিলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহার তুলনা নাই। প্রেমেই এই আত্মপ্রসাদের প্রতিষ্ঠা। প্রেমেই ত্যাগ আনিয়া দিবে, আত্মসমর্পণ-যোগ শিক্ষা দিবে। যদি নিরঙ্কুশ, নিরাবিল ভোগের লালসা থাকে, তবে ত্যাগ কর। একবার ত্যাগ কর, দেখিবে আর ত্যাগ করিতে হবে না, তোমার ভোগের পরিসীমা থাকিবে না। একবার ত্যাগ কর, দেখিবে, সমগ্র দেশ তোমার ভোগের শত উপচার সংগ্রহ করিয়া তোমারই জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, যদি আপন ভাইএর রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকেই পদদলিত করিয়া রাখিতে চাও, তবে দেখিবে, একদিন এই দুর্জ্জয় জাগ্রত শূদ্র-শক্তি তোমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া নিজের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে এবং বিধাতার নির্দ্দিষ্ট সমতা সাধন করিবে, তোমার প্রতীক্ষায় আর বসিয়া থাকিবে না। সে দুর্দ্দিনে তোমার আর্ত্তনাদে সমবেদনা জানাইতে আর কাহাকেও পাইবে না।

হে নিত্যসিদ্ধ,সত্যব্রতধারী বীরহৃদয় প্রেমিক সাধক এস, তোমার কর্ম্মস্থল প্রস্তুত। ভারত-শ্মশানে তোমার শব সাধনার সকল উপচার প্রস্তুত হইয়া তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সময় যে বহিয়া যায়। একবার এই সাধনার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হেলায় হারাইলে আর সময় মিলিবে না। এই দারিদ্র্য, এই আধি ব্যাধি, এই মহামারি, এই দুর্ভিক্ষই তোমার দেব-পূজার ষোড়শোপচার। লক্ষ লক্ষ নরনারী তাহাতে দেহ ত্যাগ করিয়া—তোমার শব সাধনার আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, তুমি সুখ দুঃখের অতীত হইয়া এস। তুমি যে আপন মহিমায় মহিমান্বিত, তোমাকে আবার কিসে কাতর করিবে ? তোমার বিশ্রামও নাই, এই অসীম নীল চন্দ্রাতপতলে, বিস্তীর্ণ আতপ-দগ্ধ ধূলি-রাশির উপর তোমার বিশ্রাম স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, তোমার ভাইএর ক্ষুৎ পিপাসা দূর করিয়া তোমার নিজ ক্ষুৎপিপাসার শান্তি কর। এস, এসে এমন হোমানল প্রজ্জলিত কর, যাহার শিখা দেবতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তোমার ব্রত উদযাপনের সহায়তায় নিযুক্ত করিবে। প্রেমের অসাধ্য কি আছে, ভাই ? দেখিবে, তোমার যজ্ঞাগ্নিতে ভারতের সকল পাপ তাপ, সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভস্মীভূত হইয়া এক স্বর্গ-রাজ্য সৃষ্টি করিবে।

আর হে অনাদি দেব, হে বিধাতা, তুমি ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছ। তুমি ত বলেছ, তুমি আবার আসিবে। ধর্ম্মের বড় গ্লানি, অধর্ম্মের এত বড় অভ্যুত্থান ত কোন যুগে হয় নাই! এখনও কি তোমার ধৈর্য্যচুতি ঘটিল না ? এস, যথেষ্ট হয়েছে। এস, আর আমরা আত্মবিস্মৃত হব না, আর আমরা ভাইকে

পর করে দেব না, আর আমরা আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব হব না। এস, এইবার এসে, ঠিক কেন্দ্র স্থানে বসে আবার তেমনি করে তোমার প্রাণ-মাতান পাগলকরা বাঁশরী বাজাও, যাহাতে আকৃষ্ট হয়ে আমরা "গৃহ-কাজ লোক-লাজ" ভুলে তোমার পানে পাগলের মত ছুটে যাব। আবার তেমনি করে বাঁশরী বাজাও, যাহার অনাহত শব্দ-তরঙ্গে বনের পশু পক্ষী উর্দ্ধশ্বাসে তোমার দিকে ধাবমান হবে, আবার তেমনি করে যমুনা উজান বহিবে। আবার তেমনি করে মধুর বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর মদনমোহনরূপে দিক আলো করে রাসলীলা কর। হে দেবচক্রপাণি, তোমার সুদর্শন এসে দেশের সকল পাপ, সকল ত্রুটী চিরতরে বিনষ্ট কর। আবার রাধানামে জগৎ মাতাইয়া ঐ নামে সকল চৈতন্য-ধারা বহির্মুখ হইতে অন্তর্মুখী কর। নিরুপায় অসহায় জীব কেবল তোমার দিকেই চেয়ে আছে। প্রকাশিত হবে না কি?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ভগবদ্‌গীতা।

বর্ষাকালে শত শত নদনদী যেমন নানা দিক্ দেশান্তর হইতে ধাবিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তেমনি অগণিত নরপতি অসংখ্য সৈন্য লইয়া সুবিস্তৃত ভারতের সকল স্থান হইতে আসিয়া, কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ প্রান্তরে উভয় পক্ষ শিবির স্থাপন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব প্রবল পরাক্রান্ত, মদগর্ব্বিত কৌরব-গণের সেনাপতি হইয়াছেন, আর কৃষ্ণ দুর্ব্বল ও দরিদ্র পাণ্ডবগণকে পরিচালিত করিতেছেন।

ক্রমে প্রভাত হইল। দিবাকর ভারতে বিষম আত্মদ্রোহ উপস্থিত দেখিয়া রক্তিম বর্ণে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ স্বীয় স্বীয় শিবির হইতে নির্গত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষই সৈন্যগণকে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে সকলকে দণ্ডায়মান করিলেন।

শ্বেতঅশ্বচতুষ্টয় অহঙ্কারদৃপ্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথ বহন করিতেছে। সেই রথের চূড়ায় কপিধ্বজা গৌরবে উড়িতেছে। কৃষ্ণ স্বয়ং সেই রথের সারথি। এমন সময় ভীষ্মদেব ভীষণ শঙ্খনাদ করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন। অমনি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন স্বীয় স্বীয় শঙ্খের গভীর নির্ঘোষ দ্বারা স্বীয় সৈন্যদল মাতাইয়া তুলিলেন। অমনি উভয়পক্ষে বহু শঙ্খ ধ্বনিত হইল, কিছুকাল পরে আবার স্থির ও শান্তভাব ধারণ করিল। মহাঝটিকায় পূর্ব্বে প্রকৃতি প্রশান্ত হইল।

তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ, উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ রাখ, আমি একবার সকলকে দেখি।" কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। তখন অর্জ্জুন দেখিলেন, তাঁহার ভক্তি-ভাজন পিতামহ ভীষ্মদেব, পূজ্যপাদ আচার্য্য দ্রোণ, স্নেহাস্পদ আত্মীয় স্বজন, সকলেই কোন না কোন পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল। তিনি

বলিলেন, "মাধব, এই যুদ্ধে গুরুজনদিগকে নিহত করিতে হইবে, বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনষ্ট করিতে হইবে, কুলক্ষয় করিতে হইবে। এত অকর্ত্তব্য কার্য্য, এত অধর্ম্মাচরণ আমি করিতে পারিব না। জয়, রাজ্য বা সুখ, কিছুই আমি চাহি না। তাহাপেক্ষা ভিক্ষাদ্বারা জীবন যাপন করিব।" এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া, অতি বিষণ্ণ মনে রথ মধ্যে বসিয়া পড়িলেন।

তখন কেশব সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন, আর গীতার মধুর মঙ্গল গীতি আরম্ভ হইল :—

[ক] কর্ম্ম-যোগ।

অর্জ্জুন, এই বিষম বিপদ সময়ে তোমার মোহ উপস্থিত হইল! হায়, মোহই যে সকল অনর্থের মূল (২—২)! তুমি মোহ বশতই দুঃখিত হইতেছ, ভীত হইতেছ, কাপুরুষতা প্রকাশ করিতেছ। মোহ বশতই কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছ, কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য ও অধর্ম্ম বলিয়া ভাবিতেছ।

১। আত্মা নিত্য বস্তু, তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা নষ্ট হয় না(২—১৮।২০)। এই জন্য জ্ঞানীগণ কেহ জন্মিলেও আনন্দিত হন না, কেহ মরিলেও দুঃখিত হন না (২—১১)। মনুষ্য যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া, নূতন শরীর গ্রহণ করে (২—২২)। তবে দুঃখিত হইতেছ কেন? যদি মনে কর আত্মা জন্মিতেছে, আর মরিতেছে, তাহতেই বা দুঃখ কি? সংযোগ হইলেই বিয়োগ হইবে, বিয়োগ হইলেই সংযোগ হইবে। জন্মিলেই মরিতে হইবে, মরিলেই জন্মিতে হইবে (২—২৬।২৭)। যেমন এই দেহে কুমার, যৌবন, জরা, এই ত্রিবিধ অবস্থা হয়, সেই রূপ মৃত্যুও হয়। (২—১৩)। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। তবে কেন অপরের প্রাণত্যাগে দুঃখিত হইবে? বা মহৎকার্য্যে আত্মোৎসর্গ প্রদান করিতে ভীত হইবে?

২। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন কর (২—৩১) স্বদেশ সেবাই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও জন সাধারণের হিতসাধন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করা, দেশের জন্য প্রাণদান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা, দক্ষতা এবং স্বাধীনতা ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম, দেশসেবকেরই কর্ম্ম (১৮—৪৩)। আর, আজ তুমি তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছ! কৌরবেরা অন্যায় অত্যাচার বলিয়া তোমাদের রাজ্য গ্রাস করিয়াছে। তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া ও তোমাদের রাজ্য উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য। কারণ অত্যাচার ও অবিচার প্রশ্রয় পাইলে কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারেনা, কোন দেশই উন্নত হইতে পারে না। অতএব দেশোপকারের জন্যও তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি তুমি এই যুদ্ধ না কর, সকলেই তোমার নিন্দা করিবে। হায়, নিন্দিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ! যদি এই যুদ্ধে

* কোন একটি বিষয়ে মনকে সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত রাখার নাম, অর্থাৎ একাগ্রতার নাম যোগ। এখানে কর্ম্ম-যোগ অর্থে কর্ম্ম করিবার কৌশল বা প্রণালী (গীতা ২—৫০)। গীতার কর্ম্ম অর্থে সকল প্রকার কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত M-A, B-L, প্রণীত গীতায় ঈশ্বরবাদ পৃঃ ৩৭। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত ৫ খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদ। আমরা গীতার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত আদির সহিত তাহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বলিতেছি। ইহা গীতার উপর Lecture বিশেষ।

তোমার মৃত্যু হয়, সেও ভাল। দেশের জন্য সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা পুরুষের প্রশংসার বিষয় আর কি আছে? আর যদি জয়ী হও, ভারত ভোগ করিতে পারিবে (২—৩৭)।

৩। কর্ম্ম কখনও ত্যাগ করিও না *। তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা-উপজীবী সন্ন্যাসী হইতে চাহিতেছ, ইহা অত্যন্ত অকর্ত্তব্য। (১) কর্ম্মত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। জীবন ধারণের জন্যও যে অহরহ কর্ম্মের প্রয়োজন (৩—৮)! কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। মনুষ্য ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতিই তাহাকে সতত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে (৩—৫)। (২) বেদ যে যাগ যজ্ঞের বিধি দিয়াছেন, সেই যাগযজ্ঞও কর্ম্ম ব্যতীত আর কি (৩—১৪।১৫)? অতএব কর্ম্ম কোন ক্রমেই নিন্দনীয় নহে। (৩) জনকাদি রাজর্ষি কর্ম্ম দ্বারারই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন (৩—২০)। (৪) মনুষ্য সমাজের উন্নতির জন্যও কর্ম্ম করা প্রয়োজন (৩—২০)। একমাত্র কর্ম্ম-বলেই মনুষ্য-সমাজ চলিতেছে, একমাত্র কর্ম্ম ফলেই এত উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। একমাত্র কর্ম্মদ্বারাই দেশোন্নতি সাধিত হইতেছে। এই পৃথিবী মহা কর্ম্ম-ক্ষেত্র। কর্ম্মত্যাগে দেশে অলসতা আসিবে, দুঃখ বৃদ্ধি হইবে, দেশ অধঃপাতে যাইবে। (৫) এই বিশ্বের কর্ম্মই কৌশল। ইহাও কার্য্যকারণ পরম্পরায় চলিতেছে। অতএব কর্ম্মত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। (৬) আবার কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলেই কি মুক্তি লাভ হয় (৩—৪)? তাহা হইলে পাহাড় পর্ব্বত ত আজন্ম-সিদ্ধ? কেহ কর্ম্ম না করিয়াও যদি মনে মনে সতত কুচিন্তা করে, তবে সে ঘোর পাপী (৩—৬)। মন-শুদ্ধিই আসল কথা, মন-শুদ্ধিই মুক্তির উপায় (৩—৬।৭)। (৭) শুধু জ্ঞানের দ্বারায়ও মুক্তি অসম্ভব। কারণ জ্ঞান আহরণার্থ কর্ম্ম করার প্রয়োজন (৬—৩)। কর্ম্ম না বলিয়া কোন জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ লয় না *। কর্ম্ম-দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞান সংশোধিত হয়। কর্ম্ম দ্বারায়, সাধনা দ্বারায় জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়। কর্ম্মই দুঃখ দূরের উপায়, বিমল আনন্দ লাভের হেতু। তেমনি

* গীতা ২—৪৭।৪৮॥ ৩—৭।৮।১৯।২০।২৬।৩০॥ ৫—২॥১৮—৯।২৩।৪৬। অর্জ্জুন যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে, কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ করা কোনমতে কৃষ্ণের মত হইতে পারে না। আর তাহা হইলে গীতার কর্ম্মযোগের সার্থকতাই থাকে না। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত, ভারতের এই বড় দর্শন। ইহাদের মত এই যে, সংসারে সুখের ভাগ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই বেশী। সেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এবং অত্যন্ত ও নিত্য সুখ লাভই পরম পুরুষার্থ। তাহার উপায় কি? পূর্ব্ব মীমাংসার মত এই যে, স্বর্গ কামনায় বেদবিহিত যাগ যজ্ঞ কর। কারণ তাহা হইলে স্বর্গ লাভ হইবে এবং স্বর্গ লাভ হইলে দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের সাক্ষাৎ হইবে। আর সকল দর্শনের মত এই যে, মনুষ্য যত কার্য্য করে, সুখ ভোগের বাসনায় করে। কিন্তু সকল কার্য্যই সুখের হয় না, সুখকর না হইলে দুঃখেরই কারণ হয় মাত্র। অতএব বাসনাই দুঃখের মূল। সেই বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে কি রূপে? কর্ম্মত্যাগ করিলে বাসনাও যাইবে। অতএব কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করাই শ্রেয়। কৃষ্ণ গীতায় এই সকল মত খণ্ডন করিতেছেন। বলিতেছেন, "কাম্য কর্ম্ম করিওনা, তাহাতে দুঃখ হইবে। কিন্তু নিষ্কামভাবে আজীবন লোকহিত, দেশহিত সাধন কর, তাহাতে দুঃখ হইবে না, বরং আনন্দ হইবে। তাহা করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম।" ইহাদ্বারা দেখা যায় যে, সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থ কৃষ্ণের মতবিরুদ্ধ। ইহা কৃষ্ণের ন্যায় মহাকর্ম্মবীরের মহাদেশ-সেবকের উপযুক্ত বটে।

আবার জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাচিত হয়, জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হয়। যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সে কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারেনা। জ্ঞান ও কর্ম্ম, ইহারা নিত্য-সম্পর্ক-বিশিষ্ট। (৮) আবার জ্ঞানী ব্যক্তিরও সতত কর্ম্ম করার প্রয়োজন (৩—২৬)। কারণ জ্ঞানীরা যাহা করেন, সাধারণেও তাহাই করে (৩—২১)। এজন্য, জ্ঞানীগণের উচিত যে সতত কর্ম্মেলিপ্ত থাকিয়া জনসাধারণকেও কর্ম্মে নিযুক্ত রাখেন (৩—২৬)। দেখ, আমার কোন স্বার্থ নাই, তথাপি আমি দেশ-হিতার্থে সতত কর্ম্ম করিতেছি. আমি কর্ম্ম না করিলে, আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপর সকলেও কর্ম্মত্যাগ করিবে। তাহাতে মনুষ্য-সমাজ উৎপন্ন হইবে, দেশ অধঃপাতে যাইবে (৩—২৩।২৪) দেশোপকারই আসল কথা। দেশোপকারার্থ জ্ঞানীগণ সতত কর্ম্ম করিবেন (৩—২৫)। তবে সকল কর্ম্মকরারই উৎকৃষ্ট কৌশল আছে, প্রণালী আছে। তাহাকেই কর্ম্ম-যোগ বলে (২—৫০)। তদনুসারে কর্ম্ম কর, দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, বিমল আনন্দের উদয় হইবে। কৃতকার্য্যও হইবে, মুক্তিলাভও করিতে পারিবে।

৪। কাম্যকর্ম্ম—অবশ্য ত্যাগ করিবে। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য তোমার স্বার্থ-সাধন, যশ-উপার্জ্জন, নিজের সুখভোগ বা বিলাস সম্ভোগ, তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। কুকর্ম্ম কাম্য কর্ম্মের অন্তর্গত। কারণ লোকে নিজের সুখের লালসায় কুকর্ম্ম করে। স্বার্থ সাধনের জন্য যে বাসনা, তাহাই দুঃখদায়ক। দেশহিতার্থে কর্ম্ম করিবার যে বাসনা, তাহা কেবলই আনন্দদায়ক।

৫। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য করিবে। তাহা করাই ধর্ম্ম, না করাই অধর্ম্ম। যাহা করা কর্ত্তব্য বুঝিবে, তাহা কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবশ্য করিবে (১৮—৯)। সকল কর্ত্তব্য অতি পবিত্র। কিন্তু জন-সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য, তাহা পবিত্রতম। অতএব সিদ্ধি বা অসিদ্ধি, নিন্দা বা প্রশংসা, লোভ বা ভয়, সুখ বা দুঃখ, কিছুতেই কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বিরত হইওনা (১৮—৮।১০) কৃতকার্য্য না হইলেও, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে বলিয়া আনন্দিত হইতে পারিবে। যশস্বী হইতে পারিবে। কল্যকার কর্ত্তব্য অদ্যই করিবে, অপরাহ্নের কর্ত্তব্য পূর্ব্বাহ্নেই সুসম্পন্ন করিবে। যখন সকলেই সকল ভুলিয়া কর্ত্তব্য করিবে, তখন সকলের লক্ষ্য এক হইবে, কার্য্য এক হইবে, দেশে একতা ও সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইবে, মহা-মিলনের দিন আসিবে। তখন অসাধ্য সাধিত হইবে, অসম্ভব সম্ভবপর হইবে।

৬। কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যেও আবার অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম আছে এবং কুকর্ম্মের মধ্যেও আবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। (৪—১৮) তাহা নির্ণয় করিতে অতি বুদ্ধিমানেরও ভুল হয় (৪—১৬)। অতএব সে সকল জানিয়া কার্য্য করিবে। যেমন কাহারও হিংসা করা কুকর্ম্ম। কিন্তু যুদ্ধে হিংসা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তেমনি, অপরের উপকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু যদি তাহা করিলে অন্যায়ের প্রশ্রয় প্রদত্ত হয়, দেশের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা করা উচিত নহে। তাহা অকর্ম্ম। তথাপি যদি সেই কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে কুকর্ম্ম হয়। স্বদেশ-সেবা-ব্রত সর্ব্বোচ্চ ও

সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহার নীচে অন্য সকল কর্ত্তব্য। এই মহৎ কর্ত্তব্য-পালন-পথে যদি অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অন্তরায় হয়, তবে তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে। আবার যাহার মন ভোগৈশ্বর্য্যে মত্ত, সে কখনও কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না (২—৪৪) যাহাতে তাহার স্বার্থ সাধিত হয়, সে কেবল তাহাই বুঝে, তাহাই করে।

৭। নিষ্কাম ভাবে সতত কর্ম্ম করিবে (৩—১৯)। (১) তুমি যে কার্য্য করিবে, তাহার ফল তুমিই ভোগ করিবে, কদাচ এই রূপ কামনা করিবে না। (২) এইরূপ কামনা তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ যেন না হয়। (৩) এইরূপ কামনা কার্য্য করিবার সময় তোমার মনে যেন কদাচ উদিত না হয় *।

কেন নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবে?

(১) যিনি নিষ্কাম, একমাত্র তিনিই তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে পারেন। স্বার্থপর ব্যক্তির সাধ্য নাই যে তাহা করে। (২) নিষ্কাম না হইলে নিঃস্বার্থপর হওয়া যায় না। তাহা না হইলে বহু ব্যক্তি ও বহুজাতি একতায় আবদ্ধ হইতে পারে না, কোন মহৎ কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে পারেনা। (৩) নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষ্য মাত্র একটী—কি উপায়ে দেশহিত সাধিত হইবে। আর কাম্য কর্ম্মের লক্ষ্য অনন্ত (২—৪১) কারণ কামনা অনন্ত, ভোগ্য বস্তুও অনন্ত। (৪) সকাম কর্ম্মে কামানানুরূপ ফল উৎপন্ন না হইলে, আর সেই ফল ভোগ করিতে না পারিলে দুঃখ হইবেই হইবে। কিন্তু নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিলে, সেরূপ দুঃখের সম্ভাবনা নাই। অকৃতকার্য্য হইলেও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলে বলিয়া বিমল আনন্দ পাইবে। (৫) তুমি যদি নিষ্কাম কর্ম্মী না হও, তাহা হইলে কাহারও উপকার করিলে প্রত্যুপকারে প্রত্যাশা করিবে। যদি তাহা না পাও, তাহা হইলে একজনের কৃতঘ্নতায় আর সকলের উপকার করিতে বিরত হইবে। সমাজস্থিতির মূলই যে পরোপকার, তাহার অভাব হইলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। (৬) নিষ্কাম কর্ম্মীর বুদ্ধি † সতত শুদ্ধ। তিনি কিছুই নিজের স্বার্থের জন্য করেন না, সকলই সকলের জন্য, দেশের জন্য করেন। সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যেই পাপ হয় না (১৮—১৭)। (৮) নিষ্কাম কার্য্য কখনও বিফল হয় না (২—৪০)। নিষ্কাম ভাবে দেশহিতার্থে একবার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে কর্ম্মের আর শেষ হয় না। তাহাতে যে বিশুদ্ধ আনন্দের উদয় হয়, তাহা একের পর অন্যটী, এইরূপে আজীবন নিত্য নূতন দেশহিতকর কার্য্য করিতে উৎসাহিত করে। যদিও তুমি কোন কারণে তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে না পার, তাহা হইলেও তোমার পশ্চাতে যাহারা আসিতেছে, তাহারা তোমার নিষ্কাম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, তোমার ন্যায় নিষ্কাম ভাবে দেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইবে। যুগের পর যুগ, বংশের পর বংশ তোমার অসম্পন্ন কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। একবার নিজ জীবনে এই নিষ্কাম দেশ-সেবা-ব্রত আরম্ভ করিয়া দাও, দেখিবে, তাহার কি আশ্চর্য্য ও অবিনাশী পরিণাম হয়। এক দিকে তাহা তোমার হৃদয় মন উদার ও উন্নত করিবে, অন্য দিকে

* বুদ্ধ দেব নিষ্কাম কর্ম্ম প্রধান ধর্ম্ম প্রচার করেন। চারুচন্দ্র বসুর অশোক, উপক্রমণিকা পৃঃ ১।
† বুদ্ধি—অভিপ্রায়—motive.

তোমার নিষ্কাম কার্য্য লোকসমাজে এমন প্রভাব বিস্তার করিবে যে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। আবার নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিলে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে (২—৪০)। যে নিজের সুখ দুঃখ, লাভালাভ, সমুদয়ই দেশের চরণে উৎসর্গ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মী হইয়াছে, তাহার আর আছে কি, যাহার ক্ষতি বৃদ্ধিতে ভীত হইবে? (৮) আবার নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করাই কৃতকার্য্যতার মূল। যদি ভাব, তোমার কর্ম্মের ফল তুমি ভোগ করিবে, তাহা হইলে সেই ফলভোগের লালসা, কিরূপে কোন্ সময়ে সেই ফল ভোগ করিতে পারিবে, কি উপায়ে অধিকাংশ ফলই তুমি প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি বহু চিন্তা, আবার কখনও যশের লালসা, কখনও ধনের বাসনা, কার্য্য করিবার সময়েই তোমার মনকে বিচলিত করিবে। কিছুতেই সেই কার্য্যে তোমার একাগ্রতা জন্মিবে না, কৃতকার্য্যও হইতে পারিবে না। আর যদি তোমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগে তোমার বাসনা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল চিন্তার একটীও তোমার মনে উদিত হইবে না। কিরূপে সেই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইবে, কেবল তাহারই একটী মাত্র চিন্তা অহরহ তোমার মনে জাগরূক থাকিবে। সুতরাং তুমি একাগ্র চিত্তে মন প্রাণ দিয়া ঐ কার্য্যটী করিতে সমর্থ হইবে। কাজেই কৃত-কার্য্যও হইতে পারিবে। (৯) দশজনে মিলিয়া মিশিয়া যে মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা করার সময় প্রত্যেকেই যদি ভাবে যে সেই কার্য্যের ফল সেই একা উপভোগ করিবে, তাহা হইলে প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইবে, একজনের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, সকলই পরস্পরের সহিত বিরোধ থাকিবে; কেহই কার্য্যটা সুসম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে সকলেই যদি নিষ্কাম ভাবে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেহই নিজের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কাজেই কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ উপস্থিত হয় না। সকলেই মন প্রাণ দিয়া সেই কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে। যুদ্ধ করিবার সময় সৈনিকগণ যদি ভাবে যে তাহাদের যুদ্ধজয়ের ফল তাহারাই ভোগ করিবে, তাহা হইলে তাহারা জয়লাভ করা অপেক্ষা, প্রাণরক্ষা করিতেই ব্যস্ত হয়। প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হইলে কি কখনও যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়? যে সৈনিকেরা তাহাদের পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে চায় না, যুদ্ধের সময় সেই ফলভোগের বাসনা যাহাদের মনে একবারও উদিত হয় না, একমাত্র তাহারাই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে পারে এবং তাহারাই কৃতকার্য্য হয়। (১০) কর্ম্ম করা বা না করা তোমার ইচ্ছাধীন, কিন্তু কর্ম্মের ফল তোমার ইচ্ছাধীন নহে। তোমার সহস্র চেষ্টা সত্বেও তোমার বা তোমার সহকারীর সামান্য ত্রুটীতে সকলই পণ্ড হইতে পারে। ঝটিকা, বৃষ্টি, বর্ষা, অগ্নি প্রভৃতি দৈব কারণেও তোমার কার্য্য নষ্ট হইতে পারে। ফল যখন অনিশ্চিত, তখন কর্ম্মের ফল তুমিই ভোগ করিবে, এইরূপ কামনা যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ না হয়, এইরূপ কামনা যেন কর্ম্ম করিবার সময় তোমার মনে উদিত না হয় (২—৪৭)*। (১১) নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে কাহারও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই (২—৪০)। কারণ

* সহকারীর সামান্য ত্রুটীতে সমুদয় কর্ম্ম নষ্ট হয়। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই, ওয়াটালু যুদ্ধের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় সেনাপতি নে কর্ত্তৃক কোয়াটার ব্রাস নগরী অধিকার না করা এবং তাহা অধিকার করিয়া যে বসিয়া

তোমার নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যেমন অপর সকল ভোগ করিবে, তেমনি অপরের নিষ্কাম কর্ম্মের ফল সেই কর্ম্মকর্ত্তা ভোগ না করিলেও, তুমি এবং সাধারণে তাহা ভোগ করিতে পারিবে। নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর, যদি সেই কার্য্যের ফল অযাচিতরূপে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহা সাধারণের সহিত ভোগ করিতে পারিবে *। (১২) অভ্যাস যোগ অপেক্ষা জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান-যোগ অপেক্ষা ধ্যান-যোগ শ্রেষ্ঠ। ধ্যান-যোগ অপেক্ষা নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মফলে লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মনের চাঞ্চল্য যায়, শান্তিলাভ হয় (১২—১২)। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মকরার তুলনা নাই। যিনি নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করেন, তিনি এত উন্নত, এমন মহান্ যে, সেই অসামান্য পুরুষকে কেহই পরাজিত করিতে পারে না। (১৩) যদিও বেদ স্বর্গ সুখ কামনায় যাগ যজ্ঞ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তুমি তাহাতে প্রলুব্ধ হইও না (২—৪২ লাং ৪৫।৯-২১)। স্বর্গের দেব-গণকে আরাধনা করিলে দেবগণকেই প্রাপ্ত হইবে, ঈশ্বরকে নহে (৯—২৫)। তাহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। ঈশ্বরই সকলের লক্ষ্য। অতএব তুমি, কি এই যুদ্ধ বা অন্য কর্ম্ম, সকলই নিষ্কাম ভাবে করিবে। জ্ঞানীগণ কখনও স্বীয় কর্ম্মফল ভোগে বাসনা করেন না (২—৫১)।

৮। কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে—(৩—৩০)। ঈশ্বর সর্ব্বসাধারণে বর্ত্তমান (৬—৩১)। সর্ব্ব সাধারণই ঈশ্বর। যে কর্ম্মের ফল নিজে উপভোগ না করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপভোগার্থ প্রদান করা হয়, তাহাই ঈশ্বরে অর্পিত হয়। তবেই তুমি তোমার সুখ সুবিধার জন্য লালায়িত হইও না, অপর সকলের—সমগ্র দেশের সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত হও। তেমনি অপর সকলেও যেন নিজ নিজ সুখ সুবিধা করিতে বাসনা না করে, কিন্তু অপর সকলের—সমুদয় দেশের সুখ সুবিধা করিতে লালায়িত হয়। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করাকেই নিষ্কাম ভাবে বা নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করা বলে এবং এইরূপ কর্ম্মের ফল ঈশ্বরে বা জনসাধারণে অর্পণ করা বলে। অতএব জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিও না, অবহেলা করিও না, তাহাদের উন্নতির জন্য রাত্রি দিন নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর। তাহাদের দিয়াই দেশ, তাহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। কতিপয়ের উন্নতিতে কখনও দেশ উন্নত হয় না।

৯। অহং-নাশ করিবে (১৬—২৪ লাং ১৮)। নতুবা নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা অসম্ভব। তোমার অস্তিত্ব ও স্বার্থ সর্ব্ব-সাধারণের অস্তিত্বে ও স্বার্থে ডুবাইয়া দিবে। সতত মনে রাখিবে, তুমিও তোমার জন্য নহ; তুমিও সকলের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য †। (২) কোন কর্ম্মই অহঙ্কার বুদ্ধিতে করিবে না, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে করিবে। অহঙ্কার-বুদ্ধি কি?

নেপোলিয়নকে সংবাদ দেয়া। দৈবকারণে সকলেই নষ্ট হইবার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, নেপোলিয়নের রুষ অভিযান ও নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই তুষার পতন ও তজ্জন্য তাঁহার বিপুল সৈন্যক্ষয়। মৎপ্রণীত বীর কেশরী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দ্রষ্টব্য।

* কৃষ্ণ অর্জ্জনকে নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়ার পরে ভারত ভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (২—৩৭)। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বিষয় ভোগ করিতে আদেশ করিলেন (২—৬৪)) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ীর পরে রাজা যুধিষ্ঠির বনগমনে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাজ্য ভোগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

† অহং-নাশ = Selfefacement.

আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি কর্ম্মকর্ত্তা, আমি একজন। মনের এই যে বিকার, তাহাই অহঙ্কার-বুদ্ধি। যে কার্য্য অহঙ্কার-বুদ্ধিতে করা হয়, তাহার মূলে স্বার্থ। অহঙ্কার বুদ্ধিতে দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, কর্ম্মকর্ত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, যশ উপার্জ্জন বা অন্য স্বার্থ সাধন। (৩) অহঙ্কারী অপরের সম্মান করেনা, অপরের মতের সমাদর করিতে জানে না, অন্যের নিকট হইতে কিছু শিখিতেও পারে না। সুতরাং দশজনের সহিত মিলিত হইয়া কোন মহৎ কার্য্যও করিতে পারে না। আবার সকলই অহঙ্কারীকে ঘৃণা করে, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চায়। (৪) সমস্ত কার্য্যই তুমি করিবে, কিন্তু মনে এইরূপ ভাবকে কদাচ স্থান দিওনা যে তুমিই কর্ম্মকর্ত্তা, যদি তাহা ভাব, তাহা হইলে মনে অহঙ্কারের উদয় হইবে। অহঙ্কারের উদয় হইলেই জ্ঞান নষ্ট হইবে, জ্ঞান নষ্ট হইলে স্মৃতি ভ্রংস হইবে, স্মৃতি ভ্রংস হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মও পণ্ড হইবে। (৫) যদি তুমি ভাব, তুমিই কর্ম্মকর্ত্তা, তাহা হইলে অন্য কর্ম্মকর্ত্তারা, তোমার সহকারীরা ভাবিবে, তবে কি তাহারা শয়ন করিয়া কাল কাটায়? তখনই তাহাদের সহিত তোমার কলহ উপস্থিত হইবে। যে কার্য্যের সফলতা দশ-জনের সমবেত চেষ্টার উপর নির্ভর করে, তাহা পণ্ড হইবে। যুদ্ধের সময় সেনাপতিগণ বা সৈনিকগণ, প্রত্যেকেই যদি ভাবে যে সে-ই কর্ম্মকর্ত্তা, তাহা হইলে কিছুতেই সকলে একতায় কর্ম্ম করিতে পারে না, যুদ্ধেও জয়-লাভ করিতে পারে না। (৬) প্রকৃতিই লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে (৩—২৭)। তবে তুমি যে কর্ম্মকর্ত্তা, ইহা ভাবিবে কেন? (৭) আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি একজন, এই আমি আমি উদ্ধত ভাব সকল অনিষ্টের মূল। দেখ, তোমাপেক্ষাও কত অধিক ধনী, মানী, জ্ঞানী এ জগতে বর্ত্তমান। তবে অহঙ্কার করিবার কি আছে? ভাব, এই বিশাল বিশ্বের তুলনায় তুমি মত নগণ্য! (৮) আমার পুত্র, আমার বিত্ত, আমার সংসার—এই আমার আমার ভাব সঙ্কীর্ণতার মূল, বিবাদ বিসম্বাদের কারণ। অপরের পুত্র ও বিত্তকেও তোমার পুত্র ও বিত্তের ন্যায় মনে করিবে, সমুদয় বসুধাকে আপন ও আত্মীয় করিয়া তুলিবে। তবেত অপরের পুত্রের, অপরের বিত্তের ক্ষতি করিয়া তোমার পুত্রের, তোমার বিত্তের উপকার করিতে বিরত হইবে। (৯) অহঙ্কারীর মন অতি নীচ ও নিকৃষ্ট, তাহার আত্মোন্নতি সুদূরপরাহত। তাহার স্বদেশ-সেবা বহ্বাড়ম্বর মাত্র। যিনি অহং-নাশ করিতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই নিষ্কাম ভাবে স্বদেশ-সেবা করিতে সমর্থ। (১০) মনে রাখিবে, 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।

১০। বুদ্ধি—সতত শুদ্ধ রাখিবে* তাহা হইলে কোন কার্য্যেই অধর্ম্ম হইবে না (১৮—১৭)। তুমি যদি আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধকর, দেশোপকারার্থ যুদ্ধ কর, কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া যুদ্ধ কর, তাহা হইলে অধর্ম্ম হইবে না। যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ, তাহার নিকট লাভালাভ, জয়পরাজয়, সুখ দুঃখ, সকলই সমান। কারণ সে স্বার্থ সাধনের জন্য কোন কর্ম্ম করেনা, এজন্য অধর্ম্মেও পতিত হয় না (২—৩৮)।

* বুদ্ধি—অভিপ্রায় ॥ motive.

১১। কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইওনা— ফলভোগে কামনা করিয়া যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে আবদ্ধ হইতে হয় (৫—১২)। কারণ কাম্যবস্তু অনন্ত। একটী কাম্যবস্তু উপভোগের নিমিত্ত কর্ম্ম করার পর, আর একটী কাম্যবস্তুর ও ভোগের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে আসক্তি জন্মে। মনের এই অবস্থাকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বলে। অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি কর্ম্ম-বন্ধনের সহায় (১৬— ৪।৫)। তেমনি যে কর্ম্ম ঈশ্বর উদ্দেশে—জনসাধারণের হিতার্থে করা হয়, তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না (৩—৯।৩১)। যিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত আপনাকে একীভূত করিয়া লইয়াছেন, তিনি কখনও কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হন না (৫—৭)। কারণ তিনি যাহা করেন, নিষ্কাম ভাবে করেন, দেশহিতার্থে করেন। তাহাতে মন ক্রমেই উদার ও উন্নত হয়।

১২। অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিবে—(২—৪৮) কার্য্যসিদ্ধি হউক বা না হউক, সম্পদ আসুক বা যাক, আত্মীয় স্বজন থাকুক বা মহাপ্রস্থান করুক, এই দ্বিবিধ অবস্থাই যাঁহার নিকট সমান, তিনিই অনাসক্ত। রূপ রসাদি কোন বিষয়ই যেন তোমাকে পরাধীন না করে। তুমি সতত স্বাধীন থাকিবে, তাহাদের প্রভু থাকিবে। আসক্তি জন্মিলে স্বাধীনতা যায়, স্বাধীন ভাবে ভাবিবার ক্ষমতা বিনষ্ট হয়, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি নষ্ট হয়। মন স্বাধীন না হইলে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা যায় না, কর্ত্তব্য কার্য্যও নির্ণয় করা যায় না। যে দাস, তাহার নিকট কি প্রত্যাশা কর? আসক্তি থাকিলেই সকাম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে। আসক্তিই নিষ্কাম ধর্ম্মের অন্তরায়। অতএব পদ্মপত্র যেমন জলের মধ্যে থাকিয়াও আর্দ্র হয় না, তুমিও তেমনি রূপ রসাদি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ে জড়িত হইও না, স্বাধীনতা হারাইও না *

১৩। লক্ষ্যস্থির করিবে। পরে কোন্ কোন্ উপায় দ্বারা সেই লক্ষ্যলাভ হয়, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করিবে। শেষে স্থান কাল পাত্র বিবেচন করিয়া কার্য্য করিবে। তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

১৪। আত্মবিশ্বাস কর। (৬—৫)। আত্ম শক্তিতে কদাচ সন্দিহান হইওনা। তোমার মধ্যে ঈশ্বর বর্ত্তমান, তোমার মধ্যে অসীম শক্তির নিদান, তবে আর চিন্তা কি? এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্য করিবে। সংশয়ান্বিত ও অস্থির-চিত্ত ব্যক্তি কোন দিন কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। কদাচ আত্মাকে অবসন্ন করিও না (৬—৫), কদাচ দুর্ব্বলতার অধীন হইওনা। যে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে কখনও মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। যে কর্ম্ম দেখিয়া, প্রতিপক্ষ দেখিয়া ভয় পায়, সে কোন দিন কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। ভয়ই মানুষের সর্ব্ব প্রকার

---

* অনাসক্তের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথামৃতে আছে। উন্নতিকাম প্রত্যেকেরই সেই অমৃতোপম বইগুলি পড়া উচিত। তাহাতে আছে, এক চাষা এক ছেলে মরেছিল। সে কাঁদল না। তাহার স্ত্রী বলে, "হায়, তুমি একটু কাঁদলে না?" "চাষা উত্তর করিল "কাল রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছিলাম "যে রাজা হয়েছি, আর সাত বেটার বাপ হইয়েছি। এখন ভাবছি, সেই রাজা আর সেই সাত ছেলের জন্য কাঁদব, কি তোমার একটা ছেলের জন্য কাঁদব?"

অবনতির মূল। মনুষ্যের অসাধ্য কোন্ কর্ম্ম আছে? তোমার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, এই রূপ দৃঢ় আত্ম বিশ্বাস লইয়া নির্ভয়ে ও প্রাণপণে কার্য্য কর, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। মনে রাখিবে, যাহা একদিন একজনে করিয়াছে, তাহা অপরেও অতঃপর নিশ্চয়ই করিতে পারিবে।

১৫। আত্মনির্ভর কর।—আত্মদ্বারায় আত্মাকে উদ্ধার কর (৬—৫)। তোমার চেষ্টা দ্বারা, তোমার সাধনা দ্বারা তোমাকে উন্নত কর। কদাচ কাহারও মুখাপেক্ষী হইও না। কদাচ কাহারও সাহায্যে তোমার কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহিও না। (৪—২০)। পরের উপর নির্ভর করিলে, তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে, ইহা কখনও ভাবিওনা। যাহারা আত্মচেষ্টায়, স্বীয় ক্ষমতায় অভীষ্ট না পায়, তাহারা কদাচ পরের সাহায্যে পরের কৃপায় তাহা পায় না। ঈশ্বর তাহাদেরই সহায়, যাহারা নিজ চেষ্টায় উন্নত হইতে চায়।

১৬। মনের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায়—সর্ব্বাগ্রে, সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই রক্ষা করিবে। (২—৪৮॥১৮—২৬), যাহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সংলগ্ন হইতেও মনকে বিচলিত করিতে পারে না, তাহারই মন স্থির হইয়াছে (২—৬৮)। মনের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায় ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধি হয় না। মন যদি সুখ দুঃখ প্রভৃতি কোন কারণে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুদ্ধিও চঞ্চল হইয়া উঠে। মনের যে শক্তি দ্বারা আমরা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করি, তাহাই বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি চঞ্চল হইলে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ভুল রূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় না এবং কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যায় না। যাহার মন স্থির নহে, ধীর নহে, তাহার উৎসাহ নাই, অধ্যবসায় নাই। তাহার মনে যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখনই সে তাহা করিয়া বসে। একবার এক কর্ম্মে, অন্যবার অন্য কর্ম্মে হাত দেয় ও সকল কার্য্যেই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করে। এইরূপ মন উশৃঙ্খলতা-জনক। একাগ্রতা দ্বারা এইরূপ চঞ্চল মনকে সংযত করিবে। একাগ্রতাই কার্য্য সিদ্ধির উপায়।

১৭। প্রবল পুরুষকার সহকারে কার্য্য করিবে। ঈশ্বরই মনুষ্যের মধ্যে পুরুষকাররূপে বিরাজ করিতেছেন (৭—৮)। তবে আর চিন্তা কি? প্রবল পুরুষকার ব্যতীত কখনও রিপুগণকে পরাজয় করা যায় না, কখনও কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। জ্ঞান ও চেষ্টা দ্বারা অতি চঞ্চল ও দুর্দ্দমনীয় মনকেও বশীভূত করা যায় (৬—৩৫)। চেষ্টা দ্বারা দুঃখ দূর করা যায়, চেষ্টা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হয় (১৮—৩৬)। সকলের মধ্যেই উন্নতি ও মুক্তির সামর্থ্য আছে, প্রবল পুরুষকার প্রদর্শনের শক্তি আছে। নতুবা যে চরিত্রহীন, সে চিরদিনই চরিত্রহীন থাকিত, যে অধঃপতিত, যে চিরদিনই অধঃপতিত থাকিত। তাহা ত নহে। প্রবল পুরুষকার দ্বারা কতজন উন্নত হইতেছে, আজ যে পতিত, কাল যে উদ্ধার হইতেছে, অসাধ্য সাধন করিতেছে।*

১৮। আত্মোৎসর্গ প্রদান করিবে

* গীতা Predestination বা নিয়ুক্তবাদ-বিরোধী। নিয়ুক্তবাদ স্বীকার করিলে কর্ম্মের প্রাধান্য [illegible] হয়, আচার্য্য নীলকণ্ঠ মজুমদার M.A কৃত গীতারহস্য পৃঃ ৬৪।৬৫।

লোকহিতার্থে, দেশ হিতার্থে সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিবে। মনুষ্য সমাজের কল্যাণার্থে দেশের মঙ্গলার্থে যে ব্যক্তিগত ত্যাগ, তাহা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম (৮—৩)। আত্মোৎসর্গ বিনা কোন মহৎ কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। যে অহং-নাশ করিয়াছে, যে নিষ্কাম হইয়াছে, একমাত্র সে-ই আত্মোৎসর্গ প্রদান করিতে পারে, সকলেই নহে। অতএব চরিত্র-যজ্ঞে যেমন রিপুগণকে আহুতি দিবে, তেমনি দেশ-যজ্ঞে—শুধু রিপু নয়, শুধু ধন নয়, মান নয়—সমুদয়ই আহুতি দিবে, আত্মোৎসর্গ প্রদান করিবে।

১৯। কর্ম্মোন্মাদ্ হইবে। সৎ কর্ম্মে যাহার আনন্দ ও উন্মত্ততা জন্মিয়াছে, সে-ই সিদ্ধিলাভের পথে আসিয়াছে। অতিশয় উৎসাহ, অতিশয় অধ্যবসায় ব্যতীত কেহই কর্ম্মোন্মাদ হইতে পারে না।

২০। সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িওনা। যে ব্যক্তি এক এক সময় এক এক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, পরক্ষণেই তাহা পরিত্যাগ করে, সে কখনও কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। আর যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সহস্র বাধা ও বিঘ্ন সত্বেও তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়েন না, একমাত্র তিনিই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, এক মাত্র তিনিই যশস্বী হন। কার্য্যসিদ্ধিতেই উন্নতি ও কার্য্যের নিষ্ফলতায় অবনতি, ইহা ভুলিওনা।

এই প্রণালীতে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম্মযোগী। এইরূপ উচ্চ; আদর্শ অনুসারে কর্ম্মজীবন গঠন করিতে হইলে জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

ইয়ুরোপীয় মহাসমরে অদৃশ্য হস্ত।

এক প্রাণরূপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, স্রষ্টা, সর্ব্ব-সাক্ষী স্বরূপে জাগ্রত আছেন বলিয়া সৃষ্টির ব্যাপার সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতেছে; ধর্ম্ম-বিশ্বাসীগণ নিজের জীবনে প্রত্যেক জাতির উত্থান, স্থিতি ও পতনে এবং সমগ্রমানবমণ্ডলীর ক্রমবিকাশ মধ্যে তাঁহার মঙ্গলময় অদৃশ্য হস্ত জ্ঞান-চক্ষে দেখিতে পান। তাঁহার অগোচরে বৃক্ষ হইতে একটী পত্রও পতিত হয় না; ক্ষুধার্ত্ত কাকশাবকও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল-কাম হয় না। এই সকল পুরাতন কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অবিশ্বাসী কি বিষয়ের কীট অর্দ্ধ বিশ্বাসীদের, বিশেষতঃ এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞদের, ব্যবহার দেখিয়া অনেক সময়ে ইহার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক হয়। প্রাচীন কালে চার্ব্বাক, এপিকিউরাস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে জড়বাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক দার্শনিক ডারউইন্ প্রভৃতি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ ইতর জীব জন্তুর ব্যবহারকে প্রকৃতির নির্দ্দেশ জ্ঞানে, তাহা মনুষ্যেরও উপযোগী বলিয়া ঐ জড়বাদের সমর্থন করেন। "ক্ষুদ্র মৎস্যকে বৃহৎ মৎস্য; বৃহৎ মৎস্যকে, তিমি মৎস্য ভক্ষণ করিয়া নিজ নিজ শরীর পুষ্টি সাধন করে। তিমিংগিল তিমিকে, এবং তিমিং গিলংগিল, তিমিংগিলকে ভক্ষণ করে। এইরূপ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই জীবন-সংগ্রাম

চলিতেছে। এই সংগ্রামে যে বিজয়ী, সেই প্রকৃতির নিয়ম মতে জীবিত থাকার উপযোগী।" ডারউইনের এই মত ইতর জীব জন্তু সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইলেও তাহা যে সুসভ্য মনুষ্য সমাজের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য, কি আদর্শ নীতি নয়, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কারণ, পাশব বল অপেক্ষা নৈতিক বল, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র এবং দেব-প্রকৃতিই মানব প্রকৃতির বিকাশ-পরিণাম। প্রাচীন ইহুদী পৈগম্বরগণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষবৎ পরমেশ্বরের বিধান দেখিতেন এবং ইহুদীগণ তাঁহাকে রাজাজ্ঞানে আরাধনা করিতেন। হিন্দুগণও তাঁহাকে জগৎপিতা, জগৎপাতা ও জগৎসংহর্ত্তা জ্ঞানে আরাধনা করেন। চাণক্য, মেকিয়াভিল্, বিস্মার্ক প্রভৃতি যে রাজনীতি অনুসরণ করেন, ডারউইনের প্রচারিতজড়বাদপোষক মতে তাহা নির্ব্বাণোন্মুখদীপশিখার ন্যায় বৃদ্ধিপায় এবং সম্প্রতি বিগত মহাসমরে তাহা ক্ষীণপ্রভ ও হীনবল হইয়াছে, শীঘ্রই লোপ পাইবে, এরূপ আশা করা যায়।

স্থূলদর্শী অর্দ্ধবিশ্বাসী লোকেরা মনে করে, "ভগবান্ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার শাসনভার তিনি শয়তানের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টির সর শয়তানের চেলারা ভোগ করে।" কেহ মনে করে, তিনি সৌরজগৎ রূপ "টাওয়ার ক্লকে" (Tower Clock), চাবির দম দিয়া সুদূর বৈকুণ্ঠ ধামে প্রস্থান করত প্রকৃতির সেবা গ্রহণ করিতেছেন; কিম্বা, বিশাল বিশ্বের অসংখ্য সৌরজগতের অন্য কোনও একটীতে ঐরূপ চাবির দম দিতে গিয়াছেন। সূর্য্য "পেণ্ডুলাম" মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি মধ্যে এক দোলন সমাপন করিয়া নরলোকে এক বৎসর এবং ব্রহ্মলোকের ক্রেস্কো-গ্রাফে" Cresco-graph)* $\frac{১}{১০০০০০০০}$ "সেকেণ্ড" জ্ঞাপন করিতেছে, কারণ ব্রহ্মার একদিবসে মনুষ্যের ৪৩২ কোটী বৎসর বা এক কল্প হয়। পুরাতন "বাইবেলে" উল্লেখ আছে, পরমেশ্বর ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পরিশ্রম-বোধ, কি বিশ্রাম নাই, তিনি ক্রিয়াশীল, সর্ব্বত্র, সকল সময়ে বর্ত্তমান সর্ব্বান্তর্যামী; সৃষ্টি শাসন ও পালন কার্য্যে তাহার অন্য কাহারও সাহায্য আবশ্যক করে না; আর, অদূরদর্শী সাধারণ লোকেরা যাহাকে সৃষ্টির সর বলিয়া মনে করে, তাহা "দিল্লির লাড্ডু বৎ একটী নামজাদা চিত্তাকর্ষক কোনও কিছু; "যো'বি খায়া ও'বি ফস্তায়া, যো'বি না খায়া ও'বি ফস্তায়া" নির্ম্মল বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্য-সম্পাদন-জনিত আত্ম প্রাসাদই সৃষ্টির সর।

ইয়ুরোপীয় মহাসমরের ঘটনাবলী ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে যে সকল উপদেশ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই সেই মঙ্গলময় অদৃশ্য হস্তের বর্ত্তমানতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ইয়ুরোপে, বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, কলাবিদ্যা প্রভৃতি ক্রমশঃ বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে ধন-বৃদ্ধি, ও বিলাসিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। বিলাসিতায় ধনস্পৃহা এবং ধনস্পৃহায়, লোভ, জড় বিজ্ঞান

* স্যর জে: সি: বসু, Dsc. F. R. S. মহোদয়ের আবিষ্কৃত যন্ত্র; ইহার দ্বারা উদ্ভিদ শরীর বৃদ্ধি-জ্ঞাপক গতি ১০ কোটী গুণ বৃদ্ধি পায়।

ও কলাবিদ্যার উন্নতি, প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্তাধীন করিয়া মনুষ্যের কার্য্যে নিযুক্ত করায়, ক্ষমতাবৃদ্ধি ও পুরুষকার-জনিত অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইয়া, সভ্যতাভিমানী জাতিগণ মধ্যে পাপবীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিষবৃক্ষ আকারে পরিণত হইয়াছে।

মনুষ্য মধ্যে পশু, দৈত্য ও দেব প্রকৃতি আছে। পঙ্কে পঙ্কোৎপত্তিবৎ, পশু ও দৈত্য প্রকৃতির মৃত শরীরের গলিতপদার্থরূপ সার মধ্যে দেবপ্রকৃতি বিকাশ পায়। পাপ-বীজোৎপন্ন বিষবৃক্ষের অনিবার্য্য পরিণাম ধ্বংস। যখন লোকে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয় এবং ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, তখন তিনি "দর্পহারী ভগবান্" রূপে সাম্রাজ্য সকল ও নরপতিগণের পতন সাধন করিয়া মনুষ্য-সমাজে নূতন শাসন-প্রণালীর অবতারণা করেন; ইহাকেই অব্দ বা যুগ বলে।

পৌরাণিক দেবাসুরের যুদ্ধ ও দেবী যুদ্ধ, এবং মহাকাব্য-বর্ণিত লঙ্কা-সমর, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, ট্রোজান্ সমর প্রভৃতি হইতে "ধর্ম্মের জয় ও পাপের ক্ষয়" এই উপদেশটী স্পষ্ট বুঝা যায়। পৃথিবীর আধুনিক ঐতিহাসিক ঘটনামূলক মহা সমর সকলের বিষয় চিন্তা করিলেও ঐরূপ উপদেশ পাওয়া যায়।

যখন প্রাচীন রোমানদের মধ্যে বিলাসিতা, নিষ্ঠুরতা, অহঙ্কার প্রভৃতি জনিত নানা পাপের মাত্রা পূর্ণ হইল, তখন অসভ্য "হান" (Hun) ও "ভ্যাণ্ডাল" (Vandal)দের হস্তে তাহাদের ধ্বংস হইল। রোমের পোপ "স্বর্গের দ্বারের চাবিওয়ালা" দৌবারিক হইয়াও অবশেষে পৃথিবী-তলে ঈশ্বরের প্রতিনিধির ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন-প্রয়াসী হন। প্রায়স মত্ত ইয়ুরোপীয় সম্রাট, নৃপতি ও মুকুটধারী রাজন্যবর্গ, তাঁহার শিষ্য, তাঁহার মঠবাসী সন্ন্যাসিগণ ও মঠবাসিনী সন্ন্যাসিদের পাপস্রোতে ইয়ুরোপ প্লাবিত; কিন্তু সামান্য একজন সন্ন্যাসী, মার্টিন লুথারের হস্তে তাঁহার অধঃপতন।* ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনের মুষ্টিমেয় সেনা হস্তে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান বোনাপার্টির পরাজয়। পৃথিবীর এক সপ্তাংশব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং শান্তি যাঁহার করতলে বলিয়া গর্ব্ব, সেই সকল রুসিয়ার জারকে প্রথমে ক্ষুদ্র জাপান-বাসীদের হস্তে পরাজয় ও পরে অত্যাচার-গ্রস্ত প্রজার হস্তে সবংশে নিধন পাইতে হইল! জার্ম্মান্ কৈসারের (Kaiser) মিত্র শক্তির হস্তে অপরিমিত গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। যেমন বিশাল বনস্পতির পতনে আশ্রিত লতাগুল্ম, শকুনী, বাজ ও চিল প্রভৃতি পক্ষীর কুলায় এবং নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরু সকল ভূতলশায়ী হয়, সেইরূপ, জার্ম্মান্ সম্রাটের পতনে, তাঁহার কুমন্ত্রী পারিষদ ও পাপাচারী সেনাপতিগণ, আশ্রিত রাজন্যবর্গ, এবং প্রতিবেশী অষ্ট্রিয়ান্ সম্রাট ও বুল-গেরিয়ার রাজা এবং মিত্রতাবদ্ধ তুরুস্কের সুলতান, সকলেরই পতন সাধিত হইল। এই সকল দ্বারা কি দর্পহারী ভগবানের লীলা বুঝা যায় না?

পুরাণে কথিত আছে, বিশ্বামিত্র ঋষিও কতকগুলি পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এমন কি, অনুরূপ যুগ্ম পদার্থের মধ্যে তাঁহার সৃষ্টটাই উত্তম এবং ত্রিশঙ্কুরাজার জন্য তিনি এক নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করেন। জার্ম্মান্‌গণ ব্যবহারিক কেমিষ্ট্রির সাহায্যে অনেকগুলি নকল সৃষ্টির অবতারণা করায় কৈসার অহঙ্কারে এতই স্ফীত হন যে, তিনি নিজকে "লোকোত্তর" মানুষ (Superman) এবং জার্ম্মান নিরীশ্বর সভ্যতাকে "কাল্টার"

(Culteur) বা উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না; জার্ম্মানেরা যেন ত্রিদিববাসী এবং তিনি তাহাদের শচীপতি ইন্দ্র। তাঁহার এই অপরিমিত ধৃষ্টতার কথা চিন্তা করিলে, প্রাচীন বাইবেলোক্ত ব্যাবেলের (Babel) কথা মনে উদয় হয়। প্রাচীন "কণ্ডিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী মহানগরী "ব্যাবিলন", আধুনিক ফরাসী রাজ্যের রাজধানী প্যারী নগরী বৎ, বিলাসব্যসন, বিজ্ঞান, ও সমৃদ্ধির প্রিয় আবাস-ভূমি ছিল। নিরীশ্বর নাগরিকেরা এতই গর্ব্বিত হয় যে, তাহারা সশরীরে স্বর্গে যাত্রার্থে জন্ম অভ্রভেদী উচ্চ একটী সিঁড়িপথ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাহাদের ঐ বাতুল অনুষ্ঠান কিছু অগ্রসর হইলেই, "জিহোবা (Jehova) তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে ভাষার এরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিয়া দেন যে, তাহাতে কেহই কাহারও কথা বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়। জার্ম্মানির কৈসারের, বিজ্ঞান-সিঁড়িপথেও জেপেলিন বিমানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রত্বের সনদ আনয়ন জন্য সশরীরে ব্রহ্মলোকে যাওয়ার প্রয়াসও তদ্রূপ বিফল হইয়াছে। বিকলপক্ষ উড়োকলের আরোহী-বৎ তাঁহাকে "পুনর্মূষিকো ভব" বৎ ভূতলে পতিত হইতে হইয়াছে। পিপিলিকার মৃত্যু নিকট-বর্ত্তী হইলে তাহার পক্ষোদ্গম হয়। সে গর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়া কিয়ৎকাল বায়ু-মণ্ডলের নিম্নস্তর মধ্যে উড্ডীন হইয়া নিজকে গগনবিহারী পক্ষীরাজ গড়ুরের প্রতিদ্বন্দী মনে করে এবং ইতিমধ্যে হঠাৎ ছিন্নপক্ষ হইয়া ভূতলে "পপাতচ মমারচ" অভিনয় করে। কৈসারের দশাও কি তদ্রূপ নয়?

অজ্ঞাত অরণ্যবাস সময়ে সায়াহ্নে নিস্তব্ধ সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যে দুঃখকাহিনীর আলাপন হইত, এখন নির্জ্জন বেণ্টিঙ্ক ভবনে সন্ধ্যার পর চা-পান সময়ে "জারিনার" সঙ্গেও কৈসারের তদ্রূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে "জারিণা ও জারের উপমা দেওয়ায় শ্রুতিকটু দোষ ঘটে; তজ্জন্য মন্দোদরী ও রাবণের সঙ্গে নির্বাসিত জার্ম্মান-দম্পতীর তুলনা করা যাইতে পারে। সম্ভবত "জারিণা" "কার্টেন লেক্চার" স্বরূপে, রাবণের প্রতি রাণী মন্দোদরীর উক্তির অনুকরণে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন,—

"নিজকর্ম্ম দোষে, নাথ, মজালে জার্ম্মন্‌জাতি,
মজিলে আপনি, তব সহ মিত্রত্রয় আর।"

মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মানিতে যে এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের অভ্যুত্থান হয়, তাঁহাদের মতে, জাতীয় স্বার্থোন্নতি জন্য বিবেকবর্জ্জন, সত্যগোপন ও চম্বুক! চাতুর্য্য-আবশ্যকীয় গুণ, এবং যুদ্ধ, জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যোন্নতির আবশ্যকীয় ব্যায়াম বলিয়া গণ্য হইত। মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য ভাষার আবশ্যক; কিন্তু, ইহাদের মতে যেন মনের ভাব গোপন করার জন্যই ভাষার আবশ্যকতা। বস্তুত এই ভাষাদ্বারা ভাব গোপন প্রথাটী পৃথিবীর অনেক স্থানে রাজ-নীতিজ্ঞমণ্ডলী মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে, চতুর প্রিন্স বিস্মার্ক যাহা করিবেন, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিতেন, কারণ তিনি জানিতেন, তাঁহার বিপক্ষেরা, তাঁহার প্রকাশ্য উক্তির বিপরীত অর্থ করিয়া অসতর্ক থাকিবে এবং তিনি ঐ সুযোগে নিজের স্বার্থ সাধন করিতে পারিবেন। আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ও অন্যান্য কয়েকটী দেশ ব্যতীত এই দূষিত প্রথা সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

সুতরাং রাজনীতিজ্ঞমণ্ডলী-সভায় ঈশ্বরের নাম "দোকান মে মহাভারত?" * "বং হইবে, তাহা বিচিত্র কি? এস্থলে বলা আবশ্যক যে গ্লাডষ্টোন্, ব্রাইট্, কসেট প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই শ্রেণীভুক্ত নন। যাহা হউক, বিপদে, নাস্তিক, আস্তিক, অর্দ্ধনাস্তিক, সকলেই মধুসূদনকে প্রাণের সহিত ডাকে। ৫৭ মাইল দূর হইতে একটী অষ্ট্রিয়ান কামান হইতে প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর যখন বিলাসের আবাসভূমি প্যারী নগরীর উপর গোলা-বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন মিত্রশক্তি মধ্যে পুনর্ব্বার "ত্রাহি মধুসূদন" ধ্বনিত হইতে লাগিল। সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কলাবিদ্যার, মোহিনী মূর্ত্তি হরিণাঙ্গনা রূপসী কুহকিনীবৃন্দের, নরশোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্র সদৃশ নরঘাতক দস্যুর, স্বর্গদ্বারের চাবিওয়ালা রোমের পোপের একদা প্রিয়ভূমি ইটালী রাজ্যে, শত্রুর বিপুল সেনাদল যখন, দুর্নিবার মত্ত হস্তীর পদ্মবনে প্রবেশবৎ, ভীতি বিস্তারে প্রবেশ করিল, তখন "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক উত্থিত হইল। যখন শত্রুসৈন্য প্রবল বেগে প্যারীনগরীর ২০ মাইল পূর্ব্ব দিকে উপস্থিত হইল, তখন, মিত্রশক্তির বিজয়াশা-রবি নিরাশার আবর্ত্তক মেঘে আবৃত হইল এবং "ত্রাহি মধুসূদন" বলিয়া পৃথিবীর সভ্য দেশ সকলের সমবেত প্রার্থনা এক স্বরে স্বর্গদ্বারে উত্থিত হইল। যাহারা সুবর্ণ কি রৌপ্য চামচ মুখে করিয়া পৃথিবীর আলোক দর্শন করিয়াছে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি এযাবৎ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এই দুঃখ পূর্ণ পৃথিবীর কোনও প্রকার আপদ বিপদে পতিত হয় নাই এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের নাম করা দূরে থাকুক, তিনি আছেন কি না, তাহারও তত্ত্ব লওয়ার আবশ্যক জ্ঞান করে নাই তাহারাও এখন সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনার সঙ্গে নিজদের প্রার্থনা মিশাইল। বাস্তবিক, বিপদই মনুষ্যের সম্পদ, কারণ সম্পদে ঈশ্বরবিস্মৃতি জন্মায় এবং বিপদে ঈশ্বর দর্শনলাভ হয়; তজ্জন্য, মহাভারতে এই সম্বন্ধে উপদেশপ্রদ সুন্দর একটী উপাখ্যান আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রাজধানী দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনোদ্যত হন, তখন তিনি, পাণ্ডব পরিবারের সকলকে নিজ নিজ অভীপ্সিত বরপ্রার্থনা করিতে বলায়, কুন্তী বর স্বরূপ বিপদ প্রার্থনা করিলেন। এই অদ্ভুত বর-প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কুন্তী বলিলেন, "হে যাদব, তুমি, আমাদের বিপদের সময়েই দর্শন দিয়াছ; যদি, আমাদের বিপদ না হইত। তাহা হইলে ত তুমি আমাদিগকে দর্শন দিতে না।"

এই সত্যটী যেমন মনুষ্যের ব্যক্তিগত

---

* এরূপ কথিত আছে যে, একদা কাশীধামে কোনও এক স্থানে মহাভারত পাঠ হয়; তাহাতে একটী উপদেশ থাকে যে, গরু কোনও খাদ্য দ্রব্যে মুখ প্রদান করিলে তাহার এক গ্রাস সম্পূর্ণ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে তাড়ান উচিত নয়। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কোন এক মুদী দোকানের একটী বালক ছিল। কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের ষাঁড়ের অভাব নাই। পরদিন একটী ষাঁড় সেই দোকানের নিকট দিয়া যাইতে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত চাউল মধ্যে মুখ প্রবিষ্ট করে। সরল-মতি বালক, পূর্ব্বদিনের উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া ষাঁড়কে বাধা না দিয়া ষাঁড়ের তণ্ডুল গ্রাস গ্রহণের অপেক্ষায় উদাসীন দর্শকের ন্যায় থাকে; ইতিমধ্যে দোকানদার আসিয়া তথায় উপস্থিত হয় এবং বালকের ঐরূপ আচরণ জন্য ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাহার কৈফিয়ৎ তলব করে; বালক তখন মহাভারতের উপদেশের কথা বলায়, দোকানদার সক্রোধে বলে "দোকানমে মহাভারত?"

জীবনে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় জীবনেও তাহা লক্ষিত হয়।

যাহা হউক, মিত্র শক্তির কাতর প্রার্থনায় অবশেষে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উইলসন্, ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ও অন্যান্য জননেতাদের প্রতি "ওয়ারলেস্" (Wireless) বৎ, স্বর্গ" হইতে প্রত্যাদেশ প্রেরিত হইল এবং বিবেক বাণী রূপে তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পাইল। চিত্তের নিষ্কামত্ব অনুসারে কেহ ঐ বাণী "ওয়ারলেস্ টেলিগ্রাফীর", কেহ বা "ওয়ারলেস্ "টেলিফোন" বার্ত্তার ন্যায় যথাক্রমে পাঠ ও শ্রবণ করিলেন। প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ সম্ভবত "ওয়ারলেস্ টেলিফোন্ বার্ত্তায়" "আর্ম্মি কমিশন" (Army commission) পাইয়া সমরে সাজিলেন। ঐ স্বর্গীয় আদেশের মর্ম্ম সম্ভবত এইরূপ হইবে:— "তোমরা আমার রাজভক্ত প্রিয় প্রজা, প্রস্তুত হও, অবিলম্বে মহাসাগর পার হইয়া পৃথিবীর সভ্যতাকে বৈজ্ঞানিক অসভ্যতা-রাক্ষসীর আক্রমণ হইতে রক্ষা কর।"

প্রাচীন ইহুদী "ইজরিলের" বংশধরেরা যেমন "জিহোভার" প্রিয় প্রজা ছিলেন, "মেফ্লাওয়ার" (Mayflower) আরোহী "পিল্‌গ্রিম্ ফাদার্স" (Pilgrim Fathers) যাত্রীগণের বংশধরগণ এবং তাঁহাদের সংসর্গজনিত গুণ প্রাপ্ত অন্যান্য "ইয়াঙ্কিগণ" (yankee) (কারণ, চন্দন-তরুর সহবাসে বাজে বৃক্ষও কি চন্দন বৃক্ষে পরিণত হয় না ?) যে ঈশ্বরের প্রিয় প্রজা হইবেন, তাহা অসম্ভব কি ? স্বাধীনতার যুদ্ধাবসানে, ধর্ম্মপ্রাণ "জেনারাল্ জর্জ্জ ওয়াশিংটন," জয়দাতা জনার্দ্দনকে, পারিষদ্-বেষ্টিত হইয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত ধন্যবাদ দিয়া, সর্ব্ব প্রথম প্রজাতন্ত্র-প্রণালীর রাজকার্য্য পরিচালন আরম্ভ করেন ; সেই প্রথা, এই নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক যুগে এখনও "ওয়াশিংটন" নগরের "হোয়াইট হাউসে" (White House) অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধও রাজা প্রথম চার্লসের সময়ে পুনর্ব্বার আরম্ভ হয় এবং "ওলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell) তাহাতে যে প্রকারে জয়ী হন, তাহা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। ক্রম্‌ওয়েলও রাজকার্য্য পরিচালনে মুসাপৈগম্বরের ন্যায় সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনার ন্যায় ক্রমওয়েলেরও একদল সেনা ছিল ; তাহাদিগকে তিনি নিয়মিত রূপে ঈশ্বর-প্রার্থনা মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তাহারা যুদ্ধে যাত্রা করিবার কালে ঈশ্বরের স্তুতিগান করিতে করিতে যাইত। * "জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ" কথাটীর সার্থকতা, এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা কি প্রতিপন্ন করে না ? দর্পী নেপোলিয়ান্ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন "যে পক্ষে সৈন্যবল অধিক, সেই পক্ষেই ঈশ্বর থাকেন"

* "And then was organized that strange army ,by means of which Oliver achieved all his glories. There were, no doubt, many hypocrities in the ranks; but a spirit of sincere religion pervaded every regiment. Officers and men met regularly in the tents or the barrack-rooms to pray. They neither gambled, drank, nor swore. They often sang hymns as they moved to battle. And when, in the later days, they fought the battles of England on the Continent, the finest troops in Europe were scattered in flight before their terrible charge." Collier'sHistory of the British Empire.

(God is always on the side of the heaviest battalion)। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনও ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নারায়ণী সেনাবল-প্রার্থী হন। নেপোলিয়ান ও দুর্য্যোধনের যে পরিণাম হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে, কার্পাস ও ইক্ষুর আবাদ সকলে, আফ্রিকা হইতে আমদানী হতভাগ্য কাফ্রীক্রীত দাসদের আর্ত্তনাদে ও মৃতদেহে যে বায়ু মণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠ দূষিত হইয়াছিল, তাহাও উত্তর ভাগের অনুষ্ঠিত ক্রীতদাস মুক্তির যুদ্ধানলে বিশোধিত হয়। সুতরাং ঐ যুক্তরাজ্যবাসীগণ যে আধুনিক সভ্যজাতিদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়-প্রজা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? তৎপর প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ দলবলে ফ্রান্স ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা কি, সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন জন্য বিপুল কটক সহ শ্রীরাম-চন্দ্রের লঙ্কা সমরাভিযান বৎ নয়? বন্দুক-ধারী শীকারীগণের আগমনে নরশোণিতলোলুপ শার্দ্দূল যেরূপ দূরবর্ত্তী অরণ্যে বিবরাশ্রয়ান্বেষণে পলায়ন করে, তদ্রূপ, নরপুঙ্গব (=নররৃষ) লোকাত্তর পুরুষ (Superman) হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া "আর্ম্মার্ডকারে" (armoured car) আরোহণ করিয়া "কাউণ্ট্ বেণ্টিঙ্ক্" ভবনাভিমুখে একাকী পলায়ন করিলেন। ইহা কি কালফণীর, বিষ্ণুদূত গড়ুরের ভয়ে ইন্দুরের গর্ত্তে প্রবেশকরণবৎ নয়? কিম্বা দূর হইতে লালপর্গ দেখিয়া, স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া, "হাওয়া গাড়ীতে" চড়িয়া ডাকাইদের দলপতির ফেড়ার-হওন বৎ নয়? কৈসারের পারিষদ-গণও অভিমান "পকেটে" করিয়া, "যঃ পলায়তি স জীবতি", বাক্যের অনুসরণ করিলেন! মিত্রশক্তিগণ এইরূপ দৈব-প্রেরিত সাহায্য পাইয়া দৈববলে বলী হইয়া জয়লাভ করিলেন। জয়দাতা জনার্দ্দনকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য দিন নির্দ্ধারিত হইল, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকেই উৎসবের দেবতাকে বিস্মৃত হইয়া, ঐ উপলক্ষে তাহাদের পূর্ব্বাভ্যস্ত আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। অনেক রোগী, হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের যাদুবৎ ক্রিয়া-বলে, কৃতান্তের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়া, সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্তির পর, হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রতি সন্দিহান হয়। নিদাঘের শুষ্ক তরাগের কর্দ্দম-লুক্কায়িত মৃত-কল্প জলৌকা যেরূপ প্রাবৃটের পর্জ্জন্যের নবাম্ভ সমাগমে পুনঃ সঞ্জীবিত হয়, তদ্রূপ মিত্র শক্তির অনেক নেতৃগণের সার্ব্বভৌম সাশনেচ্ছা (Imperialism) পুনর্জাগ্রত হইত। আয়ার্ল্যাণ্ড, মিসর, ভারত প্রভৃতি হইতে চরমপন্থীদের পূর্ব্ববৎ চীৎকার আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পৌছিল; প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিঃস্বার্থ মীমাংসা ইটালী অগ্রাহ্য করিলেন, সিনেই পর্ব্বতের (Mount Sinai) দশ আজ্ঞাবৎ মাগ্নাই, মহাত্মা উইল্সনের ১৪টী প্রধান লক্ষ্য বিষয়ের কয়েকটী স্বার্থের চাপে ঢাকা পড়িল। তখন যুক্তরাজ্যের "সিনেটার লজ" (Senator Lodge)-প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মনে করিলেন, "পার হইলে লোকে, পাটনীকে যে অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রিয়তমার সহোদর আখ্যায় অভিহিত করে,"ইহাও তদ্রূপ ব্যাপার। মিত্রশক্তিগণ যে উইলসন্‌কে কর্ণধার করিয়া, বিপদ-সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন, এখন যেন সেই উইলসনই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহা-দের ভাগ্যবিধাতা নন। তাঁহারা মিত্রশক্তির হস্তে "বিড়ালের থাবা" (Cat's paw = অন্যের অভীষ্ট-সাধনের যন্ত্র) হইতে ইচ্ছা করেন না; তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্বপ্রচলিত চিরাগত

"মন্‌রো নীতিই" (Monroe Policy) নিরাপদ; তবে পৃথিবীর সভ্যতা ও শান্তির বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আবশ্যক মত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন।" তাই,—

"লিগ্ অব্ নেশান্‌স্ না হ'তে সম্পূর্ণ গঠন,
ক্ষোভে চলি গেলা দেশে, ছাড়ি মন্ত্রণা প্রাঙ্গণ,
মহামতি উইলসন্।"

মনের হর্ষ বিষাদ ও শরীরের সর্দ্দি গর্ম্মি, এই দুইটীর মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দুর্দ্দিনের আশ্রয় মধুসূদনকে, জয়দাতা মঙ্গল-বিধাতা জনার্দ্দনকে স্বার্থান্ধ লোকেরা সুদিনে বিস্মৃত হওয়ায় তাহার শাস্তি স্বরূপ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হয়। এই শাস্তি ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধেও যেরূপ, জাতি বিশেষের পক্ষেও তদ্রূপ। শয়তানের চেলারা, বলে ও কৌশলে যাহা সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহা তাহারা ছলে সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহাদের প্রভু সর্ব্ব-প্রথমে এই নীতি, "ইডেন্" উদ্যানে মানব জাতির আদি জনক জননীর প্রতি প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হয়। যাহা হউক, তাহারা কৃতকার্য্য হইলেও দুষ্কৃতির পরিণাম-ফল কিছুতেই এড়াইতে পারে না। শীঘ্রই হর্ষ বিষাদে, জয় পরাজয়ে পরিণত হয়।

কৈসারের অতিবুদ্ধি পারিষদগণ, রুসিয়ার শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী সৈন্যদের সহিত কপট ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য জার্ম্মান্ সৈন্যদিগকে উপদেশ দেওয়ায়, তাহারা রুসিয়ার সৈন্যদিগকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া বুঝাইল,—

"ভাই সকল, এই যুদ্ধে আমরা গরীব লোক সকল ভাই ভাই মধ্যে পরস্পর মারা-মারি কাটাকাটি করিয়া কেবল নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছি; এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে আমাদের কোনও লাভ নাই; লাভ আছে দেশের ধনী, মানী, ক্ষমতাশালী, বিদ্বান ও হোমড়া চোমড়া অন্যান্য বড়লোকদের; তাহারা নিরাপদে থাকিয়া অর্থ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও উন্নতি লাভ করিতেছে; আমাদের কপালে চিরকালই দুঃখভোগ ও বড়লোকদের দাসত্ব করণ। আমাদের স্ত্রীপুত্রগণ অন্নাভাবে মরিয়া যাইতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা পঙ্গপালের ন্যায় পালে পালে মরিতেছি; যাও, তোমরা বাড়ী চলিয়া যাও, আমরাও বাড়ী চলিয়া যাই; যুদ্ধ করার প্রয়োজন নাই।"

কথাগুলি সত্য এবং তাহা রুসিয়ার সৈন্য-গণের মনের কথাও বটে; তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া দলে দলে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তৎপূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মান্ "মার্ক" (Mark = মুদ্রাবিশেষ) জারিণার অন্তঃপুরে প্রবেশ করত আধিপত্য বিস্তারের জনশ্রুতি দেশমধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। "জার্" অনন্যোপায় হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করি-লেন। "নিহিলিষ্ট" (Nihilist)গণের হর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু, জার্ম্মানেরা বিষাক্ত গ্যাস্ ও দ্রব অগ্নিধারা প্রয়োগে যাহা করিতে পারে নাই, তাহা এখন শয়তানী নীতি অবলম্বনে সহজেই সাধিত হইল। ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের পালের মুক্তদ্বার মেষ খোয়াড়ে প্রবেশবৎ, ক্ষুধার্ত্ত জার্ম্মান্‌গণ খাদ্য সংগ্রহার্থ রাজ্যজয়াভিলাষে প্রবলবেগে রুসিয়াররাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রুসিয়ার জন-নেতৃগণ নিরুপায় হইয়া, পরাজিত পক্ষের ন্যায় সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাও একটা হর্ষবিষাদ; রুসিয়ায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হর্ষের এবং জর্ম্মানির ছলনামূলক পরা-জয় বিষাদের কারণ।

এরূপ জনরব আছে যে, জার্ম্মান্ বৈজ্ঞা-"নিকগণ ইনফ্লুয়েঞ্জা" রোগবীজাণু বৃদ্ধি

করিয়া মিত্রশক্তি সৈন্যগণের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়; কিন্তু ঐ সংক্রামক ব্যাধি পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া যে অসংখ্য লোকক্ষয়ের কারণ হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। কৈসারের মন্ত্রীদের আবিষ্কৃত "ভ্রাতৃভাবস্থাপন ছলনামন্ত্র বিষ" ও "বোল্‌শিভিজম্‌" (Bolshivism) আকারে পৃথিবীর শাসনতন্ত্র-সমাজ-শরীরের (body Politic) "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" ব্যাধিরূপে অল্প সময় মধ্যে সমস্ত পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া মৃত্যু ও অশান্তি বিস্তার করিতেছে।

"দুষ্কার্য্য দুষ্কর্ম্মার উপর প্রত্যাবর্ত্তন করে" (Evil deeds recoil upon the evil-doer), "লোকে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরে"; উর্ণনাভ নিজের বিস্তৃত জালে আবদ্ধ হয়"; "বিষবৃক্ষ রোপণকারীকে বিষফল ভোগ করিতে হয়।" "বোল্‌শিভিজম্‌" বিষ বীজাণু অচিরাৎ জার্ম্মানির "সোশ্যালিষ্ট"দলে অনুকূল অবস্থা পাইয়া অসংখ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল এবং জার্ম্মান্‌ সৈন্যদের ভিতরেও তাহা গোবীজের কৃত্রিম বসন্তের ন্যায় পরিবর্ত্তিত আকারে সংক্রামিত হইল। "কৈসার"ও বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিলেন। ইহা কৈসার ও তাঁহার দলের লোকদের হর্ষবিষাদের কারণ নয় কি?

জার্ম্মানিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল; প্রুসিয়ার রাজবংশের প্রবর্ত্তিত সৈনিকতন্ত্র (Prussian militarism) এতদিন জার্ম্মানির বুকের উপর আরব্যোপন্যাসোক্ত "সিন্ধবাদ" বণিকের (merchant Sindbad) ঘাড়ে চাপা রাক্ষসের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা এখন অপনীত হইল; বেলজিয়াম্‌ ও ফ্রান্সের রণভূমি রঙ্গপ্রাঙ্গণে লোমহর্ষণ নাটকের অভিনয়ের চতুর্থ অধ্যায় শেষ হইল, কৈসারের প্রস্থান ও যবনিকা পতন। এখন পঞ্চম অধ্যায়ের অভিনয় আরম্ভ; শ্রমজীবী ও তাহাদের নেতাগণ অভিনেতা।

ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ অবতারবাদীগণের মতে, পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয়, তখন দুষ্কৃতকর্ম্মাদের বিনাশ সাধন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য ভগবান্‌ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হন। ভবিষ্য পুরাণে কথিত আছে, কলির শেষে যখন পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইবে, তখন কল্কী অবতারের আবির্ভাব হইয়া ধরাতলে প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, কল্কী লোক ক্ষয় ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিবেন, অবশেষে বারিবর্ষণ হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত, ভূপৃষ্ঠ ধৌত, পবিত্র ও স্নিগ্ধ হইবে এবং সত্য যুগ নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে। স্থূলদর্শী উপমাবাক্যচ্ছন্দতা-প্রবণ কোন কোন ব্যক্তির মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে;—"কৈসারই কল্কী অবতার, তাঁহার প্রজ্জ্বলিত বহুলোকক্ষয়কারী পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ড, প্রেসিডেণ্ট উলসন্‌ কর্ত্তৃক আনীত শান্তিবারি দ্বারা ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ এবং "লিগ্‌ অব্‌ নেশান্‌স্‌" ও তদধীন আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার উচ্চতম বিচারালয় স্থাপনাদ্বারা পৃথিবীতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সভ্যতা ও শান্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন ও পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ চিরকালের জন্য নির্ব্বাসন,—এই সকল কি সত্য যুগের লক্ষণ নয়?"

এই মহাসমরকে দীর্ঘকালস্থায়ী একটী প্রবল চক্র বাত্যার (cyclone) সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, অশনিপাত প্রভৃতি দ্বারা দূষিত বায়ুমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের ময়লা দূর হইয়া মনুষ্যের উপকার হয়। মহাসমর দ্বারাও তদ্রূপ রাজনৈতিক ময়লা মনুষ্য-সমাজ হইতে দূর হয়। মনুষ্য ষড়রিপুর

উত্তেজনায় ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতার অপ-ব্যবহার করিয়া পৃথিবীতে অমঙ্গল, অশান্তি, পাপ ইত্যাদি সৃষ্টি করে; ঈশ্বর সেই সকল অমঙ্গল হইতে মঙ্গল, অশান্তি হইতে শান্তি, এবং পাপ হইতে পুণ্য উদ্ভাবিত করেন। এই মহাসমরাবসানে যে নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্বার্থপরতা হইতে পাপ এবং পাপ হইতে ধ্বংস হয়। পরার্থই উত্তম স্বার্থ; যাহা জগতের কল্যাণ-কর, তাহাই সকল জাতির পক্ষে ও প্রত্যেক পরিবার ও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণ-কর। জার্ম্মাণ কৈসার ও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের আচরণ দ্বারা যথাক্রমে এই দুইটী সত্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। "ভগ-বানের যাঁতা ধীরে ধীরে পেষণ করে" (God's mill grinds slowly)। প্রায় অর্দ্ধ শতা-ব্দীর পর আল্‌সেস-লোরেন্ পুনঃ ফ্রান্সদেশ-ভুক্ত হইল। বহুকাল পর বিলুপ্ত পোল্যাণ্ড রাজ্য পুনর্গঠিত হইল; ভারতে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাত ও "ভবঘুরে" ইহুদীগণ তাঁহাদের "প্রতিশ্রুত" ভূভাগে পুনঃস্থাপিত হওয়ার আশায় আশ্বস্ত হইল; টার্কদের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আরব, মিসর, মেসোপটেমিয়া, আর্ম্মেনিয়া, প্যালেষ্টিন্ প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হইল; তিব্বত, চীন, জাপান, ভারত, আফ্‌গানিস্থান, পারস্য, চীন তাতার প্রভৃতির রুস-ভল্লুক-ভীতি দুর হইল। চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানেডা, কালি-ফর্নিয়া প্রভৃতি দেশের জাপান-ভীতি প্রশমিত হইল। ফিন্‌ল্যাণ্ড, ইউক্রেইন, ককেসাস্ প্রভৃতি দেশ রুসিয়ার অধীনতা বর্জ্জন করিল। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যভুক্ত অনেক গুলি দেশ পুনঃ পৃথক হইয়া গেল। সর্ব্বত্রই প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল কি সেই মঙ্গলময় হস্তের সাক্ষ্য প্রদান করে না? এই মহাসমরে যে যে প্রকারে ভারতের শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে না পান এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন? হতাশ ও ধৈর্য্যহারা হইবার কারণ নাই; স্বার্থপর অত্যাচারী লোকেরা কখনই তাঁহার সুন্দর সৃষ্টি শ্রীভ্রষ্ট করিতে পারে নাই ও পারিবে না। নির্ম্মল বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্য সাধনে, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, পুরুষকার-অবলম্বনে, আশাপূর্ণ হৃদয়ে স্থিরচিত্তে কার্য্য করা এবং ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ক্রাইষ্ট-চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রেমের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-দৃঢ়তা সর্ব্বদা আদর্শ স্বরূপে মনে রাখা প্রত্যেক কর্ম্মবীরের পক্ষেই আবশ্যক। অভাব অভি-যোগ তাঁহাকে জানাইলে সুবিচার নিশ্চয় হয়, তাঁহার বিচারে, উকিল মোক্তার সাক্ষী আবশ্যক করে না; পার্থিব বিচারকদের যেরূপ ভ্রম প্রমাদ, পক্ষপাতিত্ব, আইন নজীরের অনভিজ্ঞতা, কি অজ্ঞতা থাকায় বিচার-বিভ্রাট হওয়ার আশঙ্কা, তাঁহার বিচারে সেরূপ কোনও আশঙ্কা নাই। তাঁহার প্রচারিত আদেশ কার্য্য পরিণত করার বন্দোবস্ত তিনিই করেন। শত্রু হঠাৎ মিত্রে পরিণত হয়; অপরিচিত লোক বন্ধু ও সহায় হন, হৃদয়ে বল, আশা ও শান্তির সঞ্চার হয়। তিনি যখন কর্ণধার, তখন উন্নতির ক্রম-বিকাশ-তরীর গতি নিরাপদ।

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(কেশব-একাডেমিতে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সভায় পঠিত। ঘটনা সমূহ ও আর আর কথা ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত হইতে গৃহীত।)

একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, পর্ব্বত ও সমুদ্র যেরূপ দেশের উচ্চতা ও গভীরতার পরিমাণ প্রদর্শিত করে, মহাপুরুষগণ সেইরূপ জাতীয় জীবনের উচ্চতা ও গভীরতা সূচিত করে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের অসীম শক্তি ও মহাপ্রাণে জাতীয় জীবনের যুগান্ত-ব্যাপী সাধনাই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশ শক্তিসাধক, শক্তির উপাসক ; আবার এই বঙ্গদেশই চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাভাব ও মহাপ্রাণে উদ্বেলিত। একদিকে জননী জন্মভূমি মহাশক্তির মূর্ত্তিধারণ করিয়া সন্তান-দিগকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দান করিতেছে ; অপর দিকে প্রকৃতির নন্দনকানন, সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন, কবিত্বের অনন্তখনি হিমগিরি কিরী-টিনী-সাগরাম্বরা, মুক্তগগনের উদারবক্ষে সুখ-সুপ্তা, হিমালয়-দুহিতা, পূততোয়াভাগীরথীর তরঙ্গ-শিকর-শীতলা, নানাজাতীয় বিহগ-কূজন-মুখরিতা, শস্য-শ্যামলা, সুজলা সুফলা 'কানন-কুন্তলা' বঙ্গজননী বিশ্বজনীন প্রেমের মধুর ঝঙ্কারে মুক্তজীবনের পূর্ণতার সঙ্গীত শুনাইয়া সকলকে উন্মত্ত করিতেছে। বঙ্গদেশের এই শক্তিসাধনা ও মহাপ্রাণ, জীবনের লক্ষ্যপথে অচঞ্চল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভোজ্জ্বল প্রাণে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষে সর্ব্বধ্বংসকারী কালস্পর্দ্ধী স্থির মৈনাকের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মানব-জাতির বিস্ময়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

হৃদয়ই শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ। যে হৃদয় সুদৃঢ় সংকল্পে স্থির থাকিয়া কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে সফল-তার উচ্চশিখরে উত্তোলিত করিয়াছিল,—নিঃসহায়-সম্বলহীন জীবনের কঠোর পরিশ্রমকে সার্থক করিয়াছিল, পিতৃ-সেবা ও ভ্রাতৃ-সেবারূপ ব্রতপালনে সক্ষম করিয়াছিল, নিদ্রাজয় করিয়া গভীর রাত্রি বা রাত্রি অবসান পর্য্যন্ত দিনের পর দিন অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিবার জন্য প্রাণে অসীম শক্তি সঞ্চারিত করিত, পার্থিব শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকিয়া করুণাব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য বিধবার দুঃখ-কাতর প্রাণে দুর্জ্জয় সাহস ও অমিত তেজ সঞ্চারিত করিয়াছিল, মাতৃ-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রাবৃটের দামোদরের খরস্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহুতে অমানুষিক শক্তির সঞ্চার করিয়া-ছিল, আত্ম-সম্মান ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পার্থিব সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, রোগ ও মৃত্যু ভয়ের উপর জয়লাভ করিয়া পথিপার্শ্বে-শায়িত বিসূচিকা রোগাক্রান্তকে বক্ষে করিয়া নিজের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য প্রণোদিত করিয়াছিল, দরিদ্রের দুঃখমোচনে অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতে, মহিলাদিগের শিক্ষোন্নতির জন্য অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিতে, দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্টের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে প্রাণে মাতৃপ্রাণের আত্মহারা ভাব খুলিয়া দিয়াছিল, সাধারণে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য নূতন সাহিত্য সৃষ্টি ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নের উজ্জ্বল প্রতিভার উদ্বোধন আনয়ন করিয়াছিল, সে হৃদয়ের অসীম শক্তির কে পরিমাণ করিবে? যে হৃদয়ের ধ্যান ও বিশ্বাস বলে দস্যু রত্নাকর

কবি গুরু বাল্মীকি হইয়াছিলেন, সত্যসন্ধ রামচন্দ্র সত্যের জন্য বনবাসজনিত দুঃখ বিপদকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ বিগতনিদ্র হইয়া ভ্রাতৃসেবা করিয়াছিলেন, শান্তনুনন্দন দেবব্রত 'ভীষণ' হইয়াছিলেন, রোমীয় বীর রেগুলাস ন্যায়, সত্য ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কার্থেজবাসীদিগের কঠোর মর্ম্ম-নির্য্যাতন ও মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, সক্রেটীশ অকাতরে উজ্জ্বল অমর জীবনকে সম্মুখে রাখিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারক মার্টিন লুথার জার্ম্মাণীর প্রতিকূল রাজন্যবর্গের সমক্ষে সত্যের ও পবিত্রতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, মার্কিন রাজ্যের থিয়োডর পার্কার দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, মেট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অসীম শক্তি, সাহস ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন; আর বলিব কি, দৈবভাবে অনুপ্রাণিত, বিশ্বাসোজ্জ্বল, ঈশ্বর ভক্তি ও মানব প্রেমে অটল অচল হৃদয়ের মহীয়সী শক্তিতে যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, বুদ্ধদেব কঠোর তপস্যায় নির্ব্বাণের মহৌষধ লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য উন্মত্তের ন্যায় কত দেশ পর্য্যটন করিলেন, আর মহাপুরুষ মহম্মদ স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়া প্রবল শত্রুসমক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর যে তরবারি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিবার জন্য উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা হস্তচ্যুত হইয়া তাঁহারই পদতলে পড়িল, আর প্রবল শত্রু পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, সেই আত্ম-বিস্মৃত হৃদয়ই শক্তির উৎস, প্রতিভার জনক, মঙ্গলের আকর, সভ্যতার খনি। হৃদয়ের বলই বল। এজন্য সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়কে নির্ম্মল রাখা প্রয়োজন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এই প্রেমবীর ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ ও প্রাচীন শাস্ত্র শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তখনও, ইংরাজী শিক্ষা বিশেষ প্রচলিত হয় নাই; এবং কলিকাতা বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইলেও, এখন যেরূপ উহা শিক্ষার কেন্দ্র, তখন শিক্ষা বিষয়ে উহা উচ্চ স্থান লাভ করে নাই। বঙ্গীয় সমাজ গ্রামে বাস করিত। মুক্ত বায়ু, ক্রীড়া কৌতুক পূর্ণ সহজ জীবনপ্রবাহ, বঙ্গ পল্লীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাচুর্য্যের নিবাস-ভূমি ও স্বাস্থ্য-নিকেতন করিয়াছিল। পল্লীসমাজ আনন্দ-ধ্বনিতে মুখরিত, নিত্য পূজা উৎ-সবের কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনিতে, নিমন্ত্রিত অভ্যা-গতের কোলাহলে চির-উৎসবময়। ধান্যক্ষেত্র, ফলফুল সম্ভার বৃক্ষলতা, ঘনচ্ছায় শ্যামল বিটপীশ্রেণী, পদ্মকহ্লার-সমুজ্জ্বল স্ফটিক-স্বচ্ছজলপূর্ণ তড়াগশ্রেণী পল্লীকে বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র আলেখ্যের ন্যায় স্নিগ্ধ শোভা পূর্ণ করিয়া রাখিত।

বাল্যজীবন ভাবীজীবনের মাহাত্ম্য সূচনা করে। মানব কি বিশেষ শক্তি ও প্রতিভা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাল্যকালেই তাহার কোন না কোন নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই শক্তিই উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও বিকশিত হইয়া মানবকে মহত্ত্বের উচ্চ পদবীতে আরূঢ় করে। কথিত আছে, বালক প্রহ্লাদ অক্ষর পরিচয় লাভের সময়ে 'ক' অক্ষর দ্বারা উচ্চারণ-সাদৃশ্যে 'কৃষ্ণ' নাম স্মৃতিতে উদ্দীপিত করিয়া দিত, আর কৃষ্ণ-ভক্তিতে তাঁর হৃদয় গলিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া দিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাল্য-কালে কৃষ্ণলীলা জীবনে অভিনয় করিতে ভাল

বাসিবেন। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হজরৎ মহম্মদ বাল্যকালেই ঈশ্বর-বিশ্বাসে অমানুষিক দৃঢ়চিত্ততা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি দস্যু রত্নাকরের জীবন পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিবা মাত্র পক্ষীমিথুনের একটীকে শরবিদ্ধ দেখিয়া অপরটীর সঙ্গে সমবেদনায় বিগলিত হইয়া ছন্দোবদ্ধ কবিতায় হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্সিত বেদনা প্রকাশিত করিলেন। কর্সিকার সামান্য ব্যবহার-জীবীর সন্তান যে পরিশেষে মহাবীর হইয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নূতন রাষ্ট্রীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইউরোপীয় রাজ্য সমূহকে প্রবল ভূমিকম্পে আলোড়িত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন, বাল্যকালে বরফের দুর্গ নির্ম্মাণ ও তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া আনন্দোভোগের মধ্যেই তিনি তাহার প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার বাল্য জীবনে ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসরের সময় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া অন্যেরা যাহা পাঁচ, ছয় বৎসরে শিক্ষা করে, তাহা ৩ বৎসরেই তিনি শিখিয়া লইয়াছিলেন। বীরনগর হইতে কলিকাতা আসিবার পথে মাইল-নির্দ্দেশক কাষ্ঠফলকে ইংরেজী এক দুই সংখ্যা খোদিত দেখিয়া সংখ্যা-জ্ঞাপক ইংরেজী এক, দুই প্রভৃতি চিনিয়া লইয়াছিলেন। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অবগাহিত করিয়াও বাল্যকালে স্কুলের বৃত্তির টাকা দরিদ্রের সেবায় অকাতরে দান করিতেন, আর, বাল্যকালের সকল কার্য্যেই তিনি তাঁর দৃঢ়চিত্ততা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সময় সময় এই দৃঢ়চিত্ততা একগুঁয়েমিতেও পরিণত হইত। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে, তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটনে অনেক বৎসর অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাঁহার মুখশ্রীতে তাঁহার পিতামহ ভবিষ্যৎ নির্ভীক দৃঢ়চিত্ততার এমন কোন নিদর্শন দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহে আসিবামাত্র তাঁহার পিতামহ বলিলেন—"একটা এঁড়ে বাছুর আমাদের বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।" এই এঁড়ে বাছুরের ভবিষ্যতের সেই সত্যে অটল, সঙ্কল্পে দৃঢ়, অচল, মানবহিত-ব্রতে নির্ভীক কর্ম্মবীর, অত্যাচার, অপমান, নির্যাতনে শৈল সদৃশ স্থির অবিচলিত, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে অক্লান্ত, হৃদয়ের অতল গভীরতায়, অপার বিশালতায় ও উচ্ছ্বাসময় বিশ্বপ্লাবী শক্তিতে অক্ষুব্ধ সাগর সদৃশ, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার কোন জমিদারের সেরেস্তায় ১০৲ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় প্রবেশ করেন। তথায় তিন বৎসর শিক্ষা করিয়া গুরুমহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া আসেন। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মহামতি ভারতহিতৈষী মানব প্রেমিক হেয়ার সাহেব মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তায় কলিকাতায় ১৮১৬ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঈশ্বরচন্দ্রকে ১০৲ টাকা বেতনের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু কলেজে ইংরাজি শিক্ষা দিতে সংকল্প করেন। তিনি জমিদারী সেরেস্তায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া ও দুবেলা স্বহস্তে রন্ধনাদি সকল কার্য্য করিতেন, ও অষ্টমবর্ষীয় বালকের প্রবাসে মাতৃ-স্থানীয় হইয়া অকাতরে

সেবা করিতেন এবং সময় সময় স্বহস্তে মলমূত্রাদিও পরিষ্কার করিতেন। এ অবস্থায়ও দেশের তখন যতদূর উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায়, সেরূপ উচ্চ শিক্ষা সন্তানকে প্রদান করিবার জন্য পিতার মনে দৃঢ় সংকল্প। এরূপ পিতা না হইলে কি সন্তান এত মহৎ হইতে পারে? পিতার কর্ত্তব্য-বিমুখতা, উদাসীনতা, ও দুর্নীতার জন্য কত সন্তান তাহাদের শক্তি সামর্থ্য ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে পারে নাই। ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু কিছুদিন পরে উদরাময় রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে লইয়া গেলেন। গ্রামের স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্ত নির্ম্মল বাতাস ও মাতা ও পিতামহীর সেবা শুশ্রূষা তাঁহাকে রোগ-মুক্ত করিল। তিনি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিয়া ছয় মাস পরে পুনরায় পিতার সঙ্গে কলিকাতা আসিলেন। তখনও দেশে রেল-পথ বিস্তৃত হয় নাই। অষ্টম বৎসরের বালক পিতার সঙ্গে স্বীয় গ্রাম হইতে কলিকাতা ২৬ ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিয়া আসিলেন। তখন পথ-ঘাটও ভাল ছিল না; বিশেষতঃ পথে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের হাটিতে হাটিতে পদদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পিতার সঙ্গে তিনি কলিকাতার পথে চলিয়াছেন। অবশেষে, স্নেহশীল পিতা তাঁহাকে স্কন্ধ-দেশে লইয়া কলিকাতা পৌছিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার মনে বংশ-গৌরব জাগিয়া উঠিল; পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থা অবলম্বন করিয়া যাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী হইয়া গৃহে চতুষ্পাঠী খুলিয়া বিদ্যাদান করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাদান করাই স্থির করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার ছয় বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেন্ট, হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বিচারাদিতে পরামর্শদাতা জজ-পণ্ডিত প্রস্তুত করিবার জন্য লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম মাত্র ৯ বৎসর। তিনি অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি ছিলেন; তিনি যখন অনেক পুস্তক হাতে করে স্কুলে যাইতেন, তখন অনেকেরই তাহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। স্কুলের সহপাঠীগণ তাহাকে "যশোরে কৈ" বলিত। তিনি কলেজে যাহা পড়িয়া আসিতেন, পরে পিতার নিকট তাহার আবৃত্তি করিতেন। শিক্ষা বিষয়ে পিতার কঠোর শাসন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া পরে ছয় মাস অমর কোষ ও ভট্টিকাব্য পাঠ করেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, আর এক বৎসর পরীক্ষা-প্রহেলিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি সাহিত্য-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনিই শ্রেণীতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-বয়স্ক ছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁহার সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও রস বোধ প্রবল ছিল। তিনি যেরূপ সহজে অন্বয় ও অর্থ করিতে পারিতেন, শ্রেণীর আর কেহই সেরূপ পারিত না। তাঁহার অনুবাদ করিবার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল। পরে তিনি ইংরেজী সাহিত্য ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে যে সকল মুক্তারাজি সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ভাব ও শব্দ-সম্পদে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই অনুবাদ করিবার অসীম ক্ষমতার ফলস্বরূপ। তাঁহার শ্রবণ শক্তিও অত্যন্ত প্রখর ছিল।

তিনি নাটকের প্রাকৃত ভাষাও প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরই ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া অনেক পরিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় দুর্গন্ধময় অন্ধকার গৃহে থাকিয়া কিরূপ জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তাহার চিত্র সকলের শিক্ষাপ্রদ। তাঁহাদের কোন দাসদাসী ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার লিখিত 'বিদ্যাসাগর চরিতে' তাঁহার প্রতিদিনের জীবনের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া বড় বাজার ট্যাকশালের গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আসিবার সময় বড়বাজার কাশীনাথ বাবুর বাজারে যাইতেন। তথায় বাটা মৎস্য আলু পটল তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পঁহুছিয়া প্রথমতঃ হরিদ্রাদি ঝাল মশলা বাটিয়া উনন ধরাইয়া মুগের দাউল পাক করিয়া মৎস্যের ঝোল রন্ধন করিতেন। ভোজনের পর তাঁহাকেই উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিতে হইত। হাঁড়ি মাজিয়া, বাসন ধৌত করিয়া, স্থান মুক্ত করায় অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও নখগুলি ক্ষয় হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্য তাঁহার হাতে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত। ভোজন করিতে করিতে যদি একটী ভাত ছড়ান হইত বা পাতে কিছু উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে পিতৃদেব বড় মারিতেন; এজন্য সর্ব্বদা ভোজনের পাত পরিষ্কার করিয়া খাইতেন। এ কারণ তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাত্রে অনেকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রি ৯টার সময় বাসায় আসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠাভ্যাস করিতে দেখিলে তিনি পরমাহ্লাদিত হইতেন। প্রদীপ জ্বলিতেছে, পুস্তক খোলা রহিয়াছে, আর উভয়ে নিদ্রা যাইতেছে দেখিবা মাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যন্ত প্রহার করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাসায় আগমন করিলে ঈশ্বরচন্দ্র পাকারম্ভ করিতেন। পাক ও আহার করিয়া রাত্রি একাদশ ঘটিকার পর শয়ন করিতেন। পুনর্ব্বার শেষ রাত্রিতে পিতার নিকট অনেক কবিতা আবৃত্তি করিতেন। পরে সূর্য্যোদয় হইলে পর কলেজের পাঠ্য পুস্তকের পাঠ সমাপন করিয়া গঙ্গা স্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিতেন ও পাকাদি কার্য্য সমাধানান্তে ভোজন করিয়া বিদ্যাসাগর যাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা চরখা সূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা বস্ত্র পরিধান করিয়া অধ্যয়নার্থ উভয় ভ্রাতা কলেজে যাইতেন। দুই বেলা পাকাদি কার্য্য করিতে করিতে নিজের পাঠ্য পুস্তক লইয়া ঈশ্বরচন্দ্র পাঠানুশীলন করিতেন, ও কলেজে যাইবার সময় পথে বহি দেখিতে দেখিতে যাইতেন। বাসায় প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। কোন কোন দিন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় বিদ্যালয় ছুটী হইলে ছুটীর পর কলেজের অধ্যাপকদিগের বাসায় গিয়া নানা গ্রন্থ আলোচনা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে গৃহে পাক করিতেন, তাহার অতি সন্নিহিত স্থানে অপরের পায়খানা ছিল, সুতরাং পাকশালায় বসিলেই অত্যন্ত দুর্গন্ধ বোধ হইত। পাকগৃহটী অত্যন্ত ছোট ও অন্ধকারময় ছিল, তৈলপায়ী অর্থাৎ আরসুলায় পরিপূর্ণ থাকিত। প্রায় মধ্যে মধ্যে দু চারিটা আরশুলা ব্যঞ্জনে পতিত হইত।

দৈবাৎ একদিন অগ্রজের ব্যঞ্জনে একটা আর-শুলা পড়িয়াছিল। প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে ভ্রাতৃগণ বা পিতা ঘৃণা প্রযুক্ত আর ভোজন করিবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত আরশুলা ব্যঞ্জন সহিত উদরস্থ করিলেন। যে স্থানে আহার করিতে বসিতেন, তাহার নিকটস্থ নর্দমা হইতে কেঁচো ও অন্যান্য কৃমি উঠিয়া ভোজন পাত্রের নিকটে আসিত, এজন্য তিনি এক ঘটি জল কাছে রাখিতেন, ঐ জল ঢালিয়া দিয়া কৃমি গুলিকে সরাইয়া দিতেন। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক বিছানায় শয়ন করিতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিদ্রিতাবস্থায় বস্ত্রে মল ত্যাগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গভীর রাত্রিতে শয়ন করিয়াই নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ হইলে দেখিলেন, তাঁহার পীঠ, বুক প্রভৃতিতে বিষ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে। কোন কথা না বলিয়া গাত্র ধৌত করিয়া সমস্ত শয্যা স্বহস্তে কূপোদক দ্বারা প্রক্ষালিত করিলেন।"

তাঁহার জননী দেবীর স্বহস্ত-নির্ম্মিত মোটা বস্ত্র তিনি পরিধান করিতেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এসময় সংস্কৃত রচনায় বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক ও ৮৲ টাকা বৃত্তি পান। তিনি অলঙ্কার শ্রেণী হইতেই স্মৃতি শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়া, এমন কি, অনেক দিন মাত্র রাত্রি ১০টা হইতে ১২টা এই দুই ঘণ্টা নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া, সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন পূর্ব্বক যে সকল কঠিন স্মৃতি-গ্রন্থ অপর ছাত্রগণ ২ বৎসরে পরিসমাপ্ত করিতে পারিতেন না, তাহা ছয় মাসে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া 'ল' কমিটার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্মশ্রুরেখা-বিরহিত অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গভর্ণমেণ্ট ত্রিপুরা জেলায় জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পিতৃদেবের অসম্মতি-নিবন্ধন তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করেন নাই।

ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি বেদান্ত শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি সত্য কথনের মহিমা বিষয়ে সংস্কৃতে এক সন্দর্ভ লিখিয়া একশত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা রচনার জন্য শিক্ষা-সমাজ হইতে ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এখন তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। দর্শনের পরীক্ষায়ও সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১০০৲ টাকা পারিতোষিক ও সংস্কৃত কবিতা রচনার জন্য আর এক শত টাকা প্রাপ্ত হন। চারি বৎসর রীতি মত পরিশ্রম করিয়া তিনি সমগ্র দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অপর ছাত্রগণ দশ কি দ্বাদশ বৎসরের কমে দর্শন শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি এই সময়ে দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষায় এক শত টাকা, কবিতা রচনার জন্য একশত টাকা, আইনের পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা ও হস্তাক্ষরের জন্য ৮৲ আট পারিতোষিক লাভ করেন। এইরূপে স্বীয় প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম পূর্ব্বক ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই সময়ও তিনি তাঁহার হৃদয়ের দয়া ও স্নেহের কত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিজে অনাহারে থাকিয়া অন্যকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, দীন সহপাঠীদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দান করিয়াছেন;

নিজে সময় সময় কঠোর রোগে রুগ্ন হইয়াও প্রতিবেশীদিগের খবর নিতেন ও রোগীর সেবা করিতে আনন্দ লাভ করিতেন।

কর্ম্মজীবন—আত্মত্যাগ, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও আত্মনির্ভর। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। সে সময় সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাহেবেরা ভারতে আসিলে প্রথমে এই কলেজে বাঙ্গালা ও হিন্দি শিক্ষা করিতেন। এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র রীতিমত ইংরেজী ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার ভাষা শিক্ষা করিবার অদ্ভুৎ ক্ষমতা ছিল। স্বদেশ-প্রাণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা খ্যাতানামা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম সুহৃদ্ ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রথমে ঈশ্বর চন্দ্র ইংরেজী শিক্ষা করেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে বিদ্যাদান করিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। অনেকে সংস্কৃত শিক্ষার অভিলাষে প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহার বাস গৃহে সমবেত হইতেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রধান ব্যাকরণ অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। তদনীন্তন সম্পাদক ঈশ্বচন্দ্রকে ৯০৲ টাকা বেতনে সে পদে নিযুক্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র তারানাথ তর্কবাকস্পতিকে এই কার্য্যের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত এবং ঐ কার্য্য তাঁহারই প্রাপ্য মনে করিলেন। এইজন্য নিজে ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ঐদিবস তিনি গঙ্গা পার হইয়া পদব্রজে প্রায় ৩০ ক্রোশ গমন পূর্ব্বক তর্কবাচস্পতি মহাশয় হইতে তাঁহার প্রশংসা পত্র সহ আবেদন-পত্র লইয়া আসেন। তাঁহারই অনুরোধে সাহেব তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ঐপদে ৯০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন ৫০৲ বেতনে কাজ করিতেন; তাহা হইতে ২০৲ টাকা পিতৃ-মাতৃ সেবায় ব্যয় করিতেন; অবশিষ্ট ৩০৲ টাকায় তিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া নয় জন পোষ্যবর্গ সহ কলিকাতায় বাস করিতেন। এই অবস্থায় পর্য্যাক্রমে তিনিও স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। এই সকল খরচ নির্ব্বাহ করিয়াও তিনি দুঃখী, দরিদ্র ও আত্মীয় স্বজনদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। ৫০৲ টাকা বেতনে এত কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিয়া ও ৯০৲ টাকা বেতনের একটা কর্ম্ম নিজে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার সমপাঠীকে তাঁহা অপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিয়োজিত করাইলেন। এইরূপ গুণের সম্মান, ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল।

সংস্কৃত কলেজের কোন রূপ উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া তদানীন্তন, শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ৫০৲ টাকা বেতনে কলেজের সহকারী সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এই পদ গ্রহণ করিয়া কলেজের শিক্ষা কার্য্যে নূতন জীবন-সঞ্চার ও নূতন শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন, ব্যাকরণ শিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং সাহিত্য পুস্তক হইতে অশ্লীল কবিতা সকল তুলিয়া দিলেন।

এই চাকুরী-জীবনে তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এক দিনের জন্যও ক্ষুণ্ন

করিতে পারে নাই। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে তাঁহাকে স্খলিত করিতে পারিত না। আর বড় লাট হইতে সকল প্রধান ২ ইংরেজ ও দেশীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সকলের নিকটই তিনি মনুষ্যত্ব-গৌরব সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিতেন। তাঁহার সত্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহাকে সত্যই মনুষ্যত্বের উচ্চ গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল, সেজন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য যদি কখনও কোন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হইয়া থাকেন, উন্নতমনাঃ রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পোষণ করিয়াছেন।

যখন সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সম্পাদকের সঙ্গে কলেজ পরিচালনা বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইল, তখন তিনি সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। সে সময় প্রায় ২০ জন তাঁহার কলিকাতার বাসায় থাকিয়া তাঁহার ব্যয়ে অধ্যয়ন করিত। দেশের পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা পাঠাইতেন। এতৎব্যতীত কত অনাথ বালক ও দরিদ্রকে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন। তিনি কোন বিষয়ে ব্যয় সঙ্কুচিত করেন নাই, কাহাকেও তাঁহার অর্থের অভাব বুঝিতে দেন নাই। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, দারিদ্র্যে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত, কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তিনি দারিদ্র্যকে ভয় করিবেন কেন? আলু পটল বিক্রয় করিয়া খাইবেন, তথাপি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন না। এই সময় তিনি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য হিন্দি ও ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে লাগিলেন ও সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারী নামে এক মুদ্রাযন্ত্রও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। তিনি এই সময় বিশেষ মনোযোগ সহকারে ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই ভাষায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। কয়েকমাস পরেই তিনি আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৯০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তিনি ইংরেজীতে যে কলেজের বার্ষিক বিবরণ লিখিতেন ও নানা বিষয়ে যে আপনার মত ব্যক্ত করিতেন, তাহা ভাল ভাল ইংরেজদিগেরও শ্লাঘনীয় হইত। পরে তিরি আবার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই পদ হইতে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। তখন তিনি মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতন স্বরূপ লাভ করিতেন। তিনি যে কাজই করিতেন, তাহাতে সমুদয় হৃদয় মন ঢালিয়া দিয়া এক নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতেন। তিনি কলেজে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন; ক্রমে এই কলেজের ছাত্রগণও বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করেন। এই সময় ক্রমে ক্রমে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবেণীমাধব দাস।

সাধক জীবনে খ্রীষ্টের স্থান।

যে ধর্ম্মটা এযুগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নামে অভিহিত, তাহাই যে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ছিল, বা তাহাতেই যে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টের শিক্ষার সর্ব্বোত্তম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। যে সকল জাতিরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক পরিমাণে আপনাদেরই সাজে খ্রীষ্টকে সাজাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, ঐ সাজের মধ্যেও খ্রীষ্টের স্বাভাবিক মূর্ত্তিটা দৃষ্টিগোচর হয়।

ভারত ধর্ম্মের দেশ। এ দেশটা চিরকাল ধর্ম্মের দেশই থাকিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ধর্ম্মের বহিরাবরণটা যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু ধর্ম্মের যাহা সার বা সাঁশ, সে জিনিসটা অবিনশ্বর। তাহাতে অভিব্যক্তি আছে, কিন্তু তাহার ধ্বংস নাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের বহিরাবরণ বহু পরিমাণে ভাঙ্গিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার বা সাঁশ, সে জিনিসটাকে পরিপুষ্টই করিয়াছিল। বাহ্যিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বৌদ্ধধর্ম্ম আভ্যন্তরীণ হিন্দুধর্ম্মকে প্রাণের দোসরের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া তার সঙ্গে একই ভিটায় একই ঘরে বাস করিতেছে। হিন্দু মতাবলীর মধ্যে বৌদ্ধ মতাবলী সোণায় সোহাগার মতন মিলিয়া আছে। হিন্দু সাধকের জীবনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বুদ্ধদেব এখনও নির্ব্বাণ মন্ত্র লইয়া বিরাজ করিতেছেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মটাও হিন্দুধর্ম্মের ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিতে আসে নাই। অর্ব্বাচীন, অদূরদর্শী, আত্মকেন্দ্রী খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের আক্রমণে হিন্দুধর্ম্মের বহিরাবরণ কিছু কিছু ভাঙ্গিতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সার জিনিসটার অণু মাত্রও অনিষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রভাতের বাতাস যেমন করিয়া ফুলের কলিকা ফুটাইয়া দেয়, খ্রীষ্টের কোমল স্পর্শেও হিন্দু সাধক জীবন তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। এ প্রস্ফুটনে যে সুরভি ধারা নির্গত হইবে, তাহাতে শুধু ভারত নহে, বরং সমগ্র জগৎ সুরভিময় হইয়া যাইবে।

একটা ঠাকুর গড়িয়া তাহার পূজা করা সহজ, কিন্তু যে দেবতার ঠাকুর গড়া হয়, কয়জন তাঁহার দর্শন পায়? সাধক জীবন দর্শনের জীবন—অনুভূতির জীবন—প্রাণে প্রাণে উপভোগের জীবন। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস পাঠ করিলে অনেক সময় মনে হয়, যে সকল দেশ খ্রীষ্টান্ দেশ নামে বিখ্যাত, সে সকল দেশে খ্রীষ্টেরও যেন একটা ঠাকুরই গড়া হইয়াছে। অধিকাংশ লোক ঠাকুর পূজার মতন খ্রীষ্টোপাসনা করে। খ্রীষ্টের সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই—সাধনার যোগ নাই। তাই মানুষগুলো ঠাকুর পূজা করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে ঠাকুরের ন্যায় জড়ভাবাপন্ন হইয়া আছে। ঐ সকল দেশে খ্রীষ্টপ্রাণ নর নারী যে আদবেই নাই, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ। কয় জন লোক খ্রীষ্টকে ঠাকুর ছাড়া গুরুরূপে, সখারূপে বরণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গভীর তত্ত্ব-সাগরে ঝাঁপ দেন? "Eat, drink and be merry"—খাও দাও মজা কর, ইহাই কি ও সকল দেশের ধর্ম্ম নহে?

প্রাচীন মণ্ডলীর অবস্থা কিন্তু আর এক রকম ছিল। সে যুগে খ্রীষ্টের ঠাকুর গড়া হয় নাই। সে যুগে খ্রীষ্ট একটা living personality "জীবন্ত ব্যক্তিত্ব" ছিলেন। ঐ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যে আসিত সেই

একটা জীবন্ত ব্যক্তি হইয়া যাইত। মানুষের প্রাণের সুভাবগুলি ঐ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ফুটিয়া উঠিত। অটল বিশ্বাস, আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, নির্ম্মল জীবন, "আত্মহারা প্রেম, প্রাণভরা সহানুভূতি খ্রীষ্টানদের প্রাণে প্রাণে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইত। তখন creed বা ধর্ম্মমত রচিত হয় নাই। বিশ্বাসীদের বিশ্বাস স্বাধীন—বিবেক স্বাধীন —প্রাণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু যখন চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম ও রাজ্যের ধর্ম্ম (state religion) হইল, তখন অবস্থা একেবারে বদলিয়া গেল। খ্রীষ্ট আর living personality বা জীবন্ত ব্যক্তিত্ব রহিলেন না। তিনি একটা dogma বা মত রূপে পরিণত হইলেন। সে dogma বা মতে তাঁহাকে উচ্চতম পদ প্রদত্ত হইল। "God of God, light of light, very God of very God" (দেখুন Nicene creed.) কিন্তু যিনি "ঈশ্বরের ঈশ্বর", তিনি তো ঈশ্বরত্বে নীত হইলেন—মানব-জীবনে আর তাঁর স্থান রহিল না। মাটির ঠাকুরই বল, আর মতের ঠাকুরই বল, উভয়ই প্রাণহীন। এদেশ মাটির ঠাকুর পূজা করিয়া রসাতলে গিয়াছে—ও দেশ মতের ঠাকুর পূজা করিয়া দৈত্য দানবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গত যুদ্ধই তাহার প্রমাণ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ নাই, তাহা আমি বলিতেছি না। ঐ সকল প্রহ্লাদদের গুণেই ধরাটা এখনও ধরাবক্ষে বাঁচিয়া আছে, নতুবা সাগর জলে ডুবিয়া যাইত।

যাহা হউক, পরের কথা লিখিয়া লাভ কি? আমরাও যে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের দেশে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য রূপে জীবন যাপন করিতেছি, তাহা নহে। আমাদের শত দোষ, শত পাপ, শত ত্রুটি আছে। নরকের বীভৎস চিত্র আমাদেরও সমাজ ও বুকের ভিতর আছে। না ওঁরা ভাল মানুষ, না আমরাই খুব ভাল মানুষ। গত পঞ্জাব বিভ্রাটে, বাধা পাইয়াই হউক বা না পাইয়াই হউক, আমরা যখন যষ্টি প্রহারে জন কতক শ্বেতাঙ্গকে ধরাশায়ী করিলাম, তখন "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মন্ত্র মনে রাখি নাই। আবার ওঁরা যখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া "জালিয়ানওয়ালা বাগে" অসংখ্য কৃষ্ণকায়কে ধরাশায়ী করিলেন, তখন "এক গালে চড় মারিলে অপর গাল পেতে দাও" এ কথাটা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। পাপের নাম পাপ— তার সাদা কালো পোষাক নাই।

খ্রীষ্ট একটা living personality বা জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি মৃন্ময় বা মতামত মূর্ত্তি নহেন। যদি প্রাচীন মণ্ডলীর ন্যায় পরবর্ত্তী মণ্ডলীতেও তিনি জীবন্ত ব্যক্তিত্ব রূপে বিরাজমান থাকিতেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য জগৎটা আর এক রূপে গঠিত হইত, উহার আর এক কলেবর হইত। কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন প্রাচ্য জগতের পালা পড়িয়াছে। খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে নানা প্রকারে অনুরোধ ও উপরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমরা কোন্ খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিব? মত-গড়া খ্রীষ্টকে না জীবন্ত ব্যক্তিত্বকে? শত বৎসরের অধিক মিশনরীগণ ভারতে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত করিয়াছেন—শত বৎসরের অধিক ঐ মণ্ডলীতে মিশনরীগণ মত-গড়া খ্রীষ্টের উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু তাহাতে মণ্ডলী মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কতটা বাড়িয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। হিন্দু আপনার মন্দিরে গিয়া মৃন্ময় ঠাকুরের পূজা করে। তোমরাও গির্জ্জায় গিয়া একটা মতময় ঠাকুরের পূজা কর। পার্থক্য কোথায়? জীবন ও নীতি তো প্রায় উভয়ত্র একই। শুধু খ্রীষ্টীয় সমাজ নামে আর একটা সমাজ বা জাতি গড়া হইয়াছে মাত্র।

ভারতে ঠাকুরের অভাব নাই। ভারতে তেত্রিশ কোটী দেবতা ঠাকুর। আরো যে কত উপ-ঠাকুর আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে দেশে এত ঠাকুর পূজা হইতেছে, সে দেশে আর একটা নব ঠাকুর আনিয়া কি লাভ? আমাদের মন্দিরে আর একটা ঠাকুরের সংখ্যা বাড়িবে মাত্র, ঐ নব

ঠাকুরের আগমনে ভারত নব জীবন পাইবে না।

কিন্তু খ্রীষ্ট বলেন "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." তিনি ঠাকুর হইয়া ঠাকুর ঘরে পূজা গ্রহণ করিতে আসেন নাই। তাঁহার মিশন ছিল "জীবন"—"প্রচুর জীবন।"

অতএব সাধক জীবনে খ্রীষ্টের স্থান ঠাকুরের স্থান নহে। তিনি প্রাণহীন ঠাকুর রূপে কাহারও জীবনে বিরাজ করিতে চান না। তিনি জীবন্ত ব্যক্তিত্ব রূপে মানব জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া সে জীবনকে প্রাচুর্য্য ও পূর্ণতায় পরিণত করিতে চান। খ্রীষ্টকে ঠাকুর না বলায় খ্রীষ্টীয় বিশ্বাবাসীগণ আমাকে heretic বা বিধর্ম্মী মনে করিবেন না। আমি আপনাদের খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিতেছি না। তিনি তত্ত্বতঃ মানুষ ছিলেন, কি ঈশ্বর ছিলেন, কি মানুষ ও ঈশ্বর উভয়ই ছিলেন, সে বিষয়ে তর্ক করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তিনি একজন "ব্যক্তি" ছিলেন, ও তাঁহার ব্যক্তিত্বটা তাঁহারই ব্যক্তিত্ব ছিল, এস্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইল। ঐ ব্যক্তিত্বটা প্রাচীন মণ্ডলীতে নর নারীর মধ্যে একটা নব ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন করিয়াছিল, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। এ যুগে যে conversion বা মন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু মন পরিবর্ত্তন অপেক্ষা dogmatism বা মতবাদীত্বের প্রাধান্যই যে অধিক, তাহা চক্ষু থাকিতে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব?

পাঠক, এখন একবার ভারতের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হউন ও ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে খ্রীষ্টের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন। বৈদিক কাল আমাদের ধর্ম্ম জীবনের বাল্যকাল না হইলেও তরুণ বয়স ছিল। ঐ তরুণ বয়সে আমাদের পিতৃগণ যখন ভারত ক্ষেত্রে পদার্পণ পূর্ব্বক ইহার সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্য শ্যামলা প্রকৃতির পানে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন প্রকৃতির প্রতি পদার্থ তাঁহাদের দৃষ্টিতে জীবনময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঋগ্বেদের মন্ত্রনিচয় পড়িলে মনে হয়, কোন মৃত বস্তুকে তাঁহারা যেন দেখেন নাই। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু, বনস্পতি, রাকা, ঊষা, সকলি যেন জীবন পূর্ণ—সকলি যেন আলোকময়। সে যুগে বিদ্যুতের দ্যুতি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবু এই বিশ্বমণ্ডল বিদ্যুতের দ্যুতি অপেক্ষাও দ্যুতিমান। প্রতি পদার্থের অন্তরালে কোন না কোন দ্যুতিকে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। ঐ দ্যুতিকে তাঁহারা "দেব" নামে সম্বোধন করিতেন। বালক যেমন প্রতি জনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতে, সেইরূপ তাঁহারা ঐ দ্যুতিমান দেবগণের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিতেন—তাঁহাদিগকে আপনার লোক বলিয়া ভাবিতেন।

দ্যৌঃ৺পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতানঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং বিয়ন্ত ॥—ঋগ্বেদ ৬।৫১।৫।

"হে দ্যৌঃ পিতঃ, পৃথিবিমাতঃ, অগ্নি ও বসুগণ ভ্রাতঃ, তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। হে আদিত্যগণ ও অদিতি, তোমরা সমবেত হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর।"

প্রকৃতির প্রতি বস্তুতে জীবন দর্শন—দেব দর্শন—ও প্রতিবস্তুর অন্তরালস্থ দেবতার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ অনুভব করা, ধর্ম্ম জীবনের বাল্য বা তরুণ কাল হইলেও, একটা উপাদেয় অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহারা দার্শনিক ভাবে জড় ও চৈতন্যে প্রভেদ করিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না—(পরে তাহাও কতকটা শিখিয়াছিলেন।) তাঁহারা খাঁটি দার্শনিক হউন বা না হউন, তাঁহারা দ্রষ্টা ছিলেন—ঋষি ছিলেন—কবি ছিলেন। তাঁহারা জড়ে জীবন জড়িত দেখিতেন। সে জীবন অন্ধকারময় নয়, ত্রাসময় নয়—আলোকময়, আনন্দময়। সে জীবনের নাম "দেব।" ঐ দেব পদে পদে তাঁহাদের সহায়, রক্ষক ও পথপ্রদর্শক। তাঁহারা ঐ দেবগণের স্তুতি

করিতেন—ঐ দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এ যুগের পণ্ডিতেরা, এই ধর্ম্মটাকে physiolatry বা প্রকৃতির উপাসনা বলেন। আমার ইচ্ছা করে, এই ধর্ম্মটাকে "জীবন বাদ" নামে অভিহিত করি। খ্রীষ্টের ধর্ম্মও জীবনবাদ ছিল। "I am come that they might have life,and that they might have it more abundantly." "More "abundantly"র অর্থ "over flowingly ও হইতে পারে, শুধু প্রচুর বা পরিপূর্ণ জীবন নয়, বরং বর্ষাকালের নদীর মতন উবছে-পড়া জীবন। নদী যখন উবছে পড়ে, তখন নদীটাকে আর চেনা যায় না—সমস্ত মাঠ, সমস্ত দেশ জলে জলাকার হইয়া যায়। খ্রীষ্ট এই আত্মভোলা আত্মহারা উবছে-পড়া জীবনের কথা বলিতেছেন। সাধক জীবন অন্তরে বাহিরে উবছে পড়ে। সাধক যে প্রকৃতির মধ্যে বাস করেন, ঐ প্রকৃতিটার মধ্যে উবছে-পড়া জীবন দেখেন। ঐ সবুজ গাছটা উবছে পড়িতেছে—ঐ ফুলটা উবছে পড়িতেছে—ঐ ছোট পাখীর স্খলিত কাকলিটুকু উবছে পড়িতেছে। ইহারই নাম প্রকৃতিতে জীবন বা দেব দর্শন। জীবন্ত বা দিব্য নেত্র না হইলে এই জীবন ও দেব দর্শন অসম্ভব। ঐ দেবগুরু যীশু চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন লাগিয়ে দিলেন, আর সাধক প্রকৃতিতে দেবদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার নূতন ধর্ম্ম নহে, ইহা সনাতন ধর্ম্ম—মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বৈদিক যুগের সরল ঋষিগণ তাই না জানি কি মন্ত্র বলে প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে, কক্ষে কক্ষে দেবদর্শন করিয়াছিলেন। এটা কি জড়োপাসনা? ওরে মূর্খ! জড় কি উবছে পড়তে পারে? ঐ নদীটা জলভরে উবছে পড়িতেছে—এটা কি জড়ের লীলা? জড়ের আড়ালে অজড়কে দেখ—প্রকৃতিতে দেবদর্শন কর। প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে পারে, কিন্তু যেটা নামে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, সেইটাই কি খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ছিল? খ্রীষ্ট এই দেব দর্শনের প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি স্বয়ং ইহার প্রচারক ছিলেন। প্রকৃতিতে দেব দর্শন কর—প্রকৃতিতে উবছে-পড়া জীবন দেখ—সে জীবনে ডুবিয়া এ জীবনে ধন্য হইয়া যাও। খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রকৃতিতে দেবদর্শন করিয়াছিলেন—প্রকৃতিতে উবছে-পড়া জীবন দেখিয়াছিলেন। তাই কোন পাহাড়ে গিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন।

বৈদিক যুগ আর এক যুগকে প্রসব করিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের গোটা-কতক সঙ্গীতে সে যুগের সূচনা দেখিতে পাই। প্রথমে Polytheism বা বহুদেববাদ—অতঃপর Kathenotheism বা বহুমধ্যে একদেববাদ—অবশেষে Monotheism, Monism বা একত্ববাদ—ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ। উপনিষদগুলিতে একত্ব-বাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্মের বহিরাবরণ দেখিলে মনে হয়, উপনিষদের একত্ববাদ যেন বৈদিক ধর্ম্মের মূলচ্ছেদন করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মের অন্তরাবরণে প্রবেশ করিলে আর এক তত্ত্বের পরিচয় পাই। বৈদিক ঋষিগণ ভূতে ভূতে দেব-দর্শন করিতেন। উপনিষদের ঋষিরাও ভূতে ভূতে দেবদর্শন করিতেছেন—

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

তবে প্রভেদ কোথায়? কেহ তিল তিল করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছে—কেহ তিল তিল করিয়া চয়ন পূর্ব্বক এক তিলোত্তমায় সবটা একাধারে দেখিতেছে। বৈদিক ঋষিরা ভূতে ভূতে পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেন—তাঁহারা ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার নাম রাখিয়াছিলেন। জীবন জিনিসটা তো একই। কিন্তু ঐ জীবন্ময় দেবতা জ্যোতির্ম্ময় আকাশে দ্যৌঃ, আবরণকারী আকাশে বরুণ, বৃষ্টিদাতা আকাশে ইন্দ্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। উপনিষদের ঋষিরা ঐ জীবন্ময় দেবতাকে সর্ব্বভূতের অন্তরালে এক আত্মা ও এক ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। তাঁহারা ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া সমষ্টিকে ধরিলেন। কিন্তু ভূতকে একেবারে ভুলিতে পারিলেন না। তাই উপনিষদেও "ভূতেষু ভূতেষু

বিচিন্ত্য ধীরাঃ।" ধীরগণ ভূতে ভূতে চিন্তা করিতেছেন—ভূতে ভূতে তাঁহাকে দেখিয়া অমর লোকে প্রবেশানন্তর অমর হইয়া যাইতেছেন।

উপনিষদের ধর্ম্মে জীবন ব্রহ্মমুখী। ভূত খোসা মাত্র। খোসা ছাড়িয়ে সার বা শাঁশটা গ্রহণ কর। অথবা যদি সম্ভব হয়, তবে খোসাটাকেও অনস্তিত্ব করিয়া ফেল—অথবা খোসাটাকেও শাঁশ বানাইয়া লও। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" দেখ, খোসাটা আর খোসা রহিলনা—খোসাটা শাঁশ হইয়া গেল। সাধকের দৃষ্টি ব্রহ্মে। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তিনিই ভূমা, তিনিই মহান্, তিনিই রস স্বরূপ তৃপ্তির হেতু, তাঁহাকেই জান, তাঁহারি বিষয় চিন্তা কর, তাঁহাকেই নিদিধ্যাসন কর। সংক্ষেপে উপনিষদের ধর্ম্মটা এই। দিগ্‌দর্শনের কাঁটার ন্যায় জীবন একদিকে চেয়ে আছে। আর কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

এই মহাযুগের পরে আর একটা যুগ আসিল। ভারতের আবহাওয়ায় জীবনটা আর সুখ ও মধুময় নহে। বহির্জ্জগৎ ক্লেশে পরিপূর্ণ। অন্তর্জ্জগৎ ক্লেশে পরিপূর্ণ। জীব ক্লিষ্ট—জীবন ক্লিষ্ট। দৃষ্টি নিরাশায় পূর্ণ। এই ভাবটাকে পাশ্চাত্যেরা Pessimism বা "নিরাশবাদ" বলেন। কিন্তু ধর্ম্মজগতে Pessimism বা নিরাশবাদেরও একটা স্থান আছে। জাগতিক Optimism বা "মজাবাদে" হয় না। প্রাণটা যতক্ষণ নিরাশার ভারে দাবিয়া না পড়ে, ততক্ষণ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হয় না। ইহাই আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—ইহাই আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা। ঐ Pessimistic বা নিরাশবাদী যুগে জীবের ক্লেশ দেখিয়া এক জনের প্রাণ জাগিয়া উঠিল, একজনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কপিলবস্তুর রাজনন্দন ক্লিষ্ট জীবের ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ সাধনার্থ নির্গত হইলেন। নির্ব্বান জিনিসটা কি, তাহা আমরা বদ্ধ জীব কি করিয়া বুঝিব? নির্ব্বাণকে অনেকে অস্তিত্বহীনতা বা annihilation মনে করেন। কিন্তু যতটুকু আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে পারি, তাহাতে অস্তিত্বহীনতাকে নির্ব্বাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। আমার বোধ হয় নির্ব্বাণ তৃষ্ণার নিবৃত্তি—নির্ব্বাণ প্রেমের স্ফূর্ত্তি। তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি জন্মে—প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্ম—কর্ম্ম হইতে বন্ধন। তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হইল—প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে বিলীন হইল—কর্ম্ম গেল—বন্ধন গেল। এটা নির্ব্বাণের একটা দিক। নির্ব্বাণের আর একটা দিক আছে, সেটা প্রেমের স্ফূর্ত্তি। তৃষ্ণায় অহমিকা আছে। অহমিকা অহেতুকী প্রেমের বৈরী। অতএব নির্ব্বাণ ভিন্ন প্রেম অসম্ভব। একটা আকর্ষণের নামই প্রেম নহে—প্রেম আর এক জিনিস। ঐ মেয়েটী সুন্দরী বা সুশীলা। তুমি ঐ মেয়েটীকে ভালবাসিতে চাও। কেন? তৃষ্ণা প্রযুক্ত—আকর্ষণ প্রযুক্ত। তাহার সৌন্দর্য্য মাধুরী বা চরিত্রের অমিয়তা তোমাকে পাগল করিয়া রাখিয়াছে। তুমি তৃষার্ত্ত, তোমার অহমিকা তৃষ্ণায় ছট ফট করিতেছে। কিন্তু যখন তুমি নির্ব্বাণ সাধনে সিদ্ধ হইলে, তখন তোমার তৃষ্ণা গেল, অহমিকা অহংশূন্য হইল। তখন তুমি আর তোমার জন্য তাহাকে ভালবাসিবে না। তখন তোমার ভালবাসার অভিপ্রায় তার ক্লিষ্ট জীবনটাকে মিষ্ট করা, মিষ্ট জীবনটাকে সুখী করা। ইহাই নির্ব্বাণ মন্ত্রের সার তত্ত্ব। তৃষ্ণার বিরতি—প্রেমে রতি। কিন্তু সে রতিতে অনুমাত্রও আত্মত্ব নাই—অনুমাত্রও আপনার দিকে টান নাই—সম্পূর্ণ অহেতুকী। এ সাধনে কে কে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। আমরা বদ্ধজীব—তৃষার্ত্ত—প্রবৃত্তির পথে চলি। এ সাধন সম্ভব কি না, তাহাও বুঝিতে পারি না।

উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মমুখী ছিলেন। কেবল তাঁহাকে জান। জগৎ ও জীব থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। দৃষ্টি শুধু একমেবাদ্বিতীয়মের দিকে। বুদ্ধ জীবমুখী হইলেন। জীবের ক্লেশ অক্লেশে পরিণত কর, জীবে দয়া কর—জীবে

দয়া কর—জীবে দয়া কর। ইহাই নির্ব্বাণের প্রচার মন্ত্র ছিল। ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহা ভাবিবার, বা সে কথাটা প্রচার করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার সমস্যা জীব—জীবের কষ্ট দূর হইলেই তাঁহার নির্ব্বাণ সাধন সার্থক হইবে।

পাঠক, এখন একবার খ্রীষ্টের দিকে এস। বৈদিক, ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধ ত্রিবিধ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব খ্রীষ্টে একাধারে দেখিতে পাইবে. বৈদিক ধর্ম্ম জীবনবাদী ছিল, আমরা খ্রীষ্টে সেই জীবনবাদ দেখাইয়াছি। বৈদিক জীবন জড়ে জড়িত, ঐ জড়ের মধ্যে জীবনময় দেবতাকে দেখা। খ্রীষ্ট এ ধর্ম্মের প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি জগতে একটা দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত করিতে আসেন নাই। তিনি সামান্য সূত্রধর-তনয় ছিলেন। যেরুশলেমের কোন ইহুদীটোলে বা রোম সাম্রাজ্যের কোন গ্রীক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। বিশ্বটাই তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সাধারণ চক্ষে যে জড় ও জীবকে দেখিতেন, সাধারণ ভাবে তাহাদের অস্তিত্ব মানিতেন। জড় ও জীবকে অনস্তিত্বের জলে ডুবাইয়া দিয়া নিরলম্ব ভাবে তিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক ঋষিদের ন্যায় জড়েই দেব দর্শন করিতেন — জড়েই জীবনের লীলা দেখিতেন। গাছের ফুল, ক্ষেতের শস্য, অরণ্যের পাখী তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিত।

জড়ে জীবন মানা ও জড়কে জীবনের উৎস মানা, এক কথা নহে। খ্রীষ্ট বলেন, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God" মূল গ্রীক অনুসারে "Except a man be born from above" মানুষের দ্বিজত্ব বা নবজীবন লাভ একটা আধ্যাত্মিক রহস্য। কিন্তু সাধক জীবনে এটা একটা বাস্তব কথা নবজীবন লাভ না করিলে আমাদের চক্ষুর্দ্বয় খোলে না, আমরা প্রকৃতিতে দেব দর্শন করিতে পারি না। এই দ্বিজত্ব লাভ না করিলে আমাদের অন্তশ্চক্ষুও খোলে না, আমরা "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" রজরহিত, কলারহিত পরব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ দেখিতে পারি না। কিন্তু এই নবজীবনের উৎস কোথায়? "Except a man be born *from above*" এ জীবনের উৎস উর্দ্ধে। উর্দ্ধ হইতে জন্ম গ্রহণই নব জীবন লাভ। বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি একটা পৌরাণিক আখ্যান হইতে পারে; কিন্তু যে পুণ্যতোয়ায় পাপী তরে যায়, পতিত মানুষ নব জীবন পায়, তাহার উৎস উর্দ্ধে—বিষ্ণু বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মপদে *। যখন ঐ উৎস হইতে জীবনধারা জাগতিক জীবে এসে গেল, তখনই তার আধ্যাত্মিক নব জন্ম লাভ হইল। এই নব জন্ম পেয়ে যে দিকে দেখ, জীবনই জীবন দেখিতে পাইবে—সমগ্র বিশ্বজীবনে উবছে পড়িবে। জীবনে বন্যা আসা চাই—বন্যা উপর হইতে আসে।

অতএব উপনিষদের ঋষিগণের ন্যায় খ্রীষ্টও উর্দ্ধমুখী ছিলেন। জড়ে জীবন আছে কিন্তু জড় জীবন নহে, জীবনের উৎস উর্দ্ধে তিনি আপনার সত্তা, আপনার অস্তিত্ব উর্দ্ধে উপলব্ধি করিতেন। "No man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man, which is in heaven." খ্রীষ্টানেরা এই প্রকার উক্তিগুলিকে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তিনি ঈশ্বর হউন বা মানুষ হউন, তিনি এই উক্তিতে আপনাকে Son of man বা মনুষ্য-তনয় বলিতেছেন। এই মনুষ্য-তনয় পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া আপনাকে স্বর্গস্থ বলিতেছেন। কেন? একত্ববোধে। তিনি আপনাকে কঠোপনিষদের ঋষিদৃষ্ট "উর্দ্ধমূল অশ্বত্থের' ন্যায় মনে করিতেন। পিতা হইতে নিঃসরিত—অধঃপানে আসিয়াছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে—পিতায় স্থিত। উপনিষদের ঋষি যেমন একত্ব সাধনের চরম সোপানে পদার্পণ পূর্ব্বক "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলেন, খ্রীষ্টও তেমনি "I and my Father

* বিষ্ণু ব্যাপকার্থক বিষ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই অর্থে কঠোপনিষদের তৃতীয়া বল্লীতে বিষ্ণুপদের ব্যবহার দেখিতে পাই।

are one" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলেন। "আমি ও আমার পিতা এক"—ইহা একত্ব-বোধক, কিন্তু অদ্বৈতবাদ নহে। ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলিতে চাও বল—এটা সাধক জীবনের অভিজ্ঞতা, দার্শনিক তর্কসিদ্ধ মত নহে। তিনি অনন্ত, আমি সান্ত, তিনি ও আমি এক নহি—এ অর্থে দ্বৈতবাদ। কিন্তু যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই আমার ইচ্ছা, এ অর্থে অদ্বৈতবাদ। তাঁহার ও আমার দুই ইচ্ছা নাই। জীবনের স্বাতন্ত্র্য পৃথক ইচ্ছায় হয়। যখন ইচ্ছাটা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পণ করা হইল, তখন আর নিজত্ব কোথায় রহিল? তখন "দগ্ধেন্ধন মিবানলম্" হইয়া গেল। ইন্ধন আছে, কিন্তু ঐ দগ্ধ ইন্ধনে অগ্নিই দেখা দিচ্ছে—দ্রষ্টা আগুনই আগুন দেখিতেছে। যদি ইন্ধনের আত্মবোধ থাকিত, তবে সেও বলিত, আমি আর কাঠ নই, আগুন। তেমনি I and my Father are one. সত্তায় পৃথকত্ব থাকিলেও অনুভূতিতে একত্ব। এই অনুভূতি বশতঃ এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "He that hath seen me hath seen the Father" "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে।" আমার কিছুই নাই। পিতার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, পিতার প্রেম আমার প্রেম, পিতার পুণ্য আমার পুণ্য, পিতার কার্য্য আমার কার্য্য—আমি সেই ঊর্দ্ধস্থ জীবনের উৎসে পরিপূর্ণ। ঐ তোমার গৃহ সম্মুখে যে প্রবাহিত গঙ্গাজল দেখিতেছ, তাহা গোমুখী পর্ব্বতেরই জলধারা। আমাতে যে জীবন দেখিতেছ, তাহা জীবনাধার পিতার জীবন। এই জীবন দেখ, সে জীবন টের পাবে। এই একত্ববোধের চরম পরিণতি "Thy will be done"এ। আমার নহে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ক্রুশে আপনাকে বলিদান পূর্ব্বক খ্রীষ্ট আপনার এই একত্ব-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

খ্রীষ্ট বৈদিক ঋষিগণের ন্যায় জীবনবাদী ছিলেন। উপনিষদের ঋষিদের ন্যায় ব্রহ্মমুখী ছিলেন। তিনি "ঊর্দ্ধমূল অশ্বত্থের" ন্যায় আপনাকে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত ও ব্রহ্মে স্থিত অনুভব করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব ঈশ্বরে ডুবিয়া গিয়াছিল, "দগ্ধেন্ধন মিবানলম্" বৎ তাঁহার মনুষ্যত্বে ঈশ্বরই ঈশ্বর দৃষ্ট হইতে-ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে identify হইয়া গিয়াছিলেন। এই ভাবটাকে চাই অদ্বৈতবাদ বল, চাই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বল, তোমার অধিকার আছে। এটা ভারতীয় ভাষায় সাধক জীবনের উচ্চতম অভিজ্ঞতা।

কিন্তু খ্রীষ্টের ভাষায় ইহাই উচ্চতম অভিজ্ঞতা নহে। এ অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা আর একটা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সেটা জীবের সঙ্গে একত্ববোধ—পতিত মানুষের সঙ্গে আপনাকে identify করা। বুদ্ধ জীবমুখী হইয়া এই ভাবের সাধন করিয়াছিলেন। জীবকে অস্বীকার করিয়া শুধু ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম্মের আধখানা মাত্র। আবার ঈশ্বরকে ধর্ম্মরাজ্যে না আনিয়া শুধু জীবমুখী হইয়া নির্ব্বাণ মন্ত্র প্রচার করাও ধর্ম্মের আধখান। খ্রীষ্ট এই দুই অর্দ্ধ মিলাইয়া ধর্ম্মকে পূর্ণ কলেবর প্রদান করিয়াছেন।

ঈশ্বর কোথায়? ঐ মেঘের উপর সুদূরস্থ কোন ঠাঁই? না, তাহা নহে। "ভূতেষু—ভূতেষু" হাঁ, ভূতে ভূতে তিনি আছেন। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে"—হাঁ, সেখানেও তিনি আছেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তোমাকে আর এক স্থানে ব্রহ্মদর্শন করাইতে চান। সে স্থানটা ক্লিষ্ট পতিত নরে। ঐ যে অসংখ্য নরনারী পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া হা হুতাশ করিতেছে, ব্রহ্ম উহাদেরই মধ্যে। আকাশে, স্বর্গে Angels বা দূতগণের মধ্যে মহামহিমা-ময় ব্রহ্ম থাকিতে পারেন, কিন্তু সেথায় আমার চর্ম্মচক্ষুর প্রবেশাধিকার নাই। আমি আমার ঈশ্বরকে কাছে দেখিতে চাই। খ্রীষ্ট ঐ পতিত নরনারীদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাইতেছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবলে ওরা ঈশ্বরের প্রতিরূপ (image of God)—বৈদান্তিক বলেন, ওখানে ব্রহ্মের মায়াবদ্ধ প্রতিবিম্ব। প্রতিরূপ হউক বা প্রতিবিম্ব হউক, এ জগতে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান ঐ প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব দ্বারাই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এ কারণ যে মানুষটা মানুষের

সঙ্গে যে পরিমাণে একত্ব বোধ করিতে পারে —যে পরিমাণে আপনাকে identify করিতে পারে, সে মানুষটা সেই পরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। ঐ যে ক্লিষ্ট মানুষ তোমার দ্বারে ক্ষুধায়, পিপাসায়, রোগে, শোকে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, যদি তোমার চক্ষু থাকিতে তাহাকে তুমি দেখিতে না পাও বা দেখিতে না চাও, তবে কেবল চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে বসিলেই কি তাঁহার দর্শন পাইবে? সম্ভবতঃ ধ্যানে তুমি যাহা দেখিতেছ, ওটা তোমার কল্পনার ছবিমাত্র। এ কারণ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কেবল ঊর্দ্ধমুখী হইলে হইবে না, তোমাকে জীবমুখী হইতে হইবে। স্বর্গের সিঁড়ি উপরের দিকে নয়, নীচের দিকে।

মানুষ মানুষকে কখন্ পূজা করে? যখন মানুষ মানুষের সঙ্গে সহানুভূতি দেখায়। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কেহ তাঁহাদের পূজা করিয়াছিল কি না জানিনা। কিন্তু শাক্য মুনির শত নিষেধ সত্ত্বেও দেশটা তাঁহার মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কেন? বুদ্ধ জীবমুখী ছিলেন, এ জন্য। জগৎ আজ সূত্রধর-তনয় যীশুকে কেন পূজা করিতেছে— চাই পূজায় ভ্রান্তিই থাকুক না কেন? সূত্রধর-তনয় যীশু জীবমুখী ছিলেন বলিয়া,— তিনি পাপী তাপী নরসঙ্ঘে পিতার মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন বলিয়া—তিনি মানুষের সঙ্গে আপনাকে identify করিয়াছিলেন বলিয়া। খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে "God-man" বা "ঈশ-নর" বলে। সত্য সত্যই তিনি God-man বা ঈশ-নর ছিলেন। তাঁর জীবন একদিকে ঈশে ডুবিয়াছিল,অপরদিকে নরে ডুবিয়াছিল। তাই তিনি ঈশ-নর বা "নরহরি" হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ঈশে ডুবিয়া ঈশসঙ্গে একত্ব বোধ করিতেন, আবার নরে ডুবিয়া নরের সঙ্গে একত্ব বোধ করিতেন। নরের দুঃখ, নরের পাপ, নরের তাপ নিজ প্রাণে উপলব্ধি করিতেন। তাই তাঁর নাম পড়িয়াছিল "the Man of sorrow"—শোকের মানুষ। আমরা স্বার্থপর জীব, আপনা লইয়া থাকি, আমরা তাঁর নরের সঙ্গে ঐ একত্ব-বোধ বুঝিতে অক্ষম। ক্লিষ্টের সঙ্গে ক্লিষ্ট হওয়া, নিজে বিশুদ্ধ হইয়া পরের পাপে আপনাকে অশুচি বোধ করা, এ এক আশ্চর্য্য তত্ত্ব। নির্ব্বাণতত্ত্ব এক্ষেত্রে পরিণাম তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। পিতাকে বলিতেন "আমি নহি, তুমি"—মানুষকে বলিতেছেন "তুমি নহ, আমি।" ঐ পাপটা তুমি কর নাই। আমি করিয়াছি—তোমার অপরাধ আমার অপরাধ—তোমার প্রায়শ্চিত্ত আমার প্রায়শ্চিত্ত। খ্রীষ্ট অপরের পাপের জ্বালায় জ্বলিতেন—পরের নরক নিজ প্রাণে ভোগ করিতেন। ইহারই নাম vicarious suffering বা বদলে দুঃখ ভোগ। এই দুঃখ তাঁহাকে ক্রুসে বলীকৃত করিয়াছে। সে বলিদানের অর্থ কি, তাহা আমি জানি না। এ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার যে সব অর্থ করিয়াছে, সে সব কল্পনা ও জল্পনা অনুমান মাত্র। ঐ কল্পনা ও জল্পনা কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা, তাহা আমি জানি না। যে যে ভাবে চাহুক, ঐ ক্রুশতত্ত্ব গ্রহণ করুক। সাধক ও তত্ত্বে অন্ততঃ একটা জিনিস দেখিতে পান, সে জিনিসটা "প্রেম।" প্রেমের খাতিরে যীশু প্রাণ দিয়াছেন—প্রেমের বুক খুলিয়া তিনি ডাকিতেছেন:—

"Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light"

পাঠক এস। এই আহ্বানকারীকে লইয়া একবার সাধন ক্ষেত্রে ব'স। জড়ে দেবদর্শন কর, প্রাণে ব্রহ্মদর্শন কর, মানুষে আপনাকে বলি দাও।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

আমাদের শিক্ষা ও জীবন-সংগ্রাম।

শিক্ষা সম্বন্ধে দেশময় একটা মহা সোর-গোল উঠিয়াছে। দেশের লোক কেবলই বলিতেছে, "শিক্ষা যে আমরা কিছুই পাইতেছি না, কোনও দিকেই যে বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদিগকে কিছুই দিতেছে না। আমরা যদি উদরান্নের সংস্থানেও অক্ষম হইলাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনী-স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির অশন-বসনের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিতে না পারিলাম, তবে কোথায় আমাদের শিক্ষা?"

কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব। কিন্তু মনুষ্যত্ব গ্রাসাচ্ছাদনের হিসাবকে বাদ দিয়া নয়। সংসারীর পক্ষে সদুপায়ে সংসার নির্ব্বাহের সকল প্রকার উপযুক্ততাই মনুষ্যত্ব। বিশেষতঃ উদরান্নের চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইতে না পারিলে কিছুতেই মানুষ মানুষ হইতে পারে না, কোনও উন্নত চিন্তায় মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। এমন কি, মানুষ পশু হইয়া উঠে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন যে এত মনস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, আর এখন যে তেমন হইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ সমূহের মধ্যে জীবিকানির্ব্বাহের প্রশ্ন অন্যতম। বর্ত্তমান বিপদরাশি দ্বারা যদি ভারতের উন্নতির শ্রেষ্ঠ যুগ জর্জ্জরিত থাকিত, তবে একত্রে এত মনস্বীর আবির্ভাব সম্ভব হইত কি না, ঘোর সন্দেহের বিষয়। সেই মনীষিবৃন্দের ন্যায় প্রতিভা সহস্র নরনারীর মধ্যে আজও যে নিহিত না আছে, এমন নয়, তবে Chill Penuryতে তাহাদের genial current of the soul প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বকার সুখ স্বচ্ছন্দতা দেশে বিরাজমান থাকিলে আরও কত জগদীশচন্দ্র, কত প্রফুল্লচন্দ্র, কত রবীন্দ্রনাথ পাইয়া আমরা অধিকতর সৌভাগ্যশালী হইতে পারিতাম।

শিক্ষা এ যাবত কি করিয়াছে এবং কি করিতে পারে, কোথায় আমাদের অভাব, এ সবই বর্ত্তমানে চিন্তনীয় বিষয়। শিক্ষা হাত, পা, মস্তিষ্ক এবং হৃদয় খুলিয়া দিতে না পারিলে তাহা আর শিক্ষা হয় না। অর্থাৎ তিনটী Hএর উপর শিক্ষা নির্ভর করে, যথা, Head, Heart ও Hand. দেখিতে হইবে, ইহাদের ভিতর আমাদের কোন্‌টীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভাব। প্রথম দুইটী সম্বন্ধে যেমনই হউক, শেষটীর শিক্ষা আমরা আদৌ পাই নাই। আমরা এইটীকে বাদ দিয়া কেবল মুখের কথায় চিঁড়া ভিজাইয়া দিন কাটাইতেছি। ফলতঃ আমরা সংসারের জন্য প্রস্তুত হইয়া কেহই শিক্ষামন্দির হইতে বাহির হইতেছি না। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, আমাদের শিক্ষা না চলে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আদর্শে, না চলে আধ্যাত্মিক সভ্যতার আদর্শে। আমরা না করি ইহকালের সেবা, না হই পরকালের জন্য প্রস্তুত। ভগবান সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই যেন ঠেকিয়া বাঁচিতে হইতেছে। আমাদের শিক্ষায় না আছে অর্থের চেষ্টা, না আছে জ্ঞানের চেষ্টা। বীণাপাণির উদ্দেশ্যে আমাদের বীণাপাণির অর্চ্চনা নয়; চাকুরীর উদ্দেশ্যেই বীণাপাণির সেবা, যেমন অনেকস্থলে কালীপূজার উদ্দেশ্যে পাঠা না হইয়া, পাঠার উদ্দেশে কালীপূজা হয়। সুতরাং বীণাপাণির অধিষ্ঠান ও আমাদের পূজার পরিমাণেই হইয়া

থাকে। এইত জ্ঞানের কথা। তারপর অর্থ। বর্ত্তমান শিক্ষাকে অনেকেই অর্থকরী বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারে যে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের শিক্ষা অর্থ বহন করিয়া আনিতে পারে কি? অভাব মোচন করিতে পারে কি? বরঞ্চ বলা চলে ইহা "দাসকরী," ইহা দাস সৃষ্টির কল, এই নির্জ্জীব পদার্থ টাই শিক্ষা সৃষ্টি করিতেছে মাত্র। ইংরেজ এদেশে তাহাদের প্রয়োজনানুসারে কতকগুলি কেরাণী সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা দেখিলাম, স্কুলকলেজ হইতে বাহির হইয়াই এক একটা চাকরী পাইতেছি। দেশের তদানীন্তন অবস্থায় জীবিকার ভাবনাও বিশেষ ভাবিতে হইত না, যাহা পাইতাম, তাহা না পাইলেও বিশেষ আসিয়া যাইত না। ফলে এই দাঁড়াইল, আমরা বংশানুক্রমিক কেরাণী জাতিতে পরিণত হইলাম। চোক মেলিয়াই দেখিতাম, পিতাপিতামহ সকলেই কেরাণী, আমরাও বুঝিলাম, এইটাই জীবনের ব্রত। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বালকগণ যে বয়সে যেভাবে বড় হইয়া কখন কি নূতন কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিবে, এই ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার পৃথিবী হইতে কখন কি নূতন বস্তু আবিষ্কার করিবে, আমরা সে বয়সে ভাবিতে লাগিলাম, কখন ঐ চাকুরীর ফাঁস গলায় পরিয়া ধন্য হইব। মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা কিছু, তাহা পাশের ছাপ মার চাকুরীতেই ধরিয়াই লইলাম। চাকুরী চাকুরী জপ করিতে করিতে বড় হইয়া হাড়কাঠে মাথা গুঁজিয়া মনুষ্যত্বকে বলি দিতে চলিলাম। সমাজ-স্বদেশ-আত্মদৃষ্টি কোথায় ভাসিয়া গেল। শিক্ষাত এইখানেই আসিয়া চির নির্ব্বাণ লাভ করিল। উচ্চ ও নিম্ন, সকল শিক্ষাই পার্থক্যহীন হইয়া একাকার ধারণ করিল। চাকুরী ছাড়া উচ্চ শিক্ষারও কোনও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রহিল না। জ্ঞানচেষ্টা ও অর্থচেষ্টার যাহা কিছু উদ্দেশ্য, ইহাতেই চরিতার্থতা লাভ করিল। এইরূপে আফিম্‌-খোরের নেশায়, গরুর গাড়ীর ঢিমে তেতালা চালে পিতৃপিতামহাদিক্রমে একটা ঘৃণ্য আরামের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া এমন স্তরে পৌছিয়াছি, যেখান হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই কেরাণীগিরির মেসিনে তৈরী হইয়া জীবনীশক্তি একরকম হারাইয়া বসিয়াছি, রক্তের মধ্য দিয়া জাতির ভিতর সেই মোহ প্রবেশ করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনাশক্তি রহিত করিয়া দিয়াছে। জীবন-সংগ্রাম ক্রমেই কঠোর হইয়াছে। শিক্ষা কিম্বা বিদেশীর সংঘর্ষ, যে জন্যই হউক, দেশে বিলাসিতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে আফিসে আদালতেও বেজায় ভিড় বাঁধিয়াছে। চাকুরী আর জুটে না, জুটিলেও তাহাতে দিন গুজরায় না। দেশের গ্রাজুয়েটগণও অন্ন সংস্থানে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। ১৫, ২০, ২৫ টাকায় অনেকে চাকুরী করিতেছেন। আমি জানি, একজন গ্রাজুয়েট ১৫৲ টাকা বেতনের একটা আদালতের চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। আমরাত এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। শিক্ষা যদি এই হালেই চলিতে থাকে, আর দেশ শুদ্ধ লোক যদি এমন করিয়াই অভাবে মরে, তবে ছেলের বি-এ, পাশ অপেক্ষা সেই খরচের টাকায় পুঁজি দিয়া তাহাকে মুদীদোকানে বসানই অধিকতর সৎপরামর্শ বলিয়া মনে করি।

এমনভাবে একমুখী হইয়া আমরা গঠিত যে, এমন ছাঁচে আমাদের মন ঢালা যে, চাকুরীর দ্বার হইতে ফিরিয়া নিজের ভিতর

কোনও উপযুক্ততাই খুঁজিয়া পাই না। বড় জোর ওকালতি, কিন্তু সেখানেও ভিড়। তারপর একদিকে "পাশের" পেষণ এবং অন্য দিকে বয়স বৃদ্ধিতে উৎসাহ দমিয়া যায়, হতাশা ও হাহাকার আসে। আশ্চর্য্যের বিষয়, "বাবু" নাম কিনিবার এমন একটা মারাত্মক প্রলোভন আমাদের মধ্যে ঢুকিয়াছে যে, ঘরের ছেলে ঘরে যাইয়া, চাষীর ছেলে যে চাষ করিবে, তাঁতির ছেলে যে তাঁত বুনিবে, ব্যবসায়ের উন্নতিতে মনোযোগ দিবে, তাহাতেও দারুণ লজ্জা অনুভব করে! নির্দ্দোষ স্বাধীন জীবন যাপন অপেক্ষা পরাধীন ও ডানহাতে বাঁহাতে চুরিচামারির জীবনকে যে শিক্ষা বড় করিয়া দেখায়, তাহাকে শিক্ষা বলিতে লজ্জা হয় না কি? নিজ ব্যবসায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয়, সে কি সর্ব্বনেশে শিক্ষা! এমন ধারাত পৃথিবীর কোন দেশেই হয় না। বরঞ্চ পিতার দশমণের জমিতে লেখাপড়া শিখিয়া পুত্র বিশমণ জন্মাইতে পারিলে তবেত শিক্ষার সার্থকতা। বিভিন্ন দেশও চলিয়াছে এই ভাবেই। আমরা দেখিতে পাই, নানাদেশের লোক যতই শিক্ষিত হইতেছে, ততই ভগবানের সৃজন শক্তিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে বিশেষত্বহীন করিয়া ধরিবার চেষ্টায় স্বীয় ক্ষমতার অবিরাম নিয়োগে অর্জ্জিত শিক্ষাকে ধন্য করিতে চাহিতেছে। সে তুলনায় আমরা কোথায়, ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

উপায় কি? এবার ত বাতগ্রস্ত পাথরের মত ভারি হস্তপদগুলিকে চালনা করিতে না পারিলে সমগ্র জাতিটা উচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। এই যখন দেশের লোক বুঝিল, তখনই কথা উঠিল, শিক্ষাসংস্কার আরম্ভ কর কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য উন্নতি করিতে না পারিলে আমাদের এই সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু মরিতে বসিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাই কি করিতে পারিতেছি? আমরা ত সুবোধ, সবই বুঝি। এই অভাবের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে থাকিয়া আমরা বেশ বুঝি, আজ হয় টাকা ব্যয়ে এক জোড়া বস্ত্র না কিনিয়া নিজেরা সূতা কাটিয়া ও তাঁত বুনিয়া প্রত্যেক নিজ পরিবারের জন্য অনেক সুলভে বস্ত্র যোগাইতে পারি; আমরা বুঝি, দশ টাকায় যখন কেরোসিনের বাক্স বিক্রীত হয়, তখন বনে জঙ্গলে অযত্ন বিক্ষিপ্ত "রণা" অথবা "পুন্নাল" বীচি সংগ্রহ করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে মোটেই পয়সা খরচ হয় না; কিন্তু এই সব সুবিধার কথা ভাবিয়াও কি আমরা কোনও দিন গাঁটের পয়সা বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছি? অর্থ বাঁচাইবার কিম্বা অর্থোপার্জ্জনের যাহা কিছু উপায় আমাদের আছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিবারই বা চেষ্টা কোথায়? কিছুই যে করিতে পারি না। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে যদিও অনেক কথাই আসিয়া পড়ে, তথাপি মোটামুটি ভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, বহুপুরুষ যাবত পরের হাতে খাইয়াই আরাম বোধ করিয়া আসিতেছি। কাছারীতে যাওয়া আসা ছাড়া কলমপেশা ব্যতীত কিছু করি নাই বলিয়াই আমাদের কর্ম্মশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা আরামপ্রিয় হইয়াছি—এমন হইয়াছি, রাজার পালিত অলসপালের ন্যায় বিছানায় শুইয়া আগুনে পুড়িয়া মরিতে প্রস্তুত, তথাপি আত্মরক্ষার পথ দেখিতে রাজি নহি। তাই মনে-মুখে যাহা বুঝি ও বলি, কার্য্যতঃ ছুটি কেরাণীগিরিরই দিকে। দুপয়সা থাক আর না-ই থাক্, দেহান্তে সংস্কারবদ্ধ আত্মার মত আমাদের সংস্কারবদ্ধ মনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ চাকুরীর নেশাটাকে আর ছাড়িতে চাহে না। ইহারই জন্য অর্থ উপার্জ্জনের

ক্ষেত্রও নিজ হইতে রচিত হইতেছে না। আমাদের মধ্যে কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। দেশের ভিতর যথার্থরূপে কর্ম্মশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইলে বহুদিনের অবধারিত সভ্যতার standardটাকে বদলাইয়া ফেল—যে standard ধরিয়া লেখাপড়া-জানা চাষীর ছেলে' চাষ করাকে ঘৃণা মনে করে, তাহার সেই standardটাকে ভুল বলিয়া ধরাইয়া দাও।

শৈশব হইতে বহুদিন যেমন দাসত্বের ভাব, কেরাণীগিরির ভাব রক্তমাংসের সহিত মিশিয়া আসিয়াছে, তেমনই শৈশব হইতে স্বাধীনজীবিকার্জ্জনের ভাবকে রক্তমাংসের সহিত মিশাইয়া দিতে থাক। যাহাকে যেমন করিয়া পাইতে চাও, জীবনের প্রভাতেই তাহাকে তেমন করিয়া গড়িয়া তোল। ইহারই জন্য জনৈক মনস্বী বলেন, "Whatever you would like to introduce in a society, introduce in its school." এই স্থানের গঠনদ্বারাই সমাজ গঠিত হয়; সুতরাং সাবধানতার সহিত প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টি রাখিয়া মানুষ-গঠনের চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত কর।

চাই দেশের মনের মধ্যে একটা নেশা বা ঝোঁক ধরাইয়া দেওয়া, নিষ্ক্রিয় হস্তপদগুলাকে লজ্জিত করা, সকল আশঙ্কা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, সকল অক্ষমতার ভ্রম সংশোধন করা; আরো চাই, দেশের ধনী ও দরিদ্র সকলকে এক প্রণালীতে শিক্ষিত করা, তাহা হইলেই যৌথ কারবারে, কলকারখানায় ধীরে ধীরে দেশ ছাইয়া পড়িবে। শিক্ষার কাঠামটাকে চেহারাটাকে এমন করিয়া বদলাও, যাহাতে কেরাণীগিরির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইয়া স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের দিকে দেশের মনকে মাতাইয়া তোলে। আমার ত মনে হয়, বর্ত্তমান স্কুল কলেজ যতদিন থাকিবে, ততদিন কেরাণীগিরির অতিরিক্ত অন্য কোন ধারণাই আমাদের মনে জাগিবে না। ঐগুলোতে পা দেওয়া মাত্র যেন দাসত্বের মোহটা আমাদের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সুর সুর করিয়া উঠে। অতএব পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষি ও শিল্পশিক্ষা শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত কর। অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেসন্ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজনীয়। চাই হাতে কলমে শিক্ষা। বাগান তৈরী করাইয়া, জমিতে সোণা ফলাইবার উপায় দেখাইয়া, এক ছটাক আলুটাকে এক পোয়া করিয়া জন্মাইবার কৌশল শিখাইয়া, ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি যথাসম্ভব শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া নব শিক্ষার আয়োজন কর। বিদ্যালয়ের গ্রন্থের সংখ্যাও যদি কিছু কমাইতে হয়, কমাও। কৃষিশিল্পের কথা না তুলিলেও, যুবকদের মঙ্গল ও তৎসঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গল ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। ইউনিভারসিটির গ্রন্থভার স্কন্ধে চাপিয়া দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে বাধা দিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে—দেশের বলবীর্য্য, উদ্যম, উন্নতিকে বিনষ্ট করিয়াছে। অতএব সমগ্র মানুষটাকে পুঁথিতে আটকাইয়া নির্জ্জীব পঙ্গু করিয়া না রাখিয়া, তাহার মনকে কর্ম্মক্ষেত্রে ভাগ করিয়া দিতে পারিলেও দেশের এক মহোপকার সংসাধিত হয়। সভ্যতা রক্ষার পক্ষে লেখাপড়া যেমন প্রয়োজনীয়, শিল্পবাণিজ্যও তেমনই আবশ্যক। তবে উভয়বিধ শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলে এখন বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যেই লেখাপড়া আমাদিগকে "বাবু" বানায়, তাহাকে সংসারী হওয়ার শিক্ষা হইতে

স্বতন্ত্র করিলে আর উপায় নাই। ঐ আগুন দেখিলেই সংস্কার বশে আমরা পতঙ্গের মত হু হু করিয়া উড়িয়া পড়িব, আর মরিব। সুতরাং বাল্যে মানুষ গঠনের যে ব্যবস্থা করিব, তাহার সঙ্গে সংসারী শিক্ষার ভাজ রাখিতে হইবে। আমাদের সংস্কার পরিবর্ত্তিত না হইলে, সমুদয় দেশের মনের মধ্যে দৃঢ়তা বাঁধাইতে না পারিলে খালি খালি দু-চা'রটা কৃষিশিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াও তেমন লাভ হইবে না। দশবিশ জন লোক তাহাতে জুটিতে পারে? যেহেতু সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষেত্র পাওয়া যায় না, দেশের লোকের সহানুভূতি মিলে না। দেশের ধনীরা সুদের ব্যবসায় ধরিয়াই দরিদ্রদের হাড়মাংস চিবাইবে, এই সবদিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, অধঃপতনের এমন সীমায় আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি যে, বিদেশ হইতে বিবিধ শিল্পকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া জনৈক ভদ্রলোক ধনীদের সহানুভূতির অভাবে আইন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের এই দুর্ভাগ্যের কথা ভিন্ন-দেশের লোককে শুনাইতে মরমে মরিয়া যাইতে হয়। তাই বলি, সমুদায় দেশের মনকে গড়িতে হইলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিশিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত কর। বিরাট আয়োজন স্বতন্ত্র করিয়া যে দিকে যাহা হয় করিতে পার, আপত্তি নাই, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেসন পর্য্যন্ত এইটুকু আগেভাগে করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

৫ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা। দশ দেশের দশটা নজির দেখাইয়া কিছুই হইবে না। অন্যের আদর্শে আমাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। কারণ আমরা যে সব অবস্থায় দিনপাত করিতেছি, বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া দেখিলে অন্য জাতি তাহা হইতে অনেক অংশে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। ছাঁচে ঢালিয়াই মানুষকে ফুটাইতে পারা যায় না; তাহাকে বুঝিতে হইবে, চিনিতে হইবে। আর জগতের শিক্ষা ও জীবন সংগ্রামের শিক্ষা, কিন্তু আমরা কি সেই ছাঁচেই গঠিত হইতেছি? আজ চাকুরী গেলে কালই যে মরিতে বসি, জগৎ অন্ধকার দেখি।

দেশের যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, এই আসন্ন বিপদে যুবকদিগকে প্রথম বয়সেই সংসার প্রতিপালনের যোগ্য করিয়া দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে। এই গরীব দেশের অনেক পরিবারেই সংসাররক্ষার চেষ্টায় অবিলম্বেই ছেলের ডাক পড়িতেছে। সুতরাং দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষাটাকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া দাও। বলিতেছি না যে, উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিতে হইবে, তবে সর্ব্বসাধারণের জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাটা পূর্ব্বে করিয়া লইতে হইবে। তারপর আমরা দেখিতে পাই, পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দেয়, এমন ক্ষমতাও দেশের মুষ্টিমেয় পিতারই আছে। তথাপি দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কৃষি সকল বিভাগেরই জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা দরকার। রুচিভেদে ও অবস্থানুযায়ী শিক্ষার্থী যাহাতে আপন আপন পথ বাছিয়া লইতে পারে, যেরূপ সুযোগ হইতে কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। যাহাদের বিভিন্ন বিভাগে শক্তি আছে, তাহারা শক্তি ফলাইতে পারে, এমন ক্ষেত্র রচনাও করা চাই। ফলকথা, সর্ব্বসাধারণের খাওয়া পরার যোগাড়টা করিয়া, যাহার জন্য বিশেষ যাহা করিতে পার ভাল-ই। শিক্ষার দ্বারা দেশের লোক এইটুকুই চাহিতেছে। বাঙ্গালার সভ্যতা

রক্ষায়, ভারতের ইজ্জত রক্ষায় গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানই, টাকাই আমাদের মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমাদের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, অভাবক্লিষ্টের উষ্ণ শ্বাসে বাঙ্গালার আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; নিঃসহায়ের অশ্রুবর্ষণে ধরণী বক্ষ অবসিক্ত হইতেছে; প্রতি বৎসর শত সহস্র নরনারী জঠর জ্বালায় ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে এবং কেহ কেহ বা শেষ আশ্রয় মৃত্যুর কবলে সকল বেদনার অবসান করিতেছে। মানুষের প্রাণে এ দৃশ্য কত আর বরদাস্ত হইবে! দেশকে বাঁচাও, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার উপায় উদ্ভাবন কর। অন্য জাতির শিক্ষা দীক্ষা যাহাই হউক, প্রাণে বাঁচিবার শিক্ষাই আমাদের শিক্ষা, বর্ত্তমানে একথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য কর।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

দর্শন।

বিশ্বরাজ, এই বিশ্বে, যাহা কিছু আছে,
তোমারে ভকতগণ সবাকার মাঝে
করেছেন দরশন; —বলেছেন তা'রা
ঔষধে বনেতে পুষ্পে ব্যাপ্ত বসুন্ধরা
আছ তুমি;—তাই ক্ষুদ্র লতার সম্মুখে
করে অবনত শির দীন হ'য়ে থাকে।
হে রাজেন্দ্র, মোর এই সামান্য জীবনে
তাই তো ভরসা, এই নিখিল ভুবনে
সমস্তের মাঝে যদি থেকে থাকো তুমি,
শুধুই আমাতে নাই?—এই কথা আমি
কেমনে মানিয়া ল'ব? তাই কহি পিতঃ,
তুমিও আমার মাঝে আছ বিরাজিত!
অন্ধ আমি, মূঢ় আমি তাই তো এমন
না হেরি আমার মাঝে ও রাঙ্গা চরণ।

শ্রীহিরণবালা সেনগুপ্তা।

স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী।

১৮৫২ অব্দে পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দগ্রামে প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহেশচন্দ্র চৌধুরী স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া প্রসন্নচন্দ্র অতীব মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক অনেক নির্য্যাতনও সহ্য করিয়াছেন। বাল্যকালে পাবনা এবং রাজসাহীতে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৭০ অব্দে রাজসাহী হইতে এণ্ট্রান্স পাস করেন, এবং সেই স্থানে অবস্থানকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গোপনে তাহার সভ্য মনোনীত হন। ক্রমে তাহা প্রকাশ পাইলে জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহা করিতে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা বন্দ করিলেন। এণ্ট্রান্স পাস করিয়া পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৮ অব্দে পুলিস বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কার্য্য প্রাণপণে অতীব সততার সহিত সম্পন্ন করেন, কখনও ঘুঁস লওয়া বা কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলম্ব করা

তাঁহার অভ্যাস ছিল না, সেইজন্য উচ্চতন কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। যখন যেখানে কাজ করিয়াছেন, সেই স্থান হইতেই সুখ্যাতি এবং প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন। এই বিভাগে কর্ম্ম করা কালে প্রাচীন হিন্দু সমাজের অন্ধ কুসংস্কারগুলি অবলোকন করিয়া সেই প্রাচীন সমাজের উপর তাঁহার বিরক্তি ও অনাস্থা হয় এবং অপর দিকে, তিনি যখন রংপুর জেলার নেলফামারী মহকুমার কোর্ট ইনেস্পেক্টর ছিলেন, সেই সময়ে সাধু মহাপুরুষ হরনাথ দাস মহাশয়ও সেইখানে সেরেস্তাদার ছিলেন। সুতরাং অতি সহজেই তাঁহার সহিত পরিচয় হয় এবং তাহার উন্নত আদর্শ চরিত্র, ত্যাগ ও নির্য্যাতনে-সহিষ্ণুতা দর্শন করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস এবং ভক্তি দৃঢ় হয়। ১৮৮৫ অব্দে দীক্ষিত হন। তাহার পর হইতেই নির্য্যাতনও আরম্ভ হয়। আত্মীয়গণ এই কথা শুনিয়া নানাপ্রকার ভৎর্সনা ও বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, এমন কি, ঘৃণা করিয়া কেহ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত করিতেন না বা চিঠি লিখিয়া সংবাদও লইতেন না। কিন্তু তিনি তাহাদের ভুলিতেন না, সর্ব্বদাই সংবাদ লইতেন। একবার বিদেশে কর্ম্মস্থলে তিনি নিজে ও বাসায় সকলে খুব পীড়িত হন, শুশ্রূষা করিবার কেহই ছিল না. চেষ্টা করিয়াও যখন লোক পাওয়া গেল না, অগত্যা তখন তিনি বাড়ীতে আত্মীয়দিগের নিকট সমস্ত বিবরণ লিখিয়া শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের একজনকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই আসিলেন না, বরং তাহার উত্তরে লিখিলেন "আপনি আপনার পায়ে নিজেই কুঠার আঘাত করিয়াছেন, এখন তাহার ফল একাই ভোগ করুন, আমরা কি করিব।" আর একবার কর্ম্মোপলক্ষে পাবনার কোন এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা ভোজন করিবার সময় তাঁহাকে পৃথক ঘরের বারান্দায় কলার পাতায় ভোজন করিতে দিয়া আপনারা পৃথক ঘরে ভোজন করিয়াছিলেন বিধর্ম্মী বলিয়া এক সঙ্গে আহার করিলেন না। আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক এইভাবে অনেক বার নির্য্যাতিত হইয়াছেন, তথাপিও তাঁহাদের ভোলেন নাই। জীবনে তাঁহার পরীক্ষারও অন্ত ছিল না, কিন্তু ভক্তবিশ্বাসী তাহা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কখনও মুহ্যমান হন নাই। ক্রমান্বয়ে তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার পত্নীগণ সকলেই অকালে ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। একে একে ৪টী পুত্র কন্যা অকালে ছাড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষে বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষিত পুত্রও যখন চলিয়া গেল, তাঁহার নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল না, ভগবানকে কৃতজ্ঞ অন্তরে ধন্যবাদ দিলেন "তোমার কার্য্য তুমিই করিয়াছ, ধন্য তুমি। পুত্রকে রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছ, আমি কেন বৃথ শোকার্ত্ত হইব. তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" তিনি অতীব দয়ালু ছিলেন, পর দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। যদিও ধনী ছিলেন না, তথাপি সাধ্যমত তাহা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেন। ভিখারীকে কখন বিমুখ করিতেন না। তিনি স্ত্রী শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ও তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগীও ছিলেন। গিরিধি বালিকা বিদ্যালয়ের অতীব

শোচনীয় অবস্থার সময়েই তিনি তাহার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া, গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য বৃদ্ধি করাইয়া তাহার বিশেষ উন্নতি বিধান করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কর্ম্মজীবন বড়ই ভাল বাসিতেন। নিষ্কর্ম্মে বসিয়া থাকা পছন্দ করিতেন না। অবসর গ্রহণের কিছুদিন পরেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া যায়, নিজে লিখিতে পড়িতে পারিতেন না। ৩।৪ বৎসর পরে একটী চক্ষু অস্ত্র চিকিৎসায় ভাল হইয়াছিল, তখন প্রায় ১ বৎসর বেশ লিখিতে পড়িতে পারিতেন, কিন্তু অধিক দিন থাকিল না, পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং বলিতেন, "চক্ষু থাকিলে এক জিনিষই বার বার দেখিতাম, নূতন কিছুই দেখিতাম না, সুতরাং আমার কোন দুঃখই নাই, তবে দয়াময় যদি বাহ্য দৃষ্টি লইয়াছ, অন্তরে যেন দেখা পাই।" তিনি অতি সদালাপী ও বিনয়ী ছিলেন, যে কেহ তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে ভোলেন নাই। অহঙ্কার বা পরিচ্ছদের তাহার কোন গর্ব্ব ছিল না, নিজেকে অতি হীন মনে করিতেন। যে বিভাগে কার্য্য করিতেন, ইচ্ছা করিলে অসৎ উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া সত্য পথ অবলম্বন করিয়া বিবেকের আদেশে চলাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং তদনুসারেই চলিতেন। যখন যে অবস্থায় থাকিতেন, ঈশ্বরভক্ত তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, সর্ব্বদাই বলিতেন "তুমি যাহা দেও, তাই ভাল, বিষাদের পাশে রেখেছে হরষ, আঁধারের পাশে আলো" "আমি বাছিয়া লব না তোমার দান" এই সঙ্গিতটী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। ইদানীং প্রায়ই রুগ্ন থাকিতেন, সেই জন্য এবার মাঘোৎসবে কলিকাতা যাইবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্ত ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। এক দিন আদেশ পাইলেন—"শরীর অসুস্থ হইবে বলিয়া উৎসবে যাইবে না? এই শরীর কি তোমার চিরদিন থাকিবে? উৎসবে যাও, সেখানে কত ভক্ত সাধু মহাপুরুষের সমাগম হইবে, তাঁহাদের দর্শন করিয়া তোমার ভক্তি বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি হইবে।" তজ্জন্য ১৪ই জানুয়ারী গিরিধি হইতে কলিকাতা গমন করেন, কিন্তু ২।৪ দিন মাত্র উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, সহসা ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে গিরিধি আসিবার সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত হইয়াছিল; তজ্জন্য গাড়ীও রিজার্ভ করা হইয়াছিল, কিন্তু সেই দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সাধু ভক্ত ৬৮ বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন নাই; শেষ মুহূর্ত্তে বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে ঈশ্বর স্মরণ করিতে বলেন, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"তাহা আর আমাকে বলিতে হইবে না, আমি তাঁহাতেই ডুবিয়া আছি।" অস্ফুট স্বরে 'দয়াময়' 'দয়াময়' উচ্চারণ করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র কর্ম্মকার।

দক্ষিণ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে যে সমস্ত মহাত্মা বাস করিতেন, তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে গুরুভক্তি এবং গুরুসেবার অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ, গুরুসেবা করা ও গুরু উপদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করা। গুরুকরণ না হইলে ধর্ম্মজগতে প্রবেশ লাভই করা যায় না। সেই বাল্য হিন্দু ধর্ম্মে পূজা করিতে বসিলেই প্রথমেই গুরুর ধ্যান করিতে হয়।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

সেই জন্যই যতক্ষণ পর্য্যন্ত নারদ আসিয়া ধ্রুবের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াছিলেন, ততক্ষণ এত কঠিন সাধনেও নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন দেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মের মতে গুরুই ব্রহ্ম। স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধককে কৃপা করেন এবং সাধু সঙ্গরূপ তরণীর সাহায্যে ভবসাগর উত্তীর্ণ করিয়া দেন।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরং ধনং।
গুরুরেব পরঃকামো গুরুরেব পরায়ণম॥
গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ।
তস্মাৎ তদুপদেশো তস্মাদ্‌গুরুতরো গুরুঃ॥

গুরুসেবার একটী উদাহরণ এস্থানে দিতে ইচ্ছা হইতেছে। রামানুজের একটী শিষ্যের নাম দাশরথি—ইনি মহাপণ্ডিত। তিনি একদা রামানুজের নিকট গমন করিয়া গীতার চরম শ্লোকের রহস্য জানিবার জন্য আবেদন করিলেন। গীতার চরম শ্লোকটীই এই—

সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই শ্লোকের অর্থ অতি সহজ, কিন্তু দাশরথির মত মহাপণ্ডিত লোক ইহার অর্থ জ্ঞাত নহেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য আমিও ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, তবে এইটুকু জ্ঞাত আছি, বিনা সৎগুরুর কৃপায় আমরা যে গীতা পাঠ করি, তাহা অধুনা স্কুলের ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিবার অনুরূপ। কেহ কিছু বোঝে না, তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য গলাধঃকরণ করা মাত্র।

দাশরথির আবেদন শ্রবণ করিয়া রামানুজ বলিলেন—"তুমি আমার আত্মীয়, সুতরাং তোমার দোষগুলি আমার দৃষ্টিতে পড়িবে না। ঐ শ্লোকের অর্থ জানিতে হইলে সম্পূর্ণ নিরভিমান হওয়া প্রয়োজন এবং এক বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা বিধেয়, সুতরাং তুমি মহাত্মা' গোষ্টিপূর্ণের নিকট গমন করিয়া শ্লোকার্থ জ্ঞাত হও"। কিন্তু তাঁহার নিকট ছয় মাস কাল গতায়াত করিয়াও শ্লোকার্থ জ্ঞাত হইতে পারিলেন না। তৎপর একদিন গোষ্টিপূর্ণ বলিলেন, দাশরথে, তোমার এখনও কুলের অভিমান এবং বিদ্যায় অভিমান

রহিয়াছে, সুতরাং আমার নিকট শ্লোকার্থ পাইবে না—তুমি রামানুজের নিকট গমন কর। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি রামানুজের নিকট গমন করিয়া সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। সেই সময়ে রামানুজের গুরুকন্যা অণ্ডুলা তাঁহার নিকট আগমন করিয়া নিবেদন করিলেন যে, তাহাকে স্বামিগৃহে রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং দূরবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল আনয়নও করিতে হয়। এই সমস্ত কার্য্যে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় শ্বশ্রূকর্ত্তৃক অত্যন্ত ভৎসিত হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য রামানুজকে অনুরোধ করিলেন। তিনি সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অণ্ডুলাকে বলিলেন, "আমার এখানে অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, একজন যাইয়া তোমার রন্ধনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি দাশরথির প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র গুরুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দাশরথি এই রন্ধন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং ছয় মাস কাল এই দাসত্ব করিয়া মন হইতে একেবারে অভিমান দূর করিয়া দিলেন। পরে ঘটনাসূত্রে সমস্ত প্রকাশ হওয়ায় রামানুজের শিষ্যগণ তাঁহাকে গুরুর নিকট আনয়ন করিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলেন। তখন রামানুজ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্লোকার্থ দান করিলেন। আমি অতি সংক্ষেপে ঘটনাটী বর্ণন করিলাম, যদি কেহ এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে বাসনা করেন; তিনি যেন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দ-স্বামিকৃত রামানুজ-চরিত পাঠ করেন।

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দর্শন করিয়া তথা হইতে জম্বুকেশ্বর রওনা হইলাম। ইহা শিবের মন্দির এবং শ্রীরঙ্গনাথ হইতে প্রায় ১৷৹ মাইল দূরে। এই মন্দিরটীও অতি সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত, কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের ন্যায় বিশাল নহে এবং ততগুলি প্রকারবিশিষ্টও নহে। মন্দিরের ফটক পার হইবা মাত্র একটী বালক আসিয়া আমার পাণ্ডা হইবার বাসনা প্রকাশ করিল, সে বেশ ইংরাজী বলিতে পারে দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলাম। ফটক পার হইয়াই দেখিলাম, একস্থানে যজ্ঞ হইতেছে। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, পূজার নানাবিধ উপকরণ সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে। আমিও সেই স্থানে একটু উপবেশন করিলাম। মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় বলিলেও তামিল ভাষার উচ্চারণের সহিত মিশ্রিত বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর চারিদিক বেড়াইয়া বহুবিধ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। জম্বুকেশ্বর লিঙ্গ যে স্থানে স্থাপিত, সেই স্থানে একটী জম্বুক বৃক্ষ আছে, উহা পাথর ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছে। ইহা শিবের মন্দির, সুতরাং মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ বৈষ্ণবগণ প্রাণ গেলেও এই মন্দিরে প্রবেশ করেন না। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, বৈষ্ণবগণ কপালে শ্রীচিহ্ন ধারণ করেন, সুতরাং লিঙ্গ দর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে এক-জন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, শ্রীচিহ্নধারী বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ প্রাকৃতিক কার্য্য সমূহ সম্পাদন কালে কি প্রকার প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা জানিতে বাসনা হয়। শৈব বৈষ্ণবে দ্বেষাদ্বেষী বঙ্গদেশেও আছে, তবে মান্দ্রাজ প্রদেশের ন্যায় এতটা বাড়াবাড়ি নাই। আমি শুনিয়াছি, ঝড় বৃষ্টিতে রাস্তায় মৃত্যুর সম্ভাবনা হইলেও নিকটস্থ কোন শিব-মন্দিরে বৈষ্ণব প্রবেশ করিবেন না, আর শৈবের পক্ষেও ঐ প্রকার ব্যবস্থা।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমার পাণ্ডা মহাশয়কে একটী সিকি দিলাম, তিনি তাহাই পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমার গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

আমার বন্ধুটীর বাসস্থানের নাম টেপাকুলম্। মন্দির হইতে পুনরায় কাবেরী নদী পার হইয়া তথায় আগমন করিলাম। বন্ধুটী স্কুলে গিয়াছিলেন, সুতরাং স্কুলটী দেখিবার অভিলাষে তথায় গেলাম। স্কুলটীর নাম Tepaculum Hindu Secondary School, একটী তামিল ভদ্রলোক উহার মালিক। প্রায় ৪৫০ জন ছাত্র পাঠ করিতেছে। যে সময়ে স্কুলে পৌঁছিলাম, সেই সময়ে তাহাদের টিফিনের ছুটি হইয়াছিল। সমস্ত বালক নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত খাবার খাইতেছিল। এ সমস্ত খাবার তাহারা স্কুলে আসিবার সময় নিজেরাই লইয়া আসিয়া থাকে। সমস্ত বালকের মস্তকে লম্বা লম্বা চুল, পরিধানে কাছাবিহীন ধুতি এবং কপালে নিজ নিজ ইচ্ছানুমোদিত লম্বা লম্বা তিলক। কাহার তিলক ত্রিশূলাকৃতি, আবার কাহার তিনটী রেখা মাত্র। বঙ্গদেশের ছেলেরা ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে যেমন নিজ নিজ কৌলিক ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়ে, এদেশে দেখিলাম, তাহা হয় না। অধিকাংশ ছাত্রেরই জুতা পায় নাই, শিক্ষকদিগেরও জুতা নাই এবং তাহাদেরও কপালে লম্বা লম্বা ফোটা ও পরিধানে কাছাবিহীন ছোট ছোট ধুতি। স্কুলের কর্ত্তা ব্যক্তিও টিফিন সময়ে দেখিলাম, একটী নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসিয়া কিছু আহার করিতেছেন। আমাকে বিশেষ আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন। আমি কিছুক্ষণ আরামের পর সকলের নিকট বিদায় লইয়া আবাস অভিমুখে রওনা হইলাম।

এই টেপাকুলমের মধ্যস্থলে একটী ছোট পাহাড় আছে। প্রবাদ এই যে, বিভীষণ অযোধ্যা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার রথের চাকা এই স্থানে আটকাইয়া যায়।

Trichinopolyর নাম শ্রীশিরঃপল্লী, কিন্তু সাহেবদের অনুগ্রহে উহার প্রকৃত নাম গুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন Trichinopoly না বলিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। আমাদের দেশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বড় লোকদেরও নাম ঐ প্রকার বদলাইয়া গিয়াছে, ইংরাজী নামে না ডাকিলে তাহাদিগকে বুঝিতে পারা যায় না। সহরে সুন্দর পানীয় জলের কল আছে, কিন্তু পাইখানার ব্যবস্থা বড় সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইল না।

আমার বন্ধুটীর সুন্দর সুন্দর কন্যা কয়েকটীর নিকট বিদায় লইয়া রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীরঙ্গম হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ৪টার সময় Trichinopoly বড় ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, রামেশ্বর যাইবার গাড়ী রাত্রি ৯টার সময় পাওয়া যাইবে, সুতরাং waiting roomয়ে আশ্রয় লইলাম। আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ ছিল, সুতরাং নির্ভয়ে second class waiting room এ প্রবেশ করিলাম। নির্ভয়ে বসিলাম বটে, কিন্তু উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও দুইজন ইংরেজকে দেখিয়া ততটা নির্ভয় হইলাম না। কি জানি কখন কি ঘটে, মনে মনে ভাবিয়া গৃহের এক পার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। সাহেব দুইজন নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত, সুতরাং আমার দিকে লক্ষ্যও করিল না দেখিয়া একটু সাহস

হইল। তখন একটু ভাল করিয়া বসিলাম। তাঁহাদের কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম, তাঁহারা রেল-কর্ম্মচারী নহেন; গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী, সুতরাং রেলওয়ে সাহেবদিগের নিকট যেপ্রকার অভদ্রোচিত ব্যবহার ও হটকারিতা আশা করা যায়, উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীদিগের নিকট তাহা প্রায়ই ঘটে না। বসিয়া বসিয়া অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল। নিজের দেশ, চারিদিকে স্বদেশের সহস্র সহস্র লোক বিদ্যমান, অথচ বহু দূরদেশ হইতে আগত মুষ্টি-মেয় লোকের ভয়ে আমরা কি জড়ের ন্যায় বাস করিতেছি! এখন যদি ইংরেজের সহিত কোন কারণে আমার কলহ উপস্থিত হয়, আর এই ইংরেজ যদি আমাকে খুন করিয়াও ফেলে, তবু কেহই আমাকে সাহায্য করিতেও উদ্যত হইবে না!

সন্ধ্যার সময় কিছু আহারের অন্বেষণে বাহির হইলাম, Indian refreshment room আছে জানিয়া তথায় গেলাম, কিন্তু সেখানে কেহই আমার কথা বুঝিল না এবং আমিও তাহাদের কথা বুঝিলাম না, শেষে একজন ইংরেজীশিক্ষিত লোকের সাহায্যে হোটেলে আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইলাম।

হায় রে দুঃখ, আমিও ভারতবাসী, আর এই সমস্ত লোকও ভারতবাসী, কিন্তু কেহই কাহার কথা বুঝিনা। উভয়ের কথা বুঝিবার সাহায্য জন্য ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লইতে হইল। উত্তর-ভারতে প্রায় সর্ব্বস্থানেই কিছু হিন্দি ভাষা জানিলেই কোন প্রকারে চলিতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে তাহা প্রায়ই চলে না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দিভাষা প্রচলন পক্ষে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে কৃত-কার্য্য হইলে দেশের পক্ষে বড়ই মঙ্গলজনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা ঘটিবে কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশে Matriculation পরীক্ষায় একটু সংস্কৃত পড়িতে হয়, সুতরাং এই প্রদেশের বালকগণ হিন্দি অক্ষর পড়িতে পারে এবং একটু চেষ্টা করিলেই হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদে-শের পক্ষে ইহা একটু কষ্টজনক ও সময়-সাপেক্ষ।

রাত্রি ৮টার সময় হোটেলে আহারের জন্য গমন করিলাম। শুনিলাম, মোট তিন আনা দিতে হইবে। কেহ কাহার কথা বুঝে না, আমি কলের ছবির মত এক স্থানে বসি-লাম, একটী লোক আসিয়া আমার সম্মুখে কিছু অন্ন এবং একটু তরকারী দিয়া গেলেন। তরকারী মুখে দিয়া হা হুতাশ করিয়া পড়িলাম; তাহাতে এত অধিক পরিমাণে লঙ্কা মরিচ পড়িয়াছে যে, মুখে দেওয়া অসম্ভব। তদন্তর খানিকটা ঘৃত পাইলাম, সুতরাং তাহার দ্বারা আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ডাইলের তামিল কথাটা শিখিয়াছিলাম, সুতরাং পরপু পরপু বার বার বলাতে একটী লোক আসিয়া কি বলিল, বুঝিলাম না। অনুমানে স্থির করিলাম, ডাইল নাই। পরে জানিলাম, রাত্রে ডাইল দেওয়ার প্রথা নাই। অত-এব শুধু ঘৃতের সাহায্যে ক্ষুধা নিবৃত্ত করি-লাম, পরে কিন্তু একটু ঘোলও দিয়াছিল। যাহা হউক, আহার সমাপন করিয়া নগদ তিন আনা পয়সা দিয়া waiting roomএ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম এবং যথা সময়ে ট্রেণ আসিলে গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ীতে বেশ ভিড় ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যে একজন Boy থাকে, তাহার নিকট গমন করিবামাত্র, সে একটী কামরার উপরের

বেঞ্চ দেখাইয়া বলিল, আর স্থান নাই। সুতরাং একটু কষ্ট করিয়া উপরের Benchএ উঠিয়া শয়ন করিলাম এবং নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইলাম।

প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া সমুদ্রমধ্যস্থিত জলের উপরে কি মনোহর শোভাই ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া বলিলাম, হে সবিতৃদেব! তুমি কত কোটী কোটী যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই প্রকারে উদয়াস্ত দ্বারা কোটী কোটী জীবের ও স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তি ও বিনাশ সাধন করিতেছ, তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার। পূর্ব্বকালের ঋষি-যোগীগণ তোমাকে কত প্রকারে স্তব স্তুতি করিয়া গিয়াছেন—তোমাকেই জগতের প্রাণ বলিয়া উপাসনা করিয়া গিয়াছেন এবং তোমাকেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা ভাবিয়া তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। তুমি দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাক বলিয়া তোমাকে দেবমধু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু।

তুমি সর্ব্বযজ্ঞের ফলস্বরূপ। তোমারই প্রীতির জন্য দেবগণ সর্ব্ববিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। আমরা অজ্ঞান মনুষ্য, তোমার মধু বিদ্যা সম্যকরূপে জ্ঞাত নহি, সুতরাং তোমার উদয় ও অস্ত দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের পরমায়ু হরণ করিতেছ, কিন্তু শুনিয়াছি, এমন ব্রহ্মবিৎ আছেন, যাহার নিকট তোমার উদয়ও নাই, অস্তও নাই, সদা সর্ব্বদাই একই ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাক, কারণ তিনি নিজেই জ্যোতির্ম্ময়। হে সবিতৃদেব! তুমি আমাদের চক্ষুস্বরূপ, কিন্তু আমরা চক্ষু দ্বারা যে সমস্ত শুচি অশুদ্ধি পদার্থ দর্শন করিয়া থাকি, তুমি সে সমস্ত বস্তুতে লিপ্ত থাক না; তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার। সমুদ্রের সঙ্গে তোমার বড়ই সদ্ভাব, কারণ তিনি অকাতরে তোমাকে জলদান করিতেছেন, আর তুমি সহস্র জিহ্বা দ্বারা তাহা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া বৃষ্টিরূপে আমাদিগকে দান করিয়া আমাদের জীবন ধারণ করিতেছ। হে সবিতৃদেব, তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার। তোমার মধ্যস্থিত যে মহান পুরুষের শক্তিতে তুমি জগৎপূজ্য হইয়াছ, সেই মহান পুরুষকে দেখিবার শক্তি আমাকে দাও।

লোহিতবর্ণ সূর্য্য দেখিতে দেখিতে শুক্লবর্ণ ধারণ করিলেন, আর তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার শক্তি নাই। এমন সময় দেখিলাম, গাড়ী সমুদ্রোপরিস্থ বৃহৎ পুলের উপর উঠিয়াছে। এই পুল অতিক্রম করিলেই রামেশ্বরের দ্বীপে উপস্থিত হইব। এই পুলের বিবরণ লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, আজ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। দুই দিকে বিশাল সমুদ্র, উহার মধ্যস্থান দিয়া রেল গাড়ী অতি দর্পের সহিত ঘনঘটা-শব্দ করিয়া দৌড়াইতেছে—চক্ষু মোটে দুইটী, কোন্‌দিকে দেখিব, এদিক দেখিলে ওদিক দেখা যায় না, আবার ওদিক দেখিলে এদিক দেখা যায় না, ইচ্ছা হইতে লাগিল, গাড়ীখানা যদি এই স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া এই অভিনব দৃশ্যটী দর্শন করিয়া লইতাম। পুলের নিম্নে জলের মধ্যে অসংখ্য প্রস্তর, তাহার উপর দিয়া জল কল-কল ধ্বনি করিয়া যাইতেছে এবং ছোট ছোট মৎস্যগুলি মনের আনন্দে উল্লাইয়া যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ী সমুদ্রের অপর উপস্থিত হইল এবং পাম্বাম নামক

ষ্টেসনে দাঁড়াইল। এইস্থানে অসংখ্য নারিকেলের বাগান। মাদ্রাজের শর্ব্বানন্দ স্বামী এই স্থানের একজন ভদ্রলোকের নিকট আমার আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন। যথা সময়ে তিনি গাড়ীর নিকট আসিয়া আমাকে অভি-বাদন করিলেন। আমাকে চিনিয়া লইতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই, কারণ ঐ গাড়ীতে একমাত্র আমিই বাঙ্গালী ছিলাম। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া আমার সঙ্গে উহার পরবর্ত্তী ষ্টেসন রামেশ্বর পর্য্যন্ত গেলেন। ইতিপূর্ব্বে ত্রিচোনাপলি হইতে রামেশ্বরের একজন পাণ্ডা আমার পিছনে লাগিয়াছিল, তাহার দ্বারা আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি রামেশের না নামিয়া সেই গাড়ীতেই বরাবর ধনুষ্কোটিতে গমন করিলাম। উক্ত ভদ্রলোকটী আমার ব্যাগ ও অন্যান্ত দ্রব্য লইয়া নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং পাণ্ডার লোক আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। রামেশের হইতে ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত কেবল সমুদ্রের বালির চড়া। কলম্বোগামী জাহাজ এই ধনুষ্কোটি হইতেই রওনা হয়।

গাড়ী যতদূর যাইতে পারে, ততদুর যাইয়া থামিল এবং আমরাও নামিয়া পদব্রজে সমুদ্রের কূলে গেলাম। তথায় দেখিলাম, অসংখ্য লোক স্নান করিতেছে, পূজা করিতেছে এবং মন্ত্র পাঠ করিতেছে। পূজার সময় বালির উপর লক্ষ্মণের ধনুর চিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে। পূজার উপকরণ অতি সামান্ত, একটী নারি-কেল, একটু কর্পুর এবং ২।৪টা ফুল ও একটু ধুনা। সমস্ত দ্রব্য সেই স্থানেই খরিদ করিতে পাওয়া যায়। পুরোহিত মহাশয়গণ সকলেই একটু একটু হিন্দি বলিতে পারেন। আমি একটু মুস্কিলে পড়িলাম, পূজা করিব কি না করিব? ভাবিতে ভাবিতে আমার একটী বন্ধুর স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তিনি পুরীর জগন্নাথ দেখিয়া আমার বাসায় আসিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কত টাকার আটিকা বন্ধন করি?" আমি তাঁহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম—"আটিকা বন্ধন সম্পূর্ণ ফাঁকি—পাণ্ডাদের উহা একটী উপরি আয়। তবে বেশী টাকার আটিকা বন্ধন করিলে মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিতে হয় এবং সেই টাকা দ্বারা ঠাকুরের ভোগও হয়।" তিনি আমার কথা বেশ বুঝিয়া বলিলেন "আমি বেশ বুঝিলাম, আটিকা বন্ধন বৃথা, কিন্তু গ্রামে গেলে পাড়ার লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কত টাকায় আটিকা বাঁধিয়াছে, তখন কি উত্তর দিব? তাহারা তো এত ব্যাপার জানে না, আটিকা বন্ধন করিনাই শুনিয়া তাহারা যখন মুচকি হাসিয়া বিদ্রূপ করিবে, তখন আমার উপায় কি?" আমি তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আটিকা বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। এই ব্যাপার স্মরণ করিয়া আমিও সমুদ্রে স্নান করিয়া পূজার উপকরণাদি গ্রহণ করিয়া পূজা করিতে বসিলাম। মন্ত্র পাঠে বুঝিলাম, আর আমাকে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। কে জানে কি হইবে। পুনর্জ্জন্ম আছে কিনা, কে বলিতে পারে? কেহ বলেন "আছে, কেহ বলেন নাই," এপ্রকার অবস্থায় একটা নিশ্চিত ধারণা রাখা গর্ব্বের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কঠোপনিষদে নচিকেতা যম রাজাকেও এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"পরলোক আছে কি নাই।" তদুত্তরে তিনি তাহাকে বলেন, চিন্তাহীন এবং ধনমোহে আচ্ছন্ন অজ্ঞানীর নিকট পরলোক প্রকাশিত হয় না। তাহারা কেবল এই লোকই আছে,

কিন্তু পরলোক নাই, এইরূপ মনে করিয়া থাকে সুতরাং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়। তথা আপন আপন কৃত কর্ম্ম ও আপন আপন উপার্জ্জিত বিজ্ঞান অনুসারে কোন কোন আত্মা শরীর গ্রহণার্থ যোনিতে প্রবেশ করে, আবার অন্য কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমাদের মাথা ঘামান যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। তবে আমি এই সার কথাটুকু স্মরণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ যাহা থাকিলেও থাকিতে পারে, না থাকিলেও না থাকিতে পারে, এমত স্থানে থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহাই স্থির রাখা সঙ্গত।

পূজা সমাধা করিয়া পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া চারি দিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম, সমস্ত লোক কেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পুরোহিতের নিকট উপবেশন করিয়া পূজা করিতেছে এবং নানাবিধ দ্রব্য দান করিতেছে। আমার ন্যায় সন্দেহযুক্ত হইয়া ইহারা ক্রিয়া করিতেছে না, অর্থাৎ থাকিলেও থাকিতে পারে, এমত বিশ্বাস লইয়া পূজা করিতেছে না। ইহাদের দৃঢ় ধারণা, এই সমস্ত ক্রিয়া করিলে আর ইহজগতে পাপের বোঝা বহন করিতে আসিতে হইবে না। এক জন পণ্ডিত লোক বলিয়াছিলেন, তীর্থে স্নান ও ক্রিয়াকলাপ অন্ধ বিশ্বাসের সহিত না করিলে কোন উপকার হয় না, কারণ ইহার ফলাফল সমস্তই অদৃষ্ট, অর্থাৎ কেহই চক্ষে দর্শন করে নাই, এরূপ স্থলে ধর্ম্মগ্রন্থাদি-প্রতিপাদিত কোনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত ধারণ করিয়া রাখাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

সমুদ্র-তীর হইতে ষ্টেসনে আসিবার মধ্য-স্থানে বালির চড়ার উপর মহাবীরের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইবামাত্র এক ব্যক্তি সকলকে সমাদর করিয়া বসাইয়া মহাবীরের চরণামৃত, এবং মোহন ভোগ ও বুট ভিজান প্রসাদ দিতে লাগিলেন। যাত্রী-দিগের মধ্য হইতে প্রসাদ লইবার সময় কেহ এক পয়সা, দুই পয়সা প্রণামীও দিতে লাগিলেন। মাড়ওয়ারীদের মধ্যে কেহ কেহ বেশীও দিলেন। আমরা এই প্রসাদ পাইয়া তথায় অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, কারণ রামেশ্বর যাইবার গাড়ী ছাড়িবার অনেক বিলম্ব ছিল। মন্দিরটী নারিকেল পত্রের দ্বারা ছাউনি-বিশিষ্ট কিন্তু অনেক বড়, মধ্য-স্থলে মহাবীরের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে এবং তাহার পার্শ্বেই দুইজন সন্ন্যাসীর বসিবার স্থান। ইহারাই মঠের অধিকারী। মধ্যে মধ্যে বেশ গঞ্জিকা সেবন চলিতেছে। একজন সন্ন্যাসী বার বার আসিয়া উপস্থিত সকলকে বুট ভিজান প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমাদের প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি তাহা শুনিবেন না; সুতরাং উহা লইয়া পশ্চাৎ নিক্ষেপ করিতে হইল। এই মঠ থাকাতে যাত্রীদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে, কারণ স্নান ইত্যাদির পর পরিশ্রান্ত হইয়া তাহারা এই স্থানে বেশ একটু বসি-বার স্থান পায় এবং নির্ম্মল পানীয় জল পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী-দ্বয় কাহার নিকট কিছু চাহিতেছেন না, কিন্তু যাত্রীগণ সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু কিছু দান করি-তেছেন।

এই মন্দিরের মধ্যে হঠাৎ একটী বাঙ্গালী যুবক দেখিলাম। আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া নিকটে আসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার জন্মস্থান বসীরহাটে। যৌবনকালেই সংসার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন

করিয়া ভেক গ্রহণ করিয়াছেন। বৃন্দাবনে বাস করিতেন, সম্প্রতি গুরুর আদেশে পদব্রজে চারি ধাম ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে পুরী এবং পুরী হইতে পদব্রজেই এখানে আসিয়াছেন, এক্ষণে এই স্থান হইতে দ্বারকায় যাইবেন। গুরুবাক্যে কি বিশ্বাস এবং কি প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করিবার সঙ্কল্প!

যথা সময়ে মন্দির হইতে বাহির হইয়া ষ্টেসনে যাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় রামেশ্বরে পৌঁছিলাম। ধনুষ্কোটী হইতে রামেশ্বর প্রায় ২২ মাইল রাস্তা—ইহার মধ্যে কোন গ্রাম কি কোন প্রকার বড় বড় বৃক্ষ নাই, কেবলই বালিকারাশী দ্বারা পূর্ণ। গাড়ীর মধ্যে একটী বালক তামিল ভাষায় সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার গানের অর্থ বুঝিলাম না বটে, কিন্তু গলার স্বরটী অতি মিষ্ট লাগিল। অনেকেই তাহাকে ২।১ পয়সা ভিক্ষা দিলেন। সে আমাদের গাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গান আরম্ভ করিল। এই প্রকারে ধনুষ্কোটী হইতে রামেশ্বরে পর্য্যন্ত তাহার বেশ রোজগার হইল।

এই গাড়ীর মধ্যে বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে-ভূষিতা একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া স্থূর্পনখার স্মৃতি জাগরিত হইল। এ প্রকার স্ত্রীলোক আমি জীবনে দেখি নাই, যেমনি তাহার কাল রং, তেমনি তাহার শরীরের নানাবিধ অঙ্গ-সৌষ্ঠব। মস্তকের চুলগুলি ঝকড়া ২, চক্ষুটী ক্ষুদ্র, হস্তপদগুলি বেশ মোটা মোটা এবং সুগোল। সঙ্গে দাস দাসীও রহিয়াছে, সুতরাং বড় ঘরের কন্যা বা স্ত্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ষ্টেসন হইতে পাণ্ডার বাড়ী পৌঁছিলাম। তিনি অতি সমাদর করিয়া আহারের যোগাড় করিয়া দিলেন। তাঁহার মাতা স্বয়ং পরিবেশন করিয়া আমাকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। আহারাদির পর পাণ্ডা মহাশয় তাঁহার নিকট আমাকে বসাইয়া একখানি বাঙ্গালায় ছাপান ফর্দ্দ দিলেন। রামেশ্বর যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়, তৎসমস্ত সেই ফর্দ্দে উল্লেখ আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকার মধ্যে আপনি এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন? আমি বলিলাম, ঐ সমস্ত ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। সমস্ত দর্শন করিয়া এবং যেখানে যাহা দেওয়া প্রয়োজন, তাহা নিজেই দিব। আপনাকে প্রণামী কিছু দিব। তিনি আর বেশী কিছু বলিলেন না এবং আমাকে আর কোন যত্নও করিলেন না।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাণ্ডার দ্বিতল গৃহে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম, সুতরাং সেই স্থানে যাইয়া একটু শয়ন করিলাম। অপরাহ্নে উঠিয়া দেবমন্দির ও অন্যান্য স্থান দর্শন করিবার জন্য একাকী বাহির হইলাম; পাণ্ডার কোন লোককে সঙ্গে লইবার প্রয়োজন করিলাম না। মন্দিরের বড় ফটক পার হইয়াই দেখিলাম, তথায় বৃহৎ একটী বাজার বসিয়াছে! তথায় নানাবিধ খেলনা ছবি ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। জাপান ও চিনদেশে বাঁশের দ্বারা যেমন সুন্দর সুন্দর ব্যাগ, ফুলের সাজি ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এখানেও সেই প্রকারের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। দ্রব্য-গুলিতে বেশ নির্ম্মাণ-কৌশলতা আছে, কিন্তু মূল্য অতি কম। বাজারের দুই দিক হইতে বহু রাস্তা গিয়াছে। আমি কোন্ দিকে যাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, ভয় রহিল পাছে এই মন্দিরের মধ্যে হারাইয়া

যাই। দর্শনীয় কোথায় কি আছে, তাহাই বা নিজে নিজে কি প্রকারে জানিব? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানিবার উপায় নাই, সুতরাং পুনরায় বাসায় গিয়া পাণ্ডার লোকটীকে সঙ্গে করিয়া আনিলাম। তিনি আমাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া সমস্ত দেখাইলেন। বিশাল মন্দির, কোথায় কি আছে, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইলে অল্প সময়ের কার্য্য নহে। মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিবার হুকুম নাই, কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। পরে শুনিলাম,বিশেষভাবে প্রণামী দিলে নাকি ভিতরেও যাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতর অন্ধকার, তথায় নানাপ্রকারের দীপ জলিতেছে। বাহিরের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ঠাকুর দর্শন করিলাম। ভোগাদি যাহা কিছু দিলাম, তাহা নিকটস্থ একটী জলপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইল। শুনিলাম, অবশেষে সমস্ত একত্র করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইবে। যে স্থানে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করিতে হয়, সেই স্থলটী কাষ্ঠ দ্বারা ঘেরা রহিয়াছে।

মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে বিশাল প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃষ-মূর্ত্তি উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। প্রস্তরে কোন প্রকার জোড়া আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

মহাদেবের মন্দির হইতে ভগবতীর মন্দিরে যাইয়া তথায়ও ভোগের জন্য কিছু দিলাম। তারপর অন্যান্য দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলাম। তথায় বহু সংখ্যক প্রস্তর জলের মধ্যে ও উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বোধ হয় এই সমস্ত পাথরগুলিই মহাবীর হনুমান কর্ত্তৃক বহু দূর হইতে আনীত হইয়াছিল।

রামেশ্বর একটী বড় সহর নহে। সুতরাং সমস্ত গ্রামটী দেখিতে বেশী সময় লাগিল না। বাসায় প্রত্যাগমন কালে একটী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার সে দিন আহারের যোগাড় হয় নাই, সুতরাং সেদিনকার উক্ত ব্যাপার ভগবান আমার দ্বারাই সম্পাদন করাইলেন।

বাসায় আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলাম, তৎপর রাত্রি প্রায় ৮৷৷০টার সময় যে পাণ্ডা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, তাহাকে ডাকিয়া আমার আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রে কোন আহার পাইব না। অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, এক্ষণে উপায় কি? তাড়াতাড়ি হোটেলে গেলাম,শুনিলাম, সমস্ত শেষ হইয়াছে, আর কিছু পাইবার উপায় নাই। পাণ্ডার লোকটীকে বলিলাম, "বাপু! আমাকে কিছু লুচি কিম্বা পুরী খরিদ করিয়া আনিয়া দাও, নচেৎ ক্ষুধায় মারা পড়িব।" তিনি পয়সা লইয়া বাজারে গেলেন এবং অর্দ্ধঘণ্টা পর কতকগুলি চামড়ার মত শক্ত পুরী আনিয়া দিলেন। একে আমার দন্ত নাই, এবং যে ২।১ টী অবশিষ্ট আছে, তাহাতেও অত্যন্ত বেদনা,সুতরাং পুরীগুলি রাখিয়া দিলাম এবং পরদিন একটী দরিদ্রকে দান করিলাম। সে রাত্রে ভগবান ব্রহ্মচারির অন্ন আমার দ্বারা সংগ্রহ করাইলেন, কিন্তু আমাকে আর কিছু দিলেন না। যাহা হউক, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিলাম, এবং নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতে উঠিয়া কাফিখানায় গেলাম। এদেশে কাফি খাওয়ার বেশ ধুম ধাম আছে, রামেশ্বরে অনেকগুলি কাফির দোকান। সেখানে যাইয়া

সঙ্কেত দ্বারা কাফি চাহিলাম। ঘরটী অন্ধকার, কতকগুলি তক্তা পাতা আছে, তাহারই উপর উপবেশন করিবার অনুমতি পাইলাম। তৎপর একটী পিতলের গ্লাসে কাফি পাইলাম। পেয়ালার প্রথা দেখিলাম না। গ্লাসে মুখ লাগাইয়া পান করিবার যোগাড় করিতেছি, এমত সময়ে, কাফিখানার কর্ত্তা মহাশয় সঙ্কেত দ্বারা জানাইলেন যে, মুখ লাগাইতে পারিবে না। গেলাস উচু করিয়া গলার মধ্যে ঢালিয়া দিতে হইবে। দেখিলাম, তথায় সেই প্রকারে সকলেই পান করিতেছে। আমার কিন্তু উক্ত প্রকারে কাফি পান করিবার অভ্যাস ছিল না, সুতরাং গরম গরম কাফি মুখে ঢালিতে যাইয়া প্রায় সমস্তটাই গায়ে পড়িয়া গেল। কাপড় ত ভিজিয়াই গেল, অধিকন্তু জিহবায় এবং গালেও বেশ একটু উষ্ণতা অনুভব করিল'ম। এই প্রকারে নাজেহাল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও একা একা তীর্থভ্রমণে বাহির হইব না।

রামেশ্বরে থাকা আর সুবিধাজনক মনে হইল না, সুতরাং এস্থান হইতে পলাইবার যোগাড় করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় যে ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাকে অনুসন্ধান করিয়াও পাইলাম না। পূর্ব্বরাত্রে মনে করিলাম, নিজেই খিচুরি পাক করিব।

স্নানের ব্যবস্থা কি হইবে, জিজ্ঞাসা করায় একটী লোক একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া দিল। তাহার জলে স্নান ত দূরের কথা, উহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিলাম। পূর্ব্বদিন ধারওয়ার প্রদেশের একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তিনি সপরিবারে তীর্থভ্রমণ করিতেছেন। Deputy-Collector ছিলেন, সম্প্রতি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম K. G. Kalghatgi. তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার বলিলে তিনি আমাকে কোটীতীর্থে স্নান করিতে বলিলেন। নামটী শুনিয়া একটু কৌতুহল হইল। পাণ্ডার লোকটীকে সঙ্গে করিয়া কোটীতীর্থে স্নান করিতে গেলাম।

তথায় দেখিলাম, বহু স্ত্রীলোক স্নান করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোটীতীর্থ রামেশ্বরের মন্দির অভ্যন্তরস্থ একটী কূপ মাত্র। প্রাচীর দ্বারা ঘেরা, সেই প্রাচীর মধ্যে একস্থানে একটী নল স্থাপিত আছে। প্রতি বালতী জলের বাবদ ২টী পয়সা দিলে একটী লোক জল তুলিয়া উক্তনলের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। প্রাচীরের অন্য পার্শ্বে স্নানার্থী উপবেশন করিয়া থাকে এবং নলের মধ্য দিয়া জল আসিয়া তাহার মস্তকে পড়ে। দেখিলাম, অনেক লোক এই প্রকারে স্নান করিতেছে এবং একটু একটু জল তাহাদের প্রিয়জনের মস্তকে দেওয়ার জন্য সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। আমি দুই পয়সা দিয়া একবালতী জল মস্তকে ঢালিয়া দেখিলাম, আমার পাপরাশি এক বালতী জলে ধৌত হইবে না, সুতরাং আরও দুইচার বালতী দিতে প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আর এক বালতী মাত্র দিয়া স্থগিত করিল। উহারা বোধ হয় ভাবিল যে, আমি জলক্রীড়া আরম্ভ করিলাম। বহু স্নানার্থী বর্ত্তমান, সুতরাং আমার আবেদন মঞ্জুর হইল না।

কোটীতীর্থের স্নানে পুণ্য থাক বা নাই থাক, কিন্তু বড়ই আরাম পাইলাম। এখান হইতে বাসায় আসিয়া রান্না করিবার যোগাড় করিতে যাইয়া দেখিলাম, কালঘাটাগি মহাশয় তাঁহার ভগিনী দ্বারায় আমার জন্য অতি উত্তম খিচুড়ি পাক করাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া পরি-

তোষ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম।

গাড়ীর সময় নিকটে হইয়াছে দেখিয়া পাণ্ডার নিকট বিদায় লইতে গেলাম। তিনি বহু যাত্রীকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া তাকিয়া ঠেস্‌দিয়া তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিতেছেন। কাল নাদুস নুদস চেহারাটী, কপালে চন্দন, গলদেশে যজ্ঞোপবীত, তাঁহার পার্শ্বে মহুরীগণ বসিয়া যাত্রীদিগের নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইতেছে। পাণ্ডা মহাশয় আমাকে স্নেহ সহকারে নিকটে বসাইয়া সুফল করিতে বলিলেন। আমি দুই টাকা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সুতরাং ভবিষ্যতে বেশ একটু আশা আছে বিবেচনা করিয়া ঐ সামান্য অর্থ লইয়াই সুফল দিলেন অর্থাৎ গোটাকতক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালে খানিকটা চন্দন ও তিলক লেপিয়া দিলেন এবং প্রায় একপোয়া মিছরি ও চন্দন হস্তে দিলেন।

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।

রামমোহন-স্মৃতি-মন্দির।*

আজ এই অপরাহ্নে—চৈত্র-সংক্রান্তির এই দারুণ গ্রীষ্মে আমরা এতগুলি লোক যে এখানে সমবেত হইয়াছি, ইহা যে একটা বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা আজ এখানে আমাদের একজন মহাপুরুষের, আমাদের একজন বড় আপনার লোকের (যাঁহার মহৎ উদার প্রাণ তাঁহার দেশবাসীর দুঃখে কাঁদিয়াছিল এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যিনি অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন) স্মৃতির তর্পণ করিবার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি।

রাজা রামমোহন রায় আমাদের কে ছিলেন? তিনি আমাদের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার স্মৃতি রক্ষাকল্পে আমরা এতটা করিব? তাহার বিস্তারিত পরিচয় দিবার স্থান ইহা নহে এবং আমার মত একজন হীন অযোগ্য ব্যক্তি ঐ পরিচয় প্রদানের অধিকারী নহে। সে কার্য্য আমার অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্যতর ব্যক্তির উপরে ন্যস্ত। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বেশ জোরের

---

* পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁহার একটী স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। অনারেবল স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের বার্ষিক উৎসবের সভাপতি রূপে নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয় প্রথম এই স্মৃতিমন্দিরের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের নেতৃত্বে এই স্মৃতিরক্ষা-কমিটী সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে গত ৩০শে চৈত্র হিজলী কাঁথিতে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে, দে, আই সি-এস, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটা বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই অভিভাষণটী পাঠ করিয়াছিলেন। ন, স।

সহিতই বলা যায় যে, আজ আমরা যাহা হইতে পারিয়াছি—বাঙ্গালী বলিয়া, ভারতবাসী বলিয়া—আমরা যে আজ জগতের সভায় দাঁড়াইয়া নিজেদের অধিকার সাবাস্ত করিতে পারিতেছি, তাহার মূলে রামমোহনের সেই প্রাণপাত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। তিনিই এই বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া গিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা মহা মহীরুহে পরিণত।

বর্ত্তমান সময় যে বিশিষ্টরূপে রামমোহনের যুগ, একথা শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেই জানেন। আমার এ বিষয়ে বিস্তার করিয়া কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। তদধীন কালে ভারতের, তথা বাঙ্গালার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে রামমোহনের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবের যে বিশেষরূপে প্রয়োজন ছিল, তাহা যাঁহারা ধীরচিত্তে তখনকার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

আজ যে আমরা এতজনে সেই মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজার জন্য সমবেত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কিছু যায় আসে না, কারণ তিনি এখন আমাদের স্তুতি নিন্দার বাহিরে। কিন্তু আমরা যে তাঁহাকে চিনিবার, তাঁহার মহত্ব উপলব্ধি করিবার ও তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কর্ম্মার্থ মঙ্গল সাধনা করিবার চেষ্টা করিতেছি, ইহা আমাদেরই পরম সৌভাগ্যের কথা। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের এইরূপ সুফল দেখিয়া রামমোহনের আত্মাও পরিতৃপ্ত হইতেছে।

১৪৭ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ঠাকুর অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাঠ এককালে বিদ্যাবুদ্ধি ও যশোপ্রভায় উজ্জ্বল খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিধানে অবস্থিত দারকেশ্বর তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাধানগর গ্রাম রামমোহনকে বুকে করিয়া ধন্য হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৮৩ বৎসর পর পর্য্যন্ত তাঁহার জন্মগ্রামে যথোপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা হয় নাই, ইহা আমাদের বড়ই লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। আমরা নিজেরা খুব বড় বলিয়া সর্ব্বদা নাম জাহির করিতে চাহিলে ত চলিবে না, আমরা যে আসল বড়কে চিনিতে পারিয়াছি, এবার বাহ্যিক অভিব্যক্তি তাঁহার স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণরূপে না প্রকাশ পাইলে, ও কথার সার্থকতা কোথায় থাকে? আমরা অতি ছোট, কিন্তু এই ছোটর মধ্যে যে বড় একজন কেহ বাস করেন, তাহার প্রমাণ তখনই পাওয়া যায়, যখন আমাদের মন যথার্থ একজন বড়কে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করে। এতদিন রামমোহনের সম্মান—তথা স্মৃতি-রক্ষায় উদাসীন থাকিয়া আমরা জাতীয় ঋণ লজ্জা ও কলঙ্কের বোঝা বাড়াইয়াছি মাত্র।

এ বিষয়ে ইংরাজ যে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়, তাহা তাহারা কার্য্যে প্রমাণ করিয়াছে। আপনারা জানেন যে, রাজা রামমোহন ব্রিষ্টল নগরের নিকট দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার গুণমুগ্ধ ইংরাজ ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে ও চেষ্টায় সেখানে একটী সুন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তথায় প্রতি বৎসর শত সহস্র রামমোহন-ভক্তবৃন্দ সেই পবিত্র পুণ্যতীর্থে তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি প্রেম পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে নিজেদের ধন্য করিয়া থাকেন। তবে এটা কি আমাদের বিশেষ ক্ষোভের কথা নহে যে, তাঁহার প্রিয় জননী জন্মভূমিতে সেই পবিত্রাদপি

পবিত্র তীর্থ স্থানে তাঁহার কোনও স্মৃতি চিহ্নের স্থাপনা এখনও হয় নাই ?

যাহা হউক, এতদিন পরে যে আমরা আমাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছি এবং তাহার নিরাকরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, তাহা বড়ই আশার কথা। গত ১৩২৩ সালে রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্মভিটায় তাঁহার স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনা হইয়া গিয়াছে। বিশেষ রূপে আমাদের সুযোগ্য উদ্যোগী ও অক্লান্ত কর্ম্মী একনিষ্ঠসম্পাদক মহাশয়ের প্রাণপাত চেষ্টায় এই কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে, স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। তৎসংলগ্ন একটী পানীয় জলের বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হইবে এবং একটী বেদান্ত চতুষ্পাটী ও অনাথ-আশ্রম, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন এবং সহৃদয় রাজ-কর্ম্মচারীগণের চেষ্টায় L-A কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলীর একটী নির্ভুল শোভন ও সুলভ সংস্করণ প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত আচার্য্য-প্রবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছে।

কার্য্য অবশ্য অতি বৃহৎ, তাহার তুলনায় আমাদের সামর্থ্য অতি ক্ষুদ্র। আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে যতটুকু সম্ভব হয়, ততটুকু কার্য্য আমরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি মাত্র। এখন এই মহৎ কার্য্য শেষ করিয়া তোলার ও তাহার সাফল্য বিধান করার ভার সম্পূর্ণরূপে আপনাদের হস্তে। এই বিরাট ব্যাপারে বহু অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য টাকাকড়ি অনেক সংগ্রহ হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু এখনও অনেক বাকী। ভারতবাসী যতই দীন দরিদ্র হউক না কেন, সৎ ও মহৎ কার্য্যে দানশীলতার কথা এদেশে চিরপ্রসিদ্ধ। আর এই মহৎ কার্য্য যে আবশ্যক মত অর্থাভাবে বিফল হইয়া যাইবে, এ সংশয় মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের মনে উদয় হয় না।

তাই আজ সুদূর কলিকাতা হইতে আমরা আপনাদের দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের বিশেষ আশা আছে যে, ভিক্ষার্থী অতিথিকে আপনারা প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বরং আবশ্যকের অতিরিক্ত ভিক্ষায় আপনারা তাহাদের ঝুলি পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-বন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের কথা আপনারা জানেন। তাই এই মহৎ কার্য্যে যাহার যতটুকু সাধ্য, তাহা যতই ক্ষুদ্র, যত অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন—সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই সুযোগে আরও দুই একটা কথা না বলিয়া এই ক্ষুদ্র বক্তব্যের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তজ্জন্য আপনারা ক্ষমা করিবেন। এই উন্মুক্তউদার আকাশ তলে বিরাজিত, অদূরে নীল সিন্ধুজলধৌত বেলাভূমি-শোভিত, চতুর্দ্দিকে শ্যাম বনানী পরিবেষ্টিত এবং উপন্যাস-তথা কথা সাহিত্যের একচ্ছত্র ও অবিসংবাদী সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুর স্মৃতি-বিজড়িত আপনাদের এই সুন্দর দেশে আসিয়া আমরা যে কি তৃপ্তি—কি আনন্দ লাভ করিয়াছি—তাহা মুখে প্রকাশ করিয়া বলিবার নহে। বাস্তবিক পল্লী-জননীর এই স্নিগ্ধ শ্যাম অঞ্চলের ছায়ায় আসিয়া আমাদের প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে যেন এই দেশ প্রকৃতি রাণীর লীলাভূমি, এখানে যেন দুঃখ কষ্ট কিছু নাই। এবং এই দেশের সুবিশাল প্রান্তর ও ধান্য-ক্ষেত্র সমূহ দেখিয়াই বোধ হয় কবি গাহিয়াছেন—"অঘ্রাণে তোর ভরাক্ষেতে কি

দেখেছি মধুর হাসি" অথবা "এখন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে"। বাস্তবিক "লক্ষ্মীজলা" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যেন এইখানেই মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজিত। মালক্ষ্মী যেন এখানে চারিদিকে সোনা ঢালিয়া রাখিয়াছেন। তাহার উপর আপনাদের সকলের বিশেষতঃ আমাদের সুযোগ্য রাজ-কর্ম্মচারী দে সাহেবের, কাঁথির grand old man উপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনায় অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শনে এবং উদার আথিতেয়তার ভাব আপনাদিগকে একেবারে মুগ্ধ—অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং আমার কলিকাতার বন্ধুগণের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আমাদের অপরিশোধণীয় কৃতজ্ঞতা ও শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে শ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিক কামনা এই যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে, যে মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সাহায্য কল্পে আজ আপনাদের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি, তাহা সফল হউক।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।

উত্তরচরিত-সমালোচনা (২)

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পর্য্যন্তই চিত্রের বর্ণনীয় বিষয় ছিল। "কিয়ন্তমবধিং যাবৎ" প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ যেমনই "যাবদার্য্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ" এই কথা বলিলেন, অমনই রামের অভিমানে ঘা পড়িল। তখন সীতার প্রতি তাঁহার কি উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা প্রকাশ পাইল। স্বতঃপূত তীর্থোদক ও বহ্নির আবার বিশুদ্ধি কি? উৎপত্তি-পূতা সীতার আবার বিশুদ্ধি কি?

রাজর্ষি সীরধ্বজ লাঙ্গল হস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে অলোকসামান্য জ্যোতি প্রাপ্ত হন; তজ্জন্য ইহার নাম সীতা। রামচন্দ্রও কথায় কথায় "দেবযোনি সম্ভবে সীতে" বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। সীতা জনকেরই আত্মজা। কণ্বের শকুন্তলার মত কেবল পালিতা কন্যা নন্। শকুন্তলা মেনকার গর্ভসম্ভূতা, বিশ্বামিত্রের ঔরস-জাতা। মেনকা রূপ দর্শনে বিহ্বল রাজর্ষির অঙ্গসম্ভূত তেজ যজ্ঞভূমিতে পতিত হইয়া এই প্রভাতরল জ্যোতির উদ্ভব করিয়াছিল। সখী অনসূয়ার কাছে সীতা নিজমুখে আপনার জন্ম পরিচয় এইরূপ জ্ঞান করিয়াছিল।

সখীরাকর্ষণং কর্ত্তুং গতঃ কালে পিতা মম।
পত্নীভিঃ সহ ধর্ম্মাভিঃ সদদর্শাদ্ভুতং মহৎ॥
অন্তরীক্ষে চ গচ্ছন্তীং দিব্যরূপাং মনোরমাং।
মেনকাং বৈষ্ণপ্সারসাং দ্যোতয়ন্তীং দিশস্ত্বিষা॥
তস্যঃ লাঙ্গলহস্তস্য কর্ষতে যজ্ঞমণ্ডলং।
অহং কিলোত্থিতা ভিত্তা জগতীং জগতঃ পতিং॥

এই যজ্ঞভূমি কর্ষণ ধর্ম্মমূলক বলিয়াই জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল ধারণ করেন। নচেৎ রাজা হইয়া স্বহস্তে লাঙ্গল চালনা করিবেন কেন?

মহাবীরচরিত নাটকে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থলে হরধনু ছিল। ঋষিবরের নিমন্ত্রণে রাজর্ষি জনক নিজে যাইতে না পারিয়া তাঁহার ভ্রাতা কুশধ্বজকে সীতা উর্ম্মিলা সহ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রেরণ করেন। রাম লক্ষ্মণও সেইস্থলেই হরধনুভঙ্গ করেন। আর সেই সময়ে রাবণের অনুচরও তথায় উপস্থিত ছিল। কবি উত্তরচরিতে রামায়ণানুসৃত পথ অবলম্বন করিয়া মহাবীরচরিতে কৃত দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। "এষ মিথিলাবৃত্তান্তঃ", তারপর রামের সৌম্যসুন্দর শ্রীর পানে জনকের বিস্ময়স্তিমিত দৃষ্টি পড়িল; শঙ্কর শরাসনও রাম কর্ত্তৃক অনাদরে খণ্ডিত হইয়া গেল।

মহাবীরচরিতে হরধনু ভঙ্গের পর মিথিলাপ্রস্থান। পথের মধ্যে তাড়কার বধ হয়। রাবণের কূটবুদ্ধি মন্ত্রী মাল্যবানের পরামর্শে তাড়কা রাক্ষসী রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করে। উত্তরচরিতে কবি রামায়ণানুসৃত পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বামিত্র-আশ্রমে উপস্থিতির পূর্ব্বেই তাড়কাকে বধ করাইলেন।

মহাবীরচরিতে হরধনু ভঙ্গের পর সকলে মিথিলা যাত্রা করেন। তথায়ই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। আর বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও শতানন্দের সম্মুখে জনকের গৃহে বিবাহ সভায় পরশুরামের আগমন হইয়াছিল। উত্তরচরিতে কবি মহাবীরচরিতের অনুসৃত পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত রামায়ণের মত গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার পথে পরশুরামকে উপস্থিত করিয়াছেন। "এষ মিথিলা বৃত্তান্তঃ" প্রস্তাবের পরে "এতে রামযোধ্যাং প্রাপ্তা" বলার পূর্ব্বে "অয়ঞ্চ ভগবান ভার্গব" কথা নিবেদিত দেখিতে পাওয়া গেল। অতএব পূর্ব্বকৃত দোষের উদ্ধার হইল।

মহাবীরচরিতে মাল্যবানের চক্রান্তে সূর্পণখা মন্থরা সাজিয়া কৈকেয়ীর প্রেরিত বলিয়া একখানি জালপত্র রাজ্যাভিষেকোৎসব ক্ষেত্রে দশরথের নিকট উপস্থিত করেন। কৈকেয়ীর দোষক্ষালনের উদ্দেশ্যে এই নব উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা কবির মনঃপূত হইল না; তাই তিনি উত্তরচরিতে কৈকেয়ীর ব্যাপার সত্য বলিয়াই দাঁড় করাইলেন। লক্ষ্মণ এষা মন্থরা বলিবামাত্র রামচন্দ্র কেমন মৌন তিরস্কারের সহিত মাতার কলঙ্কব্যাপারটী এড়াইয়া গেলেন, গুরুজন নিন্দার প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। লক্ষ্মণও বুঝিলেন "অয়ে মধ্যমাম্বা বৃত্তান্তোঽন্তরিত আর্য্যেণ"। বনবাসে যাওয়ার জন্য রাম যে মধ্যম মাতার উপর বীতশ্রদ্ধ হন নাই, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

রামচন্দ্রের চরিত্রই অদ্ভুত। লক্ষ্মণ ভার্গবের নামোল্লেখ করিবামাত্র "নমস্কার লহ ঋষিবর" বলিয়া বিজয়ী রাম আপনার বিজয়রূপ ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ যেমন ভার্গবের পরাজয় বর্ণনা আরম্ভ করিতে যাইবেন—অমনই রাম অসহিষ্ণু হইয়া "অনেক দেখাইবার আছে তাই দেখাও" বলিয়া লক্ষ্মণের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে করিয়া থাকেন; কিন্তু এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত আত্মপ্রশংসা শ্রবণে অনিচ্ছা এবং আপনাকে অপরাধী করিয়া ছোট করা এক রামেরই সাজে। বিশ্রব্ধ স্থানে বিশ্রব্ধালাপে আপনার কাছে এই লজ্জিত হওয়া, এই কুণ্ঠিত হওয়াই বাস্তবিক অনন্যসাধারণ। প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা হইতে অব্যাহতি লাভ করাই প্রকৃত সাধনা। কৃত্রিম লজ্জা ও কুণ্ঠা প্রদর্শনও সুখ্যাতির

বিষয়। কিন্তু ভিতরের লজ্জা ও কুণ্ঠাই প্রকৃত সাধুতার চিহ্ন। এমন আত্মজয়ী পুরুষই আমাদের আদর্শ, আমাদের পূজ্য, আমাদের দেবতা। ভোগ ও ত্যাগের প্রেম ও বৈরাগ্যের সকাম ও নিষ্কামের এমন মিলন স্থান আর কোথায় মিলিবে?

এই সকল গৌরবজনক ঘটনাগুলির প্রতি লক্ষ্মণ রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু পতি-সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা সীতার লোলুপ দৃষ্টি যে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ গৌরবে, গর্ব্বে ও আনন্দে সীতার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া সেই চিত্র-গুলির উদ্দেশ্যে ইন্দীবর-মালার সৃষ্টি করিতে-ছিল। বৃদ্ধ ইক্ষাকু রাজগণ পরিণত বয়সে জরা-শিথিলাঙ্গ হইয়া যে পুণ্য আরণ্যক ব্রত গ্রহণ করিতেন, আর আজ রামচন্দ্র প্রথম যৌবনে সেই কঠোর পবিত্র ব্রত অবলম্বন করি-তেছেন—ইহা কত বড় গৌরবের ব্যাপার। রামগতপ্রাণ লক্ষ্মণের, রামময়-জীবিতা জানকীর ইহা কতবড় আনন্দের বিষয়। লক্ষ্মণের হৃদয় যেমন এই পুণ্য আরণ্যক ব্রত গ্রহণ ব্যাপারে গৌরবে নাচিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সীতার চক্ষু বিস্ফারিত আনন্দোজ্জ্বল অশ্রুময় হইবার উপ-ক্রম করিল—অমনই রামচন্দ্র প্রসন্ন পুণ্যসলিলা রঘুকুল-দেবতা ভাগীরথী দেবীর কথা আনিয়া ফেলিলেন। "সীতায়ং শিবানুধ্যান পরা ভব" বলিয়া ভাগীরথী দেবীর উপর সীতার মঙ্গলের ভার অর্পণ করিলেন। এই উক্তির জন্য ভাগীরথী দেবী সীতার পুত্রদ্বয়কে রক্ষা করত স্তন্যত্যাগন্তে বাল্মীকির করে ন্যস্ত করিলেন। রামসীতার মিলানন্দের ছবি বিরহের চিত্র লক্ষ্ম-ণের সম্মুখেই সম্পূর্ণ একপ্রকার নগ্নভাবেই ফুটিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ সীতার কত আদরের দেবর, তাহা চিত্রদর্শনের প্রথমেই দেবের ভাজের পবিত্র রসালাপের ভিতর দেখেই বুঝিতে পারা যায়। "বৎস, অপর এইটী কে?" কি সুন্দর স্বচ্ছ পবিত্র এবং সরল ব্যঙ্গ। সীতাই লক্ষ্মণকে, তামাসাই বল, আর ব্যঙ্গই বল, করিয়া সুখ পাইতেন, তাহা বলিয়া লক্ষ্মণও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, মাতৃসম পূজ্যা সীতাকে তামাসা বা ব্যঙ্গ করিতে পারিত না। আজি কালিকায় আমাদের অন্তঃপুরের মধ্যে বউদিদি যতটা ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন, বা করিতে পারেন, দেবরেরা কি ততটা করেন, না—করিতে পারেন? বিশেষতঃ লক্ষ্মণ যে সীতার মুখের পানে কখন দৃষ্টিপাত করে নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর রমণীর মুখ দেখে নাই—সে ঐ প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিল না, কেবল লজ্জার হাসি হাসিল মাত্র। লক্ষ্মণ সীতাকে ভক্তি সম্ভ্রম করিত বলিয়া উত্তর দেয় নাই, নচেৎ সে যে গোবেচারী ছিল, কি ওসকল রসিকতা বুঝিত না, তাহা নহে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন—তজ্জন্যই যে অতটা সঙ্কোচ, সেই কারণেই যে তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়া ভার্গবের কথা আনিয়া ফেলিল, এমনও নহে। লক্ষ্মণের এই সংযত মৌন সম্ভ্রম, এই লাজুক ভাব তাহার সংযত চরিত্রে-রই লক্ষণ। রাম উপস্থিত না থাকিলেই যে লক্ষ্মণ ঐ কথার উত্তর দিত, তাহা নহে। সে দিন কথক-ঠাকুরের লক্ষণ সম্বন্ধে একটী সরল কথা মনে পড়িল, তাহা উপাদেয় বোধে পাঠক-বর্গকে উপহার দিলাম।

সীতার সঙ্গিনীরা জনকালয়ে রামকে প্রশ্ন করিল "বল তুমি কার মেয়ে বিয়ে করেছ?" সীতা যজ্ঞ ভূমিতে উৎপন্না, কাজেই পিতার ঠিক নাই। প্রশ্নের এই-রূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়াই রাম উত্তর দিলেন,

"কেন, জনকের কন্যা"। অমনই সঙ্গিনীদের মধ্যে হাসির লহর ছুটিল; এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। রসিকা কোন নারী অমনই রামকে শুনাইয়া বলিল, "তা বটে, অজবংশে এমন ধারাই হয়ে থাকে।" জনকের কন্যা, কাজেই সহোদরা। আর অজবংশ ছাগলের বংশ। রাম অপ্রতিভ হইয়া মৌন হইয়া রহিলেন। বিজয়-গর্ব্বে উল্লাসিতা সঙ্গিনীরা লক্ষ্মণের নিকট যেমন ঐ প্রশ্ন করিল, অমনই চতুর লক্ষ্মণ মুখের মত উত্তর দিল "কেন, তোমাদের জনকের কন্যা।" সঙ্গিনীরা লজ্জায় অপমানে এতটুকু হইয়া গেল। সকলে হারিয়া মুখ চুণ করিয়া রহিল। "তোমাদের জনকের কন্যা" বলিতে তো তাহাদিগকেই নির্দ্দেশ করা হইল। তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। আর এদিকে "তোমাদের জনক রাজা" কথাটী দোষেরও হয় নাই।

সংসারে নানা ঝঞ্ঝাটে, দুঃখ, শোক, অভাব, দৈন্য, অবজ্ঞা ও প্রতারণার মধ্যে পড়িয়া আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি "সেদিন চলিয়া গিয়াছে।" এতদিনের পর সীতাকে লাভ করিয়া অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া [illegible]ন সুখের মুহূর্ত্তেও রামের মুখে উচ্চারিত হইল" তে হি নো দিবসা গতা।" প্রথম বয়সে বিবাহ, তরুণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা ভরা দিনগুলি বড়ই মধুর। লজ্জা ও অনুরাগের মাঝখানে দিয়া সেই প্রেমের খেলা বাস্তবিক উপভোগ্য। সুখের চেয়ে সুখের স্মৃতি মিষ্ট। বর্ত্তমানের তুলনায় অতীত চিরদিনই মূল্যবান।

তারপর চিত্রকূটগামী পথের মধ্যে কালিন্দী-তটে শ্যামনামক বটবৃক্ষের মূলে প্রণয় সুখ ভোগের কথা উঠিল। নির্জ্জন স্থলে সেই ক্লান্তিনাশক মৃদু মৃদু সংবাহন, সেই বৃক্ষের উপর আলসলুলিত দেহে সেই সুখনিদ্রা প্রথমে সীতার মনে পড়িল। রামও কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? তারপর জলস্থান মধ্যবর্ত্তী মেঘমেদুরিতনীলিম" প্রস্রবণ গিরি মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। সেখানে অবিদিত-গত-যামা কত রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, তাহা মনে হইল। পরস্পরের একটী একটী বাহু পরস্পরের অঙ্গে জড়াইয়া আছে, ক্রম-শূন্য সপ্রেম রসালাপের উচ্ছলপ্রবাহ দম্পতীর উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হৃদয়ের মাঝখান দিয়া বহিয়া যাইতেছে—তাহার আর উদ্বোধ রহিল না। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত কি সুন্দর তন্ময়াবস্থা!

উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দর্শনে সহৃদয়গণ এমনই ভাববিহ্বল ও তন্ময় হইয়া উঠেন যে, তখন অভিনয় বাস্তব বলিয়াই বোধ হয়। চিত্রদর্শনেও চিত্র সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে। অতীত ঘটনার চিত্র দর্শনে স্মৃতি যে অনুভূতির আকারে ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন, ভাবনা প্রকর্ষে স্মৃতি প্রত্যক্ষ সমানাকার হইতে পারে। তাই শূর্পনখার চিত্র দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত-চিত্তা সীতার বিরহভীতি জাগিয়া উঠিল—"হা আর্য্যপুত্র, তোমার সহিত সাক্ষাৎ আজ শেষ হইল।"

তারপর সীতা হরণ হইয়া গেল। মিলন চিত্র শেষ হইয়া বিরহ-চিত্রের পালা আসিল। সীতা-বিরহে রামের কি ভাবে দিন কাটিয়াছিল; সীতা-বিরহিত বিকলেন্দ্রিয় রামের পাষাণবিদারী ক্রন্দন কিভাবে বনস্থলী ফাটাইয়াছিল, তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইল। যে রোদনে বজ্রের হৃদয় গলিয়া যায়, তাহা যে সীতার নয়নে অশ্রু বহাইবে, আশ্চর্য্য কি?

অয়ি রঘুকুলানন্দ, আমার জন্য তুমি এত কষ্ট পেয়েছ? তৎক্ষণাৎ রামের হৃদয়ে অতীত দুঃখের বিলীন সংস্কার ফুটিয়া উঠিল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি প্রজ্জলিত হইল। পদ্মপলাসনেত্র হইতে অশ্রুধারা মুক্তামালার মত টপ টপ করিয়া ভূমে পতিত হইল। উষ্ণ মৃত্তিকা সিক্ত হইল!

সুখের সময়ে অতীত দুঃখের স্মৃতি জাগিয়া উঠিলে বেদনা জন্মে—কবি রামের মুখ দিয়া এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন।

সেই সময়ে সীতা হরণের পর বিরহ দুঃখাগ্নি তীব্র হইলেও প্রতিকার আশায় তাহা কোন রকমে সহ্য হইয়াছিল; কিন্তু আজ তাহা চিত্র দর্শনে প্রজ্জলিত হইয়া মর্ম্মস্থ ব্রণের মত বেদনা দিতেছে।

কালিদাস একটী মাত্র শ্লোকে (রঘুবংশে) চিত্র দর্শনের অবতারণা করেন। তাহাতে কিন্তু সুখের সময়ে অতীত দুঃখের স্মৃতি সুখকরই হইয়া উঠে—এইরূপ মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

দণ্ডকারণ্যে প্রাপ্ত দুঃখ স্মরণ করিয়া রাম ও সীতার সুখ জন্মিতেছিল, দুই মহাকবির এই মত-বৈষম্য বড়ই বিস্ময়কর। ইহার বিচার পাঠকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে করিবেন।

"কিং নামধেয়" পর্ব্বতের তরুমূলে "অনুভাবসৌভাগ্যমাত্র পরিশেষ ধূসর শ্রী" রোরুদ্যমান রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া আছেন। সীতা সেই দৃশ্য হইতে দৃঢ়বদ্ধ চক্ষু দুইটীকে কোনরূপে আকৃষ্ট করিতে না পারিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আপনার মন দিয়া রামের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া লইলেন। তার পর মাল্যবান পর্ব্বতে রামের সীতাবিরহ-শোক যখন সহ্যের অতীত হইয়া আসি[ল] তখন "বৎস, বিরত হও, আর আমি [সহ্য] করিতে পারিতেছি না" বলিয়া রাম চিত্র দ[র্শন] বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিলেন।

সীতা বিহনে রামের সেই করুণা অ[বস্থা] দেখিয়া সীতার প্রাণ যদিও কাতর, [নয়ন] অশ্রুময় হইতেছিল, তথাপি তাহাতে এ[ক] সুখ, একপ্রকার সৌভাগ্য-গরিমা বিদ্য[মান] ছিল। সমবেদনার বালুকার স্তরে আত্মতৃ[প্তির] ফল্গুস্রোত নীরবে বহিয়া যাইতেছিল। ক[রুণ] রসান্বিত নাটকের অভিনয় দর্শনে সহৃদ[য়ের] চিত্ত কাতর, নয়ন বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়া থা[কে,] অথচ তাঁহারা তাহাই শুনিবার জন্য আ[গ্রহ] ব্যগ্র হন। অবশ্যই সেই দুঃখের মধ্যে এমন একটী আনন্দ রসের অনুভূতি জন্মে যাহা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। ই[চ্ছা] করিয়া কেহ দুঃখ ভোগ করিতে চাহে [না।] রামের দুঃখে সীতার সমবেদনা যত জা[গে,] নয়নে যতই অশ্রুর ধারা বহুক, ত[থাপি] তাহাতেই সীতার সুখ, সীতার গর্ব্ব, জীবনে[র] সার্থকতা। এ দুঃখ যে সীতারই জন্য; এ[দুঃখ] যে কেবল একাই রাম পাইতেছেন, তাহা [নহে,] সীতাও যে ও দুঃখের সঙ্গী। কাজেই তা[ঁহার] দেবতা তাহার জন্য পথে পথে কাঁ[দিয়া] বেড়াইয়াছেন—ইহা দেখিয়া পতিগত[প্রাণা] রামময়জীবিতার মন প্রাণ সৌভাগ্য[-গর্ব্বে] নাচিয়া উঠিবে না? হতভাগিনী সীতার [কত] মূল্য! তাহা হইলে সীতার রাবণগৃহে ব[াস] ধন্য, রামবিরহ সহ্য করাও সুখকর।

চিরপরিচিত বনস্থলীর চিত্র দেখিয়া বনস্থলী দেখিতে সীতার ইচ্ছা জন্মিল। র[ামের] সহিত সেইখানে বেড়াইতে যান, [এই] আকাঙ্ক্ষা সীতা প্রকাশ করিল। গর্ভি[ণীর] চিত্তের অভিলাষ পূরণ কর্ত্তব্য, আর এ[ই]